প্রথম প্রকাশ
২২ শ্রাবণ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ
১ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ
তৃতীয় সংস্করণ
১ আষাঢ় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
চতুর্থ সংস্করণ
১ বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলকাতা ৬
মুদ্রক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিমলাই
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলকাতা ১৩
প্রচ্ছদ মুদ্রক
শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং প্রাঃ লিঃ
৪৬।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলকাতা ৯
দাম
ছয় টাকা

বাংলা ছোটগল্পের সাম্প্রতিক ধারা

এই গ্রন্থে সংকলিত আঠারটি গল্পকে বাংলা আধুনিক কথাশিল্পের আধুনিকতম উৎকর্ষের নিদর্শন বলা যায়। বিগত পনর বৎসরের মধ্যে বাংলার কথাশিল্প, বিশেষ ক'রে ছোটগল্প, নানা নূতন রীতির পরীক্ষায় নূতন গঠন লাভ ক'রে এসেছে। বাংলা ছোটগল্পের সেই নূতন গঠনের মধ্যে প্রকৃত সাহিত্যোচিত উৎকর্ষ কি পরিমাণ সার্থকতা লাভ করেছে, তার বিচার করবেন পাঠক; এবং সেই বিচারের সুযোগ ও আনন্দ পাঠকসাধারণের কাছে উপস্থিত করাই এই সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য।

যে আঠারজন কথাশিল্পীর রচনা এই গ্রন্থে পরিবেশন করা হল, তাঁদের রচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় বেশীদিনের নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই পাঠকমহলের স্বীকৃতি তাঁরা পেয়েছেন এবং তখন থেকেই তাঁদের খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। শুধু তাঁরাই হলেন আধুনিক বাংলার কথাসাহিত্যে নূতন রীতির সাধক, এমন কোনও ধারণা বা দাবি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা নয়। বয়সের বিচারে এঁদের চেয়ে বেশী প্রবীণ এবং বেশী নবীন কথাশিল্পীরাও রয়েছেন, যাঁদের প্রতিভায় ও কুশলতায় আধুনিক বাংলার ছোটগল্প নূতন সৌষ্ঠব লাভ ক'রে চলেছে। বিশিষ্ট প্রবীণ ও নবীন কথাশিল্পীদের ছোটগল্পের সংকলন-গ্রন্থ ইতিপূর্বে দু-একটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পাঠকসমাজেরই মনের দাবি লক্ষ ক'রে অনুভব করেছি যে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার থেকে এমন কয়েকটি ছোটগল্পের এক সংকলন-গ্রন্থ পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে, যার মধ্যে আধুনিকতম রীতির উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য খুব বেশী স্পষ্ট। বিগত পনর বৎসর ধরে বাংলা দেশেরই বিশিষ্ট একটি সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনা-কার্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং বাংলা ছোটগল্পের বিস্ময়কর, দ্রুত ও বিপুল রীতিবিকাশের ধারা লক্ষ করবার সুযোগ পেয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সেই অভিজ্ঞতাই এই গ্রন্থের গল্প নির্বাচনে আমার প্রধান সহায় হয়েছে। স্বীকার করতে চাই, আমার অভিজ্ঞতার পরিধি সীমাহীন নয়; আধুনিক বাংলার ছোটগল্পের বিরাট ভাণ্ডারের সকল কোণের সব প্রদীপের খবর রাখতে পারিনি, রাখা সম্ভবও নয়। নূতন রীতির অন্য আরও সুস্পষ্ট এবং সার্থক উদাহরণ হিসেবে আধুনিক কালের লেখকের ছোটগল্প নিশ্চয়ই আছে, যার নাগাল আমি পাইনি। সেইসব ছোটগল্প আমার অগোচরের সম্পদ এবং এই সংকলন-গ্রন্থে সেইসব গল্পের অনুপস্থিতি নিতান্তই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, আমার পরিচিত কয়েকজন লেখকেরও এমন কয়েকটি ছোটগল্পের পরিচয় জানি, রীতি ও ভঙ্গির নূতনত্বের উদাহরণ হিসেবে যেগুলিকে এই সংকলন-গ্রন্থে স্থান দিতে পারলে ভালই হত; কিন্তু গ্রন্থের কলেবর-স্ফীতি পরিহার করার জন্যই এবং সাধ্য নয় বলেই সেই কয়েকটি গল্পকে স্থান দিতে পারা গেল না।

'অষ্টাদশী'র আঠারটি গল্পেরই মূলীভূত বিষয় হল প্রেম। জীবনে প্রেমের আবির্ভাব, অভিব্যক্তি ও পরিণামই মানুষের আন্তরিক রূপকে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হবার সুযোগ দান করে। জীবনের মহত্তম প্রয়োজন এই প্রেমের প্রতিষ্ঠার পথও নানা সমস্যার বেদনায় বিঘ্নিত। এই প্রেম দেহজ কামনার সৌন্দর্যে সুন্দর, আবার বিকারে বিড়ম্বিত। এই প্রেম কোথাও বা আন্তরিক প্রীতিরূপে উৎসারিত এবং সুস্থির নিষ্ঠার আনন্দেই পরিতৃপ্ত, আবার কোথাও বা প্রীতিহীন ও নিষ্ঠাহীন কামনার বিভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত। মিলনপ্রয়াসী প্রেমও কখনও বা চিরবিরহেই তার সম্মান ও শান্তির পথ বেছে নেয়। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর রহস্য ও বিচিত্র বিস্ময় হল প্রেম। 'অষ্টাদশী'র আঠারটি গল্পে সেই প্রেমতত্ত্বেরই রহস্যের অভিনব রূপায়ণ এবং বিশ্লেষণ লক্ষ করা যায়।

এই রূপায়ণে ও বিশ্লেষণে লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। ঘটনার ও চরিত্রের উপর সহানুভূতি আরোপের আগ্রহ এবং ভঙ্গিতেও তারতম্য সুস্পষ্ট। কারও কল্পনা বিশেষভাবে মাধুর্যধর্মী, কারও কল্পনা নাটকীয় চমৎকারিতায় প্রবল। কেউ সূক্ষ্ম মানস-প্রক্রিয়ার ও চিন্তাদ্বন্দ্বের রহস্যজাল ছিন্ন করেছেন। কেউ বা বিচার করেছেন, সামাজিক পরিবেশের অন্তর্নিহিত অর্থনীতিক বাস্তবতা-গুলি কিভাবে নরনারীর সম্পর্কের রীতি প্রভাবিত করে। কোন গল্পের বর্ণনশৈলী সংলাপের প্রাধান্যে রচিত, আবার কোন গল্পের গঠন প্রধানত ঘটনার বিন্যাসে ও বিস্তৃতিতে আশ্রিত। কোন গল্পের আঙ্গিকে সুষমার, কোনটির মধ্যে ব্যঞ্জনার, কোনটিতে চিত্রকারিতার এবং কোন কোন গল্পের আঙ্গিকে আলংকারিক কারুকলার প্রাধান্য। কোন কাহিনীর প্রকৃতি অন্বেষণের মত, আবার কোন-কোনটির প্রকৃতি হল বিশ্লেষণ, আবেদন, অভিযোগ, সমাধান অথবা পরিতৃপ্ত অভিলাষের মত। সবার উপর সত্য হল কাহিনীগুলির রসসিদ্ধি। রীতির আঙ্গিকের এবং বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়ে বিভিন্ন লেখকের গল্প এক-একটি পূর্ণ পরিণামের রূপচ্ছবি সৃষ্টি করেছে, এবং সেই কারণে পাঠকের মনে প্রত্যেকটি গল্পের আবেদনও নিজ নিজ ভিন্নতায় ও স্বাতন্ত্র্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ সঞ্চার করবে।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সেই সুপরিণত বৈচিত্র্যের পরিচয় 'অষ্টাদশী'র আঠারটি গল্পের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কথা বললে মোটেই অতিশয়োক্তি করা হবে না যে, বর্তমান বিশ্বের কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার ছোটগল্প-রচয়িতারা দক্ষতায় কোন দেশের কথাশিল্পীদের চেয়ে ন্যূন নন এবং অনেক দেশের কথাশিল্পীদের তুলনায় বেশী উৎকর্ষের অধিকারী। বাঙালী আজ ছোটগল্পের রাজা—এই গর্ব জগৎসভায় প্রকাশ করবার অধিকার এখন আমরা অর্জন করতে পেরেছি। 'অষ্টাদশী'র আঠারটি গল্প এই ধারণারই সত্যতা প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথ-প্রভাত-কুমার-শরৎচন্দ্রের প্রতিভা হতে বাংলার ছোটগল্পের যে রচনারীতির উন্মেষ, সেই রচনারীতির ঐতিহ্য অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বহু কৃতীর ও গুণীর প্রচেষ্টায় নবতর রূপায়ণের এক-একটি অধ্যায় দ্রুত অতিক্রম ক'রে আজ যে পরিণামবৈচিত্র্য লাভ করেছে, তার দিকে তাকিয়ে আমরা আরও নূতন ও বিপুল এক সম্ভাবনার আসন্নতা অনুভব করছি। অচিরবর্তী ভবিষ্যতের সেই সাহিত্যগত সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি এই আঠারটি গল্পের রচয়িতা কথাশিল্পীদের প্রতিভার মধ্যে যে অত্যন্ত সক্রিয় ও স্পষ্ট, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। নূতন সৃষ্টির আগ্রহে এঁরা অনুপ্রাণিত, দুরূহকে

পরীক্ষা করবার সৎসাহসে এ'রা নিষ্ঠাবান। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে এ'রাই হলেন লেখনীর কুশলতায় অগ্রগণ্য সেই কয়েকজন, যাঁদের লেখায় নূতনত্বের স্বাদ আছে, নূতনতর প্রতিশ্রুতির সংকেত আছে। কর্তব্যবোধে পাঠকসমাজের কাছে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সেই নূতন উৎকর্ষ এবং প্রতিশ্রুতির পরিচয় পরিবেশন করার জন্য এ'দের আঠারটি রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত করেছি।

পরিশেষে 'অষ্টাদশী'র প্রচ্ছদচিত্রের জন্য আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর কাছে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বহুকাল আগে ছবিটি স্নেহোপহাররূপে আমাকে তিনি দিয়েছিলেন, এতদিন পরে গ্রন্থের প্রচ্ছদে তা ব্যবহার করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

২২ শ্রাবণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

সাগরময় ঘোষ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'অষ্টাদশী'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণের আঠারটি গল্পের মধ্যে পনরটি পুরাতন গল্পের বদলে নূতন গল্প দেওয়া হয়েছে। অনেক পাঠকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এই পরিবর্তনের সার্থকতা কি। সার্থকতা নিশ্চয় আছে। 'অষ্টাদশী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬১ বঙ্গাব্দে। সেদিন এই সংকলনের লেখকবৃন্দ ছিলেন বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আসরে এঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় এক দশক অতিক্রম ক'রে আমরা ১৩৭০-এ পদার্পণ করেছি। ইত্যবসরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে আমাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনে; নূতন সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের জীবনের সেই মূল্যবোধগুলিকে নূতন দৃষ্টি দিয়ে আর একবার যাচাই করবার সময় এসেছে। সেদিন যাঁদের বলিষ্ঠ পদধ্বনি আমরা শুনেছিলাম, আজ তাঁরা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আসরে সুপ্রতিষ্ঠ। যুগ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে এঁদের রচনারও রীতিবদল ঘটেছে এবং এই সংস্করণে সেই যুগ-পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি তুলে রাখবার জন্যই পুরাতন গল্পের বদলে নূতনের সংযোজন।

আর একটি কৈফিয়ত বাকি। পূর্ববর্তী সংস্করণের পরিশিষ্টে লেখক-পরিচিতি সন্নিবিষ্ট ছিল, বর্তমান সংস্করণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। দশ বছর আগে এই সংকলনের লেখকদের পরিচিতি দেবার প্রয়োজন ছিল, আজ আর নেই। আজ তাঁরা সকলেই অনুরাগী পাঠকমহলের অতি প্রিয় ও বহু-পরিচিত লেখক।

শ্রীমান রাধাকান্ত শী এই সংস্করণের আদ্যন্ত প্রুফ বহু শ্রম স্বীকার ক'রে ও যত্ন সহকারে দেখে দিয়েছেন, মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে ঋণ শোধ করা যায় না।

১ বৈশাখ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সাগরময় ঘোষ

সূচি

ক থা মা লা

সুবোধ ঘোষ

কবে নীরব হবে কথামালা?

কবে একটু নীরব হবে এই মেয়ে, ধ্রুবজ্যোতির মেজবউদি যার নাম দিয়েছে কথামালা, যার সত্যি নাম হল বিনীতা মল্লিক?

মুরলী প্রেসের ম্যানেজারের কাজ করেন যে রাইচরণ মল্লিক, তিনি এই পাড়াতেই, ধ্রুবজ্যোতিদের এই ঝকঝকে বাড়িটারই পিছনে সরু রাস্তার ধারে একটি সেকেলে চেহারার পুরনো বাড়িতে থাকেন। তাঁরই মেয়ে বিনীতা!

ঝকঝকে চেহারার মেয়ে না হয়েও ধ্রুবজ্যোতিদের এই ঝকঝকে বাড়িতে রোজ আসে বিনীতা, আর কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে এই বাড়ির মানুষগুলির মনগুলিকে....না, ঠিক ভিজিয়ে দিয়ে যেতে পারে না বিনীতা। বিনীতার কথা শুনে এই বাড়ির মানুষগুলির মন শুধু হাসে আর মজা পায়।

স্ট্যাটিস্টিক্‌সের মোটা মোটা বই, যার মধ্যে শুধু রাশি রাশি অঙ্ক কিলবিল করে, সেই বই-এর পাতার উপর থেকে গভীর মনোযোগের চক্ষু তুলে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে আর হাসতে বাধ্য হয় ধ্রুবজ্যোতি। কথা বলতে আরম্ভ করেছে বিনীতা। পাঁচটা সেকেন্ডও থামে না। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বাধা দিলেও উত্তর দিতে দু' সেকেন্ডও দেরি করে না বিনীতা। ওর মুখের ভাষা যেন কোন ভাবনার অপেক্ষায় এক মুহূর্তও থমকে থাকে না।

ধ্রুব হাসে, ধ্রুবর বোন শোভা হাসে, আর মেজবউদিও হেসে হেসে আবার প্রশ্ন করেন—শুনলাম, তুমি নাকি ঘরের ভেতরে একাই কথা বল বিনীতা?

বিনীতা—তা বলি বইকি।

শোভা—ঘুমের মধ্যেও কথা বল বোধ হয়?

বিনীতা—হ্যাঁ, সেদিন বাবাই তো হঠাৎ ঘরে ঢুকে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন, বিড়বিড় ক'রে কি বকছিস্‌ বিনী?

ধ্রুব—স্বপ্নের মধ্যেও কথা বল নিশ্চয়?

বিনীতা—হ্যাঁ, মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। একদিন স্বপ্নের মধ্যে আস্ত একটা গানই গেয়ে ফেলেছিলাম।

মেজবউদি—কিন্তু তুমি একটু চুপ করবে কবে?

বিনীতা—কোনদিনও না! যেদিন সবাইকেই চোখ বুজে চিরকালের

মত চুপ ক'রে যেতে হয়, সেদিনও আমি বোধ হয় চুপ ক'রে থাকতে পারব না।

ধ্রুব—তার মানে?

বিনীতা—একেবারে চুপ করার আগেও একটা কথা বলে নেব।

ধ্রুব—কি কথা?

বিনীতা—বলব, এইবার আমাকে চুপ করিয়ে দাও ভগবান!

ঘরসুদ্ধ মানুষ হাসে। ধ্রুব, মেজবউদি আর শোভা। বিনীতা সত্যিই কথামালা। শুধু কথার জন্যই অনর্গল কথা বলে আর লোক হাসায় বিনীতা। বিনীতা চলে যাবার পরেও এই ঝকঝকে বাড়ির মানুষগুলির মুখে এই প্রশ্ন হাসতে থাকে, কবে নীরব হবে কথামালা?

কিন্তু শুধু এই একটি প্রশ্ন নয়, আরও একটি প্রশ্ন এই বাড়ির ভিতরে মুখর হয়ে হাসতে থাকে। বিনীতার মুখরতার কোন অর্থ নেই, না থাকুক, কিন্তু এই বাড়িতে আসে কেন বিনীতা? বিনীতার এই বাড়িতে রোজই একবার বেড়াতে আসার ব্যাপারটাও কি নিতান্ত অর্থহীন?

দুই

এক জোড়া ময়লা মখমলের চটির চটপট শব্দকে যেন দু' পায়ে বাজাতে বাজাতে পথ চলে বিনীতা। পথে যেতে মুখোমুখি দেখা হয় সুব্রতার জেঠামশাই মাধববাবুর সঙ্গে। মাধববাবু হেসে হেসে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—ভাল আছ তো বিনীতা?

বিনীতা—ভাল তো থাকবই জেঠামশাই। দু' বেলা ফুলকপির খিচুড়ি চালাচ্ছি, যা সস্তা হয়েছে ফুলকপি, ভাল না থেকে পারব কেমন ক'রে বলুন?

চলে গেলেন সুব্রতার জেঠামশাই। বিনীতাও তার তড়বড়ে দুই পায়ে ময়লা মখমলের চটি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়। দেখা হয় শুভ্রার মাসীমার সঙ্গে। শুভ্রার মাসীমা প্রশ্ন করেন—কোথায় চললে বিনীতা, কি মনে ক'রে?

বিনীতা বলে—কিছু মনে ক'রে কোথাও যাচ্ছি না। মন থাকলে তো মনে করব মাসীমা! শুভ্রার বর যে এসেছিল, আর শুভ্রা যে আমাকে একবার যেতে বলেছিল, সে কথা একটি বার মনেও পড়ল না। আমার মনই নেই মাসীমা, শুধু আমি আছি।

কেউ প্রশ্ন না করলেই বা কি! বিনীতা মল্লিক যেন শুনতে পায়, বাতাস জুড়ে প্রশ্ন ভাসছে। এবং কেউ কোন প্রশ্নের লজ্জায় চুপি চুপি মুখ আড়ালে ক'রে সরে পড়বার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়, বিনীতাই প্রশ্ন ক'রে তাকে পথের উপর থামিয়ে রাখে।

যেতে যেতে হঠাৎ পথের উপর থমকে দাঁড়াল বিনীতা। দেখতে পেয়েছে বিনীতা, বেশ সেজে-গুজে স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে অনুরাধা। মুখটা আড়াল ক'রে বিনীতার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল অনুরাধা, কিন্তু খপ্ ক'রে অনুরাধার একটা হাত ধরে ফেলে বিনীতা। স্বামী ভদ্রলোক দু' পা এগিয়ে এবং একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরান।

বিনীতা প্রশ্ন করে—শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে ফিরলে অনু?

অনুরাধা বলে—কাল।

বিনীতা—এখন যাচ্ছ কোথায়?

অনুরাধা—বেড়াতে।

বিনীতা—কিন্তু শুধু দু'জনে কেন? তৃতীয় ব্যক্তিকে কার কাছে রেখে এলে?

অনুরাধা আশ্চর্য হয়—তার মানে?

বিনীতা চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার বেবি কোথায়?

অনুরাধা—আঃ, পথের মাঝে চেঁচিয়ে পাগলামি ক'রো না বিনীতা!

বিনীতা—পাগলামির কি দেখলে? চেঁচিয়ে কথা বলছি বলে?

অনুরাধা হাসে—বিয়ের পর ছ' মাসও যেতে না যেতে বেবি কেমন ক'রে পাওয়া যায়?

বিনীতা অনুরাধার হাত ছেড়ে দেয়—এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। কিছু মনে ক'রো না।

ঘাড় ঝাঁকিয়ে এলোমেলো খোলা চুলের বোঝা পিঠের উপর তুলে দেয় বিনীতা। আঁচলটা হাওয়ার দোলায় বার বার কাঁধ থেকে খসে পড়ে যায়। আঁচলের একটা কোণ খপ্ ক'রে ধরে গলার চারিদিকে জড়িয়ে ফস্ ক'রে একটা ফাঁস এঁটে দেয় বিনীতা। তারপর আবার সেই রকমই ভঙ্গীতে দু'টি তড়বড়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর ময়লা মখমলের চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে যায়।

একটু সাজলে নিশ্চয়ই ভাল দেখাবে বিনীতাকে। কিন্তু সাজের নামে দিব্যি। শুভ্রার বিয়ের দিনে, একটা উৎসবের বাড়িতে এত বড় রঙীন একটা ভিড়ের মধ্যে যেতে হয়েছিল বিনীতাকে; সেদিনও দেখা গেল, ভাল ক'রে চুল পর্যন্ত আঁচড়ায়নি বিনীতা। বোধ হয় রান্না করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল যে, শুভ্রার বিয়েতে যেতে হবে। শাড়ির গায়ে এখানে ওখানে হলুদের দাগ লেগে রয়েছে, কিন্তু তার জন্য বিনীতার চোখে কোন দুশ্চিন্তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কিন্তু বিনীতা কখনও রাগ করেছে বলে শোনা যায়নি। কথার চালচুলো নেই, রাইচরণ মল্লিকের ঐ আধ-পাগলা মেয়েটার মুখরতার জন্য পাড়ার কোন

ঘটনার মন গম্ভীর হয়ে যায় না। ওর কথা ধরতে নেই, ওর কথার কোন অর্থ হয় না। ওর কথার কোন মূল্য নেই।

—আবার এস বিনীতা। শুভ্রা হোক, সুব্রতা হোক, কিংবা অনুরাধা, সকলেই বিনীতাকে হেসে হেসে বিদায় দিতে পারে। ওরা খুশী হয়েই বিনীতাকে আর একবার আসবার জন্য অনুরোধ করে। এ ছাড়া ওদের হাসির মধ্যেও আর কোন অর্থ নেই।

তিন

কিন্তু ঐ একটি বাড়ির হাসি, ধ্রুবজ্যোতিদের ঝকঝকে বাড়ির হাসিটার মধ্যে যেন কঠিন একটি অর্থ লুকিয়ে আছে। ধ্রুব হাসে, মেজবউদি হাসেন, আর হাসে শোভা। ঝকঝকে বাড়িটা বিনীতার মুখরতায় হো হো ক'রে হেসে যেন বলে দিতে চায়—যাও বিনীতা।

কিন্তু বিনীতা তবু আসে। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বাড়িতে বিনীতা প্রায় রোজই আসে। এত আনমনা বিনীতা, মনই নেই যে বিনীতার, সেই বিনীতার বোধ হয় ঠিক মনে পড়ে যায়, সায়েন্স কংগ্রেস থেকে আজ ফিরে এসেছে এই ঝকঝকে বাড়ির ধ্রুবজ্যোতি সেন। নইলে ঠিক এই পনের দিন বাদ দিয়ে আজ এই সময় হঠাৎ কেমন ক'রে আর কেন এসে দেখা দেয় বিনীতা?

এই বাড়ির মনগুলিকে নিয়ে যেন মনের মত খেলা করবার একটা লোভে পেয়ে বসেছে বিনীতাকে! এই বাড়ির মনগুলি অবশ্য সেজন্য একটুও দুশ্চিন্তা করে না। ঝকঝকে বাড়ির চকচকে মনগুলি বেশ সাবধানেই থাকে। বিনীতা একটা খেলা খেলতে আসে, ওরাও বিনীতাকে যেন অবাধভাবে খেলতে দিয়ে আর খেলিয়ে খেলিয়ে ক্লান্ত ক'রে দেয়। না ধ্রুব, না মেজবউদি, না শোভা, কারও মুখের হাসি ক্লান্ত হয় না। বরং শেষে দেখা যায়, বিনীতারই মুখরতা যেন একটু হাঁপিয়ে আর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আবার এস বিনীতা, এ কথা হেসে হেসে বলতে পারে না এই ঝকঝকে বাড়ির চকচকে মনগুলি। ওরা জানে, না বললেও আসবে বিনীতা। তা ছাড়া মুরলী প্রেসের আশি টাকা মাইনের ম্যানেজার রাইচরণ মল্লিকের মেয়েকে মৌখিক ভদ্রতার ঐ ক'টি কথা না বললেও তো চলে।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের এখনও বিয়ে হয়নি। মেজদা এইবার তাই খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মেজবউদিরও মনের ব্যস্ততার অন্ত নেই। খুব তাড়াতাড়ি, এক মাসে না হয় বড় জোর দু' মাসের মধ্যে ধ্রুবর বিয়ে দিতেই হবে। ধ্রুবর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে প্ল্যানিং কমিশন খুশী হয়ে ধ্রুবকে একটা সার্ভিস

নেবার জন্য দিল্লীতে ডেকেছেন। বোধ হয় দিল্লীতেই থাকতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

নানা জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে চিঠি আসছে। মেয়ের ফটো আসছে। সেইসব চিঠির স্তূপ থেকে একটা চিঠি পড়ে, আর, সব ফটোর স্তূপ থেকে একটি ফটো বের ক'রে মেজবউদি বলেন—বাস, এই মেয়ে, এই মেয়েকেই চাই!

শোভা বলে—হ্যাঁ, এর চেয়ে ভাল মেয়ে খুঁজতে হলে পরীর দেশে যেতে হয়। মেজদাকে বল, আর একটুও দেরি না করে এই মেয়ের সঙ্গে রাঙাদার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলতে।

ধ্রুব এসে বলে—দেখি ফটো।

ফটো দেখবার পর ধ্রুব বলে—মেয়ের অন্য খবর একটু শোনাও দেখি মেজবউদি!

মেজবউদি বলেন—গ্র্যাজুয়েট, খেয়াল আর ঠুংরির কম্পিটিশনে পাঁচবার মেডেল পেয়েছে।

ধ্রুব হাসে—তবে আর কি?

ধ্রুবর মুখ দেখেই বোঝা যায়, ফটো দেখে ধ্রুবর চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রকম একটি সুন্দর মুখ বোধ হয় কল্পনায়ও আশা করেনি ধ্রুব।

ঠিক এই সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দেখা দেয় কথামালা বিনীতা। এবং কারও কোন প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই প্রশ্ন করে—ধ্রুবদার বিয়ের কি করলে মেজবউদি?

মেজবউদি বলেন—সবই করছি।

বিনীতা—তার মানে?

শোভা বলে—মেয়ে পছন্দ করাও হয়ে গিয়েছে।

বিনীতা—মেয়ের ফটো আছে?

মেজবউদি—আছে বইকি।

বিনীতা—কোথায়? দেখি একবার।

শোভা—ঐ যে রাঙাদার হাতে।

বিনীতাই এগিয়ে যায়; প্রায় ছোঁ মেরে ধ্রুবর হাত থেকে ফটো তুলে নিয়ে দু' চোখের কৌতূহল ঢেলে দেখতে থাকে। তাই বোধ হয় দেখতে পায় না বিনীতা, মেজবউদি মুখ টিপে হেসে হেসে শোভার হাতে একটা চিমটি কেটে ফেললেন. আর ধ্রুব মৃদু হেসে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—বাঃ, বেশ মেয়ে; বড় সুন্দর মেয়ে! ধ্রুবর হাতে ফটো ফিরিয়ে দিয়েই বিনীতা তার কথার ফোয়ারা ছড়াতে আরম্ভ করে। চুপ ক'রে, এবং মাঝে

মাঝে যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে ধ্রুব। আর, শোভা ও মেজবউদি ভুরু টান ক'রে শুনতে থাকেন। বিনীতা যেন আপন মনের আবেগে একটা থিয়েটারের আসরে দাঁড়িয়ে অভিনয় ক'রে চলেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে না বিনীতা। ছটফটে প্রজাপতির মত ঘরের বাতাসে এদিকে আর ওদিকে যেন উড়ে উড়ে বসছে বিনীতা। আবার উঠে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নয়; বিনীতা যেন কোন্ এক দূরের আকাশের দিকে অচঞ্চল দু' চোখের লক্ষ্য রেখে কথা বলে চলেছে। বলতে বলতে নিজেই মাঝে মাঝে ঝংকার দিয়ে হেসে উঠছে।—বেশ মেয়ে, বেশ সুন্দর মেয়ে, কিন্তু এই মেয়েকে দেখে তো সেই মেয়ে মনে হয় না, যে মেয়ে চুপি চুপি, আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে, চোরের মত পিছন থেকে এসে ধ্রুবদার কানে ফুঁ দিয়ে পালিয়ে যাবে! না মেজবউদি, এরকম মেয়ে হলে চলবে না।

মেজবউদি—কেমন মেয়ে হলে চলবে?

বিনীতা—তবে শোন, এত ফর্সা হলেও চলবে না। একটু শ্যামলবরন হবে ধ্রুবদার বউ। চোখ দুটো একটু বোকা বোকা। ধ্রুবদাকে চা দিতে এসে যেন চা দিতে ভুলেই যায়; আর ধ্রুবদার মুখের দিকে যেন ডগমগ হয়ে তাকিয়ে থাকে সে মেয়ের চোখ। তার কপালে ছোট একটি খয়েরের টিপ থাকবে। ধ্রুবদা হেসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতেই চমকে উঠবে, আর হেসে ফেলবে মেয়ে। আঁচল তুলে মুখের হাসি ঢাকতে গিয়েই এলোমেলো হয়ে যাবে হাতটা, খয়েরের টিপ একটু ধেবড়েও যাবে, তারপর....।

শোভা বলে—বলে যাও, থামলে কেন বিনীতা?

বিনীতা—তারপর একটি পাট-ভাঙ্গা তাঁতের শাড়ি পরে ধ্রুবদার একেবারে কাছে না এসে একটু দূরে এসে দাঁড়াবে সেই মেয়ে। ধ্রুবদার হাতের বই-এর উপর সেণ্ট-মাখানো রুমাল ছুঁড়ে দিয়ে, আর চোখের দুই ভুরুতে একটু রাগন্ত কাঁপুনি কাঁপিয়ে, গম্ভীর হয়ে বলবে, আজ তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারব না।

বিনীতার চোখের অপলক হাসিটা যেন হঠাৎ একটু নিবু নিবু হয়ে আসে।

মেজবউদি হেসে হেসে বলেন—তারপর কি হবে বিনীতা? বলে যাও, আরও বল, থামলে চলবে না।

বিনীতা বলে—তারপর ঐ পার্কের একটি কোণে; সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকবে সেই মেয়ের চোখ, কিন্তু এক হাত দিয়ে ধ্রুবদার একটা হাত ধরেই থাকবে।

কথা বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে যেন এলিয়ে পড়তে চায় বিনীতা। ক্লান্ত হয়ে আসছে কথামালার মুখরতা।

শোভা বলে—থামলে কেন বিনীতা?

বিনীতা বলে—কত লোক তাকাতে তাকাতে চলে যাবে, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। তাঁতের শাড়ির আঁচলটাকে এমন কায়দা ক'রে ছড়িয়ে দেবে সেই মেয়ে যে, একেবারে ঢাকা পড়ে থাকবে সে মেয়ের মিষ্টি হাতের ঐ খেলা। এই রকম একটি দস্তুরমত চালাক-বোকা মেয়ে চাই, তা না হলে ধ্রুবদার মত মানুষের সঙ্গে একটুও মানাবে না।

শোভা বলে—কথা ফুরিয়ে গেল নাকি বিনীতা?

বিনীতা ব্যস্তভাবে বলে—আজ আসি।

বিনীতার ক্লান্ত মুখরতাব সেই প্রতিধ্বনি শুনে হাসিব উচ্ছ্বাস একেবারে কলরোল তুলে মেজবউদি আর শোভার মুখে বেজে উঠতে থাকে। ধ্রুবও চোখ ফিরিয়ে তাকায় আর হাসি হাসি চোখ নিয়ে দেখতে থাকে, রাইচরণবাবুর মেয়ে বিনীতা তার ময়লা মখমলের চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে। যেন বিনীতার মুখরতার আত্মাটাই জব্দ হয়ে আর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

অনেকদিন আগেই সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে মেজবউদি আজ খুব সহজেই বুঝতে পাবেন, বিনীতার এই কথাগুলিকে শুনলে যতটা আবোল-তাবোল বলে মনে হবে, ভেবে দেখলে ততটা আবোল-তাবোল বলে মনে হবে না। মেজবউদির অনেকদিন আগেই মনে হয়েছে, শোভার মনে হয়েছে কিছুদিন আগে, আর ধ্রুব এই সেদিন থেকে মনে কবতে আরম্ভ করেছে, কেন বিনীতা এই বাড়িতে বার বার আসে। যে আশা কবা উচিত নয়, যে আশা বিনীতার মত মেয়ের পক্ষে মনের এক কোণেও পোষণ করা উচিত নয়, সেই আশাই যে বিনীতার মনের মধ্যে খেলা করে, সেটা বিনীতার চোখ দেখেই বুঝে ফেলতে পারেন মেজবউদি। ধ্রুব বাড়িতে না থাকলে কোনদিন এই বাড়িতে বিনীতা এসেছে বলে মনে পড়ে না। যদিও বা কোন দিন ভুল ক'রে এসে পড়েছে, তবে তখুনি চলে গিয়েছে, আর যাবার আগে শুধু জেনে গিয়েছে, ধ্রুব কবে ফিরবে।

আজ আরও স্পষ্ট ক'রে জানা গেল যে, বিনীতার ঐসব আবোল-তাবোল মুখরতার মধ্যে বড় বেশী অর্থ আছে, বড় বেশী দুঃসাহস আর আশা।

মেজবউদি বলেন—শুনলে তো ভাই, নিজের কানে শুনে এইবার বিশ্বাস কর।

ধ্রুব হাসে—ওর কথায় কি আসে যায়? ওর কথাতেই কি ভাল মেয়ে মন্দ মেয়ে হয়ে যাবে? আর আমিও কি ওর কথা বিশ্বাস ক'রে বসে আছি?

সুন্দর কথার জাল ছড়িয়ে এই ঝকঝকে বাড়ির মনের উপর একটা মায়া ছড়াবার চেষ্টা ক'রে চলে গেল বিনীতা। যেন ঐসব কথার মায়ায় পড়ে মেয়ে পছন্দ করতে না পারে এই বাড়ির চক্ষু আর মন। ধ্রুবর দুই চক্ষুর পছন্দকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিতে পারলে নিজের মনের একটা স্বপ্ন সত্য হতে পারবে, কত বড় দুরাশা দিয়ে বৃথাই নিজের মনটাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে রেখেছে বিনীতা!

শোভা বলে—সত্যিই বিনীতার জন্য দুঃখ হয়। বুদ্ধি থাকলে এরকম ভুল করত না।

মেজবউদি বলেন—ওর বুদ্ধির কোন অভাব তো দেখছি না। কিন্তু ভুল বুদ্ধি।

শোভা—শুনেছিলাম, বিনীতার বিয়ের জন্য রাইবাবু খুব চেষ্টা করছেন।

মেজবউদি—করছেন তো, কিন্তু সেই একই সমস্যা, টাকার অভাবের জন্য এক একটা ভাল সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

ধ্রুব হঠাৎ বলে ওঠে—আমরা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করলেই তো পারি।

মেজবউদি—তা রাইবাবু যদি এসে ওঁকে ধরেন, তবে কিছু সাহায্য তো করবেনই উনি।

কথা শেষ ক'রে ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে মেজবউদি বলেন—বিনীতার ওপর তোমার হঠাৎ এরকম সিমপ্যাথি তো ভাল নয় ভাই।

কি আশ্চর্য, প্ল্যানিং কমিশনের দপ্তরে বসে যিনি একেবারে অঙ্কে অঙ্কে মিল ঘটিয়ে আর হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দেবেন কিভাবে আর কোন্ হারে কারখানায় কাজ বাড়িয়ে তুলতে পারলে বিশ লক্ষ সাড়ে এগার হাজার টন অমুক সামগ্রী অমুক বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে, তিনিই তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ আর ব্যবস্থার প্ল্যানিং নিয়ে বেশ একটু হিসাবের গোলমালে পড়ে গেলেন! মেজবউদিকে ডাক দিয়ে বলেই ফেলল ধ্রুব—এখুনি বিয়ের কথা পাকাপাকি ক'রে ফেলো না মেজবউদি। খুব তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই।

মেজবউদি—ওই মেয়েকে পছন্দ হয়েছে তো?

ধ্রুব—হয়েছে বইকি।

মেজবউদি—আর কোন সম্বন্ধের চেষ্টা করব নাকি বল?

ধ্রুব হাসে—তা খোঁজ করতে দোষ কি? ভালর চেয়েও ভাল কি আর হয় না?

সম্বন্ধের খোঁজ হয়, খোঁজ পাওয়া যায় এবং মেজবউদি আবার মেয়ের ফটোর ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভাল মেয়ের আর সুন্দর মেয়ের মুখ বাছতে বাছতে দিশেহারা হয়ে যান।

শোভা বলে—এই তো একটি আরও ভাল মেয়ে, বউদি। কি সুন্দর টানা টানা চোখ আর ঢলঢল মুখ!

ঠিকই বলেছে শোভা। আগের মেয়েটির চেয়ে অনেক সুন্দর এই মেয়েটির মুখ। মেয়েটি যদিও গ্র্যাজুয়েট নয়, কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে বইকি; বি-এ পরীক্ষাটা শুধু দিয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া, কি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এলাহাবাদের অধ্যাপক বিনয়বাবুর এই মেয়েটি! বিনয়বাবু চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর মেয়ের হাতের আঁকা তিব্বতী স্টাইলের অনেকগুলি ছবি এই বছর বিদেশের টুরিস্টরা কিনে নিয়ে গিয়েছে।

এলাহাবাদের মেয়ের ফটো ধ্রুবর চোখের সামনে তুলে ধরেন মেজবউদি, এবং বিনয়বাবুর চিঠি পড়ে শোনাতেও থাকেন। ধ্রুব বলে—এই জন্যই তো তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছিলাম। ভাল মেয়ে পেতে হলে একটু দেরি করতে হয়।

মেজবউদি—শেষে এর চেয়েও ভাল মেয়ে দরকার হবে না তো?

ধ্রুব—আরে না মশাই, না।

মেজবউদি—তা হলে বিনয়বাবুকে পাকা কথা জানিয়ে দিই, কেমন?

ধ্রুব বলে—জানিয়ে দাও।

হঠাৎ বিনীতার আবির্ভাব। ঘরে ঢুকেই বিনীতা মেজবউদির হাত থেকে ফটো তুলে নিয়ে বলে—এইবার নিশ্চয় আরও ভাল মেয়ের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে?

মেজবউদি—হ্যাঁ, খোঁজ করলে নিশ্চয়ই যে পাওয়া যায়!

ফটোর উপর চোখ রেখে রেখে চেঁচিয়ে ওঠে বিনীতা—এই মেয়ে বাস্তবিক ভাল মেয়ে! দিব্যি মেয়ে, কিন্তু....।

ধ্রুব তার চোখের বিরক্তি আড়াল করাব জন্যই চোখেব কাছে বই তুলে পড়তে থাকে। মেজবউদি আস্তে একবাব শোভার হাতে চিমটি কাটেন।

বিনীতা বলে—কিন্তু এই মেয়ে তো ধ্রুবদার মত মানুষের চোখের কাছে আর মনের কাছে মানাবে না। না না না, এই মেয়ে চলবে না মেজবউদি। এই মেয়ের চোখ বড় বেশী টানা টানা, এই মেয়ের মুখ বড় বেশী ঢলঢল। আমার খুব সন্দেহ হয় শোভা, এই মেয়ে ধ্রুবদাব চোখের সামনে বসে শুধু আকাশের মেঘের ছবি আঁকবে, আর দেখতেও পাবে না যে, হঠাৎ বাতাসের ফুরফুরানিতে বেচারা ধ্রুবদার কপালের উপর ঢেউ-খেলানো চুলগুলি হেলে পড়েছে।

শোভা একটু শক্ত ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—তাতে হবে কি? ক্ষতি কি?

বিনীতা হেসে হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়।—না, এই মেয়ে নয়। ধ্রুবদার জন্য এমন মেয়ে চাই, যে মেয়ে দূরের ঐ ঘরের ভিতর থেকেই ঠিক দেখতে

পাবে যে, তার বরের কপালের উপর ঢেউ-খেলানো চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ফুরফুর করছে। সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় ক'রে উঠবে সেই মেয়ের হাত! আর এক মুহূর্তও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারবে না সেই মেয়ে; এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বেশ মিষ্টি ক'রে হাত দুলিয়ে আর আঙুল বুলিয়ে সেই ঢেউ-খেলানো চুল সরিয়ে দিয়ে বরের কপালের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবে তো বলব, আর্টিস্ট মেয়ে!

বিরক্ত হয়ে খটখটে শুকনো স্বরে মেজবউদি বলে ওঠেন—তারপর কি করবে? বরের সামনে ধেই ধেই ক'রে নাচবে?

বিনীতা—নাচবে বইকি, কিন্তু কখন্ নাচবে জান মেজবউদি? তোমাদের চোখের সামনে নয়। শ্রাবণ মাসের রাতে, যখন সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়বে আর ঝড়ের শব্দ ছুটোছুটি করবে, সেই সময় ওপরতলার ঐ ঘরে, দু' পায়ে ছোট্ট দুটি ঘুঙুর পরে রজনীগন্ধার শিষের মত আস্তে আস্তে শরীর দুলিয়ে একলাটি বরের চোখের সামনে নেচে নেচে সারা হবে সেই মেয়ে। তুমি এই ঘরের ভেতর খাটের ওপর শুয়ে শুধু ঝড়ের শব্দ শুনবে মেজবউদি; বরের মন-দোলানো সেই ঘুঙুরের শব্দ তুমি ছাই কিছু শুনতেও পাবে না।

শোভা বলে—থামলে কেন, হাঁপাচ্ছ কেন বিনীতা?

মেজবউদি—এমন মজার কথা বলতে গিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে পড়ছ কেন বিনীতা?

ধ্রুব বলে—আর বলতে পারবে না বিনীতা, ওর কথার স্টক ফুরিয়ে গেছে।

বিনীতা ছটফট ক'রে হেসে ওঠে—অনেক রাতে চাঁদ উঠবে আকাশে, সে মেয়ে কিছুতেই ধ্রুবদাকে ঘরের ভেতরে থাকতে দেবে না। জোর ক'রে হাত ধরে টেনে ছাদের ওপর নিয়ে যাবে। তারপর, যেই না ধ্রুবদা চাঁদের দিকে তাকাবার জন্য চোখ তুলতে যাবে, অমনি সেই মেয়ে ধ্রুবদার....।

মেজবউদি বলেন—ধ্রুবদার গলা টিপে ধরবে বোধ হয়।

বিনীতা—না না না, মাই ডিয়ার মেজবউদি। অমনি সেই মেয়ে ধ্রুবদার গলা এক হাতে টেনে ধরে বলবে, আগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নাও, তারপর চাঁদের দিকে তাকাবে।

শোভা—বসে পড়লে কেন বিনীতা? বলে যাও, বলে যাও, বেশ তো জমিয়ে কথা বলতে পারছ? এরই মধ্যে ফুরিয়ে যেও না।

ঠিকই, বসে পড়েছিল বিনীতা। এত উচ্ছল মুখরতার স্রোত যেন ওর মনের ভিতরে কতগুলি এলোমেলো শক্ত পাথরের বাধায় ফাঁপরে পড়েছে। উঠে দাঁড়ায় বিনীতা। চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। আচমকা এক ঝলক কৌতুকের ফোয়ারার মত হেসে ওঠে মেজবউদি আর শোভা। এবং সেই

হাসি যেন তাড়া দিয়ে বিনীতাকে ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বারান্দায়, তারপর সিঁড়িতে, তারপর একেবারে বাইরের পথের উপর নামিয়ে দেয়। চলে যায় বিনীতা।

এই রকমই একটা খেলা রোজই জমে ওঠে ঝকঝকে এই বাড়ির সুন্দর ক'রে সাজানো একটি ঘরের নিভৃতে। কখনো সকালে, কখনো বা সন্ধ্যায়। বিনীতা মল্লিকের মুখরতা এই ঘরের মুখখোলা হাসির ঠাট্টায় আর কৌতুকে, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি তীক্ষ্ণ এক একটি তুচ্ছতার তাড়ায় এইভাবেই ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। কি সাধ্যি আছে বিনীতার, এই বাড়ির মনের ইচ্ছাকে তার এইসব আবোল-তাবোল রং-মাখানো কথার মোহ দিয়ে মিথ্যা ক'রে দিতে পারে? বরং মেজবউদি, শোভা আর ধ্রুবজ্যোতির রং-মাখানো বিদ্রূপ-গুলিই যেন বিনীতাকে খেলিয়ে খেলিয়ে, হাঁপ ধরিয়ে দিয়ে আর জব্দ ক'রে ছেড়ে দেয়। এ বড় কঠিন ঠাঁই।

চার

ধ্রুবজ্যোতি মেজবউদিকে ডেকে প্রশ্ন করে হঠাৎ—এলাহাবাদের বিনয়-বাবুকে কি পাকাপাকি কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে?

মেজবউদি—না, এখনো জানানো হয়নি।

ধ্রুব—একটু ভেবে নিও বউদি, ঝট ক'রে নয়, একটু দেরি ক'রে চিঠির উত্তর দিও।

মেজবউদি—কেন? আবার কি হল?

ধ্রুব—কি হবে আবার? সবই ঠিক আছে।

মেজবউদি—ঠিক ক'রে বল ভাই, যদি বিনয়বাবুর মেয়েকে তেমন পছন্দ না হয়ে থাকে তবে আর একটি মেয়ের ফটো দেখতে পার।

ধ্রুব—দেখাও তা হলে।

আর একটি ফটো নিয়ে এসে মেজবউদি বলেন—এই ফটো কাল এসেছে। এই মেয়ে প্রায় তোমার মতই স্কলার। হিস্ট্রিতে রিসার্চ করছে। মেয়ের বাবা লিখেছেন, ডক্টরেট পাবেই পাবে তাঁর এই একমাত্র মেয়ে। আমি আর শোভা এতক্ষণ এই কথাই বলাবলি করছিলাম।

ধ্রুব—কি কথা?

মেজবউদি—এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হলে ভাল হয়।

ফটোর দিকে তাকিয়ে খুশী হয়ে ওঠে ধ্রুবজ্যোতির চোখ। এবং হঠাৎ একটু লজ্জিত হয়ে বলে—চেহারাও তো বেশ ভালই দেখছি, কিন্তু এই মেয়ে কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে?

শোভা রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে—হঠাৎ তোমার মনে এত তৃণাদপি বিনয় দেখা দিল কেন রাঙাদা?

ধ্রুব হাসে—একটু বেশী পছন্দ হয়ে গেলে মনে একটু বিনয়-টিনয় না হয়ে তো পারে না।

হঠাৎ দরজার পর্দা সরে যায়। এক টুকরো ঝড়ো হাওয়ার মত যেন দাপাদাপি করতে করতে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বিনীতা মল্লিক বলে—নতুন ফটো এসেছে বুঝি?

আবার এসেছে বিনীতা। মেজবউদি আর শোভা সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারে না। ওর এই দুঃসাহস বোধ হয় সেইদিন ফুরিয়ে যাবে, যেদিন সত্যিই ধ্রুবজ্যোতির বিয়ে হয়ে যাবে। ততদিন পর্যন্ত এই ঝকঝকে বাড়ির ভিতরে এসে কথার মালা দুলিয়ে মায়া ছড়াবার খেলা বন্ধ করতে পারবে না বিনীতা। বোধ হয় সত্যিই বিশ্বাস করেছে বিনীতা, ওর ঐসব রং-মাখানো কথার শব্দ শুনে ধ্রুবজ্যোতি সেনের মত মানুষের মনের পছন্দও রং বদল ক'রে ফেলছে। মনে মনে বোধ হয় খুশী হয়েছে বিনীতা, ধ্রুবর বিয়ের জন্য এই বাড়ির এক একটি পাকাপাকি ইচ্ছার অদৃষ্ট বার বার ভেঙে যাচ্ছে। এই বিশ্বাস নিয়েই রাইবাবুর মেয়ে বিনীতার মনের আশা দুঃসাহসী হয়ে থাকুক। এই ঝকঝকে বাড়িও ওকে শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে আর হাঁপ ধরিয়ে ছেড়ে দেবে, যতদিন না এই বাড়িতে ঐ আশা নিয়ে আসবার সাহস ছেড়ে দেয়।

আবার জমে উঠুক খেলা। মনে মনে শক্ত হাসি হেসে প্রস্তুত হন মেজবউদি আর শোভা। অপলক চোখ নিয়ে ফটো দেখছে বিনীতা। দেখুক, এই বাড়ির চোখগুলিও দেখবে, বিনীতা আজ কোন্ রঙের আর কোন্ গন্ধের ফুল দিয়ে তার কথার মালা তৈরি করে।

খেলা দেখবার জন্য তৈরী হয় ঝকঝকে বাড়ির তিনটি মানুষের কৌতুক-সুখী চক্ষু। হাততালি দিয়ে নীরব পাগলা ঘোড়াকে আরও জোরে ছুটিয়ে দেবার মত একটা কৌতুকের হাততালি যেন এই ঝকঝকে বাড়ির মনের ইচ্ছার গভীরে নীরবে বাজতে থাকে।

—বেশ মেয়ে, খুব ভাল মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। ফটোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিড়বিড় ক'রে বলতে থাকে বিনীতা। তারপর ধ্রুবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ টিপে হেসে ফেলে বিনীতা—এই মেয়েকে ধ্রুবদার সঙ্গে খুব ভাল মানাবে। কোন সন্দেহ নেই মেজবউদি।

এ কি! ঝকঝকে বাড়ির প্রাণের এত প্রিয় এক কৌতুকের আশাগুলিকে যেন হঠাৎ ঠকিয়ে দিল বিনীতা। মেজবউদি আর শোভার গলার ভিতরে তৈরী হাসিগুলিও যেন হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে। বিনীতার চোখের চঞ্চলতায়

সেই দুঃসাহসের ছায়া কই? বিনীতার মুখরতা সেই দুরাশার কলরবের মত রং-মাখানো কথার ফোয়ারা ছড়ায় না কেন? তা না হলে খেলা জমবে কেমন ক'রে?

কথামালা কিন্তু ঠিকই কথা বলে যায়। —এবার পূজার সময় বেড়াতে যাব বলে মনের আহ্লাদে অনেক স্বপ্ন দেখছি মেজবউদি। বাবা বলেছেন, পুরী গেলে ভাল হয়, দু' বেলা সমুদ্রে স্নান করা যাবে। আমি বলেছি, রাখ তোমার সমুদ্র। সমুদ্রের চেয়ে হিমালয় ঢের ঢের ভাল, পুরীর চেয়ে দার্জিলিং ভাল। সবচেয়ে ভাল ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গা; সবচেয়ে কম খরচে বেড়িয়ে আসা যাবে; ধারকর্জ করতে হবে না।

সবচেয়ে অদ্ভুত দেখায় ধ্রুবজ্যোতির চোখ দুটোকে। যেন হঠাৎ দীপ নিবে গিয়েছে, তাই হঠাৎ জ্যোতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ধ্রুবজ্যোতির দু' চোখের দৃষ্টি।

ইতিহাসের স্কলার, শিগগিরই ডক্টরেট পাবে, বেশ ভাল ও দেখতে সুন্দর একটি মেয়েকে যেন হঠাৎ হাত ধরে এক টান দিয়ে ধ্রুবর চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে হালকা হয়ে আর মুক্ত হয়ে আলগোছে দূরে সরে গিয়েছে বিনীতা।

কিন্তু কি দরকার? এইসব অনধিকার-চর্চার মধ্যে আসে কেন বিনীতা? এই মেয়ে ওর মনের দুরাশার ভুলে ধ্রুবর চোখের পছন্দকে শুধু বার বার বাধা দেবে, মেয়ের ফটো দেখে মনে মনে হিংসে করবে, আর কথার রং ছড়িয়ে চলে যাবে। এই তো ছিল বিনীতার জীবনের নিয়ম।

কথা বলছে বিনীতা, কিন্তু কি বাজে কথা! কথার মালা নয়, কথার ধুলো যেন। এসব কথা শোনবার জন্য কোন লোভ নেই ধ্রুবজ্যোতির কানে।

জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা করে ধ্রুব। —তুমি যে একেবারে ভুগোলের পড়া পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে বিনীতা, যত সব পাহাড় সমুন্দুর আর....।

ভূগোল ছেড়ে দিয়ে সেলাই-এর তত্ত্ব নিয়ে মুখরতা করে বিনীতা। —হাত বটে সুব্রতার। আপনি বোধ হয় দেখেননি মেজবউদি, একটা কাঁথা তৈরি করেছে সুব্রতা, কিন্তু কে বলবে ওটা একটা কাঁথা? দেখে মনে হয় একটা কাশ্মীরী শাল।

না, বিনীতাকে যেন সত্যিই একটা বধিরতার ভুলে পেয়েছে। নইলে শুনতে পেত বিনীতা, ধ্রুবজ্যোতির ঐ অভিযোগের মধ্যে কিসের একটা দুরন্ত আগ্রহ হঠাৎ আশাভঙ্গের বেদনায় আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। বোধ হয় খুব রাগ করেছে ধ্রুব; ঐ রং-মাখানো আবোল-তাবোল কথাগুলি, যে কথাগুলিকে এত সহজে আর এত সস্তা ক'রে এই বাড়ির প্রাণের উপর এতদিন ধরে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে বিনীতা, সেই কথাগুলি হঠাৎ এমন দুর্লভ হয়ে যাবে কেন?

বিনীতার মুখরতা হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য কেন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে ছটফট করে ধ্রুবজ্যোতির মন? বুকে জড়িয়ে ধরে রাখা জিনিস হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চমকে উঠতে হয়, বিনীতার মুখরতাগুলি যেন ঠিক তেমনি হঠাৎ একটা নিষ্ঠুরতার খেয়ালে আলগা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে ধ্রুবজ্যোতির মনটাকেই। নইলে······নইলে এরকম অস্বস্তি বোধ করবে কেন ধ্রুব?

ঝকঝকে বাড়ির বাগানে পামের মাথার উপর বসে বিকেলের কাক কলরব করে। মেজবউদি বলেন—আমি এখন চা খাব।

শোভা বলে—আমিও।

বিনীতা বলে—আমিও যাই, অনুরাধাকে একটু জ্বালিয়ে আসি।

চলে যান মেজবউদি, চলে যায় শোভা। বিনীতা চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। শুনতে পেয়েছে বিনীতা, হঠাৎ কি যেন বলে উঠছে ধ্রুব।

বিনীতা—কি বললেন ধ্রুবদা?

মুখ বড় বেশী গম্ভীর করেও ধ্রুব যেন হাসতে চেষ্টা করে। —এতক্ষণ এখানেই তো বেশ জ্বালাচ্ছিলে, হঠাৎ অনুরাধাকে জ্বালাবার শখ হল কেন?

খলখল ক'রে হেসে হেসে দুলতে থাকে বিনীতা—কিন্তু আর জ্বালাব কেমন ক'রে? মেজবউদি পালিয়ে গেলেন, শোভাও সরে পড়ল।

ধ্রুব বলে—আমি তো আছি, সরেও পড়িনি।

বিনীতার মুখরতা একটু গম্ভীর হয়ে যায়! —আপনাকে কিন্তু আমি সত্যিই কোনদিন জ্বালাতে চেষ্টা করিনি।

ধ্রুব হাসে—তা হলে ব'সো, এখুনি চলে যেও না।

—সে কি! যেন নিজের মনেই বলে ফেলছে বিনীতা। দু' চোখে চমকে উঠেছে অদ্ভুত এক ভীরু ভীরু বিস্ময়। ঝকঝকে বাড়ির হাসি-ভরা মুখে কোনদিন যে অনুরোধ ধ্বনিত হয়নি, সেই অনুরোধ আজ হঠাৎ এইভাবে, এই বিকেলের আলোতে, এই একা ঘরের নিভৃতে বিনীতাকে প্রথম বাধা দিয়ে এ কি কথা বলছে? এখুনি চলে যেও না!

ধ্রুব বলে—আশ্চর্য হয়ে গেলে কেন? কি এমন অদ্ভুত কথা বলেছি?

বিনীতা হাসে—আশ্চর্য হইনি, খুব সন্দেহ করছি ধ্রুবদা, আপনি নিশ্চয় আমাকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পেয়েছেন।

ধ্রুব বিব্রতভাবে তাকায়—কি শুনতে পেয়েছি?

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে যেন একটা নতুন হাসির কল্লোল চাপা দিতে চেষ্টা করে বিনীতা।

ধ্রুব বলে—কি হল?

বিনীতা—আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমি আর আপনাদের জ্বালাতে আসতে পারব না।

ধ্রুব—না, আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি যে, তুমি আসবে না!

বিনীতা—রাইচরণ মল্লিকের মেয়ের যে বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত....।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের চক্ষু হঠাৎ যেন সব জ্যোতি হারিয়ে অন্ধের মত তাকিয়ে থাকে।

বিনীতা—আজই সন্ধ্যায় আশীর্বাদ করতে আসবে।

ধ্রুবজ্যোতি জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে আর হাসে—তাই বল!

চেয়ারের উপর চুপ ক'রে বসে হাতের বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে রাশি রাশি অঙ্কের ভিড় দেখতে থাকে ধ্রুব। বিনীতা অন্য একটা চেয়ারের উপর বসে নিজের মুখরতার আবেগে কত কথা ছড়াচ্ছে, তার একটা শব্দও যেন কানে শুনতে পাচ্ছে না ধ্রুব। কি হবে শুনে? ওসব কথা কোন কথাই নয়; যেন শুকনো ধুলোর মত কতগুলি বাজে কথার একটা আঁধি মাতামাতি করছে। বিনীতার রঙীন কথার মালা এখন ওর স্বপ্নের মধ্যে দুলছে, পৃথিবীর একটি মানুষের গলা জড়িয়ে ধরবার জন্য। আজই সন্ধ্যায় একটা আশীর্বাদ এসে এই বাড়ির পিছনের ঐ সদর রাস্তার কিনারায় একটি পুরনো বাড়ির বুক হাতড়ে এক আবোল-তাবোল মনের মেয়েকে লুফে নিয়ে চলে যাবে। আজই সন্ধ্যায় তাঁতের শাড়ি পরবে আর কপালে খয়েরের টিপ আঁকবে বিনীতা।

কি হবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে? বিনীতার মুখের দিকে তাকাতে পারে না ধ্রুব। অনেক রাতে যখন চাঁদ উঠবে আকাশে, তখন ওর ঐ মুখই তো একটি মানুষের চাঁদ দেখার বাধা হয়ে উঠবে। যেমন মেজবউদির, তেমনি শোভার, আর তেমনি ধ্রুবর নিজেরও চোখ দু'টো এতদিন ধরে মূর্খের মত বিনীতাকে শুধু ভুল বুঝেছে। এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারেনি যে, ঐ মেয়ে প্ল্যান ক'রে এই বাড়ির সব হাসির অহংকারকে ঠকিয়ে দেবার জন্যই এতদিন এখানে এসেছে।

সহ্য করতে কষ্ট হয়, তাই বোধ হয় হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ধ্রুব। —এবার তা হলে ছোট ছোট ঘুঙুর যোগাড় ক'রে ফেল বিনীতা।

বিনীতা আশ্চর্য হয়ে হাসে—ঘুঙুর? ঘুঙুর দিয়ে আমি কি করব ধ্রুবদা? বরের সামনে ধেই ধেই ক'রে নাচব?

ধ্রুব—কেন, শ্রাবণ মাসে কোন ঝড়ের রাত কি পাওয়া যাবে না? একলাটি বরের চোখের সামনে রজনীগন্ধার শিষের মত দুলে দুলে....।

হাসিমুখর বিনীতার দু' চোখে হঠাৎ যেন ব্যথার্ত বিস্ময় চমকে ওঠে। —আপনি আমাকে বুঝতে খুবই ভুল করছেন ধ্রুবদা। আমার ওসব কোন সাধ্যিই নেই।

ধ্রুবর দু' চোখ হঠাৎ দপ ক'রে জ্বলে ওঠে—তবে তুমি এতদিন ধরে এত কথার রং ছড়িয়ে আমাকে কি বোঝাতে চেয়েছিলে ?

ভয় পায় বিনীতা—ছিঃ, এ কি বলছেন! আমি কোনদিন আপনাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করিনি। বিশ্বাস করুন। ইচ্ছা ক'রে, কোন ইচ্ছা নিয়ে আমি ওসব কথা বলিনি। ওসব কথা আমার স্বপ্নের আবোল-তাবোল গানের মত কতগুলি আবোল-তাবোল সাধের চিৎকার মাত্র। বলতে ভাল লাগে, সেই-জন্যই বলি।

ধ্রুব—তা হলে তুমি কি ?

বিনীতার মনের ভয়টাই যেন কেঁপে কেঁপে কথা বলে। —আমি একেবারে একটা অচল সিকি ছাড়া আর কিছু নই। আমি ওসব কিছুই করতে জানি না, আমি ওসব কিছুই বলতে পারি না।

ধ্রুব—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিনীতা—বিশ্বাস করুন, আর আমাকে এইবার যেতে বলুন।

চুপ ক'রে বিনীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ধ্রুব। এই মেয়েকে অবিশ্বাস করতেই ভাল লাগছে আজ। ওর কোন কথা বিশ্বাস ক'রে ওকে চলে যেতে দিলে যেন চিরকালের মত ঠকে যাবে ধ্রুবজ্যোতি সেনের জীবন। ধ্রুবর মন তাই যেন কঠিন প্রতিজ্ঞার দুই বাহু বিস্তার ক'রে পথ আটক ক'রে ধরে রাখতে চাইছে সেই মেয়েকে, যে মেয়ে শুধু একটা ফটোকে তার চোখের সামনে ঠেলে দিয়ে আর কল্পলোকের মধুরতাগুলিকে নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছে।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বলে—অনেক রাতে চাঁদ উঠবে যখন আকাশে, তখন ছাদের ওপর একলা বরের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমিই তো অনায়াসে সেই রং-মাখানো কথা বলতে পার....।

বিনীতা যেন দুই হাতে চোখ ঢাকতে চায়। মাথা হেঁট ক'রে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে রাইচরণ মল্লিকের মেয়ে। —না না না, আমি ও কথা বলতে পারি না। আমার সে সাহস নেই, সে সাধ্যিই নেই। আমি তাকে শুধু বলতে পারি, কখখনো ভুল ক'রে এই মেয়ের মুখের দিকে তাকিও না, তা হলেই ঠকবে, শুধু চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাক।

চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে বিনীতার সামনে এসে দাঁড়ায় ধ্রুব। হেসে হেসে বলে—এ তো আরও বেশী রং-মাখানো কথা হয়ে গেল বিনীতা।

ঝকঝকে বাড়ির বাগানের পামের উপর বসে আর কলরব করে না কোন কাক। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চেয়ার ছেড়ে ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ায় বিনীতা। এই বাড়ির হাসির কৌতুকটাকে শেষবারের মত ভয় ক'রে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত

হয়ে উঠেছে বিনীতার মন। চলে যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায় বিনীতা।

ধ্রুব—একটা কথা জেনে যাও বিনীতা।

বিনীতা—বলুন।

ধ্রুব—তুমি অনেকবার আমার বিয়ে ভেঙেছ, কিন্তু আমিও যে তোমার বিয়ে ভেঙে দিতে পারি।

বিনীতা—তাতে আপনার লাভ?

ধ্রুব—তা হলে শোন।

বিনীতার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধ্রুবজ্যোতি সেন।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরের দরজাব পর্দা ঠেলবার আগে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন মেজবউদি। এ কি! কথামালা যে এখনও আছে, এখনও এই ঘরের ভিতর বসে আবোল-তাবোল কথা ছড়াচ্ছে!

—না না না, আপনি সত্যিই ঠকবেন। পৃথিবীর এত ভাল মেয়ে থাকতে আপনি কেন ভুল ক'রে....মিছিমিছি· ..আপনার মত মানুষ কেন, আঃ।

নীরব হয়ে গেল কেন কথামালা? কথা বলে না কেন বিনীতা? দরজার পর্দা আস্তে সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই চমকে সরে আসেন মেজবউদি।

ঠিকই তো! কথা বলবে কেমন ক'রে মেয়েটা? ওভাবে মুখ বন্ধ ক'রে দিলে কোন মেয়েই কথা বলতে পারে না।

প দা ঙ্ক

সতীনাথ ভাদুড়ী

প্ল্যাটফর্মের যেখানটায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িটা দাঁড়াবে সেইখানটুকুতেই ভিড়। প্রথম লাইনে দাঁড়িয়েছেন 'সি টাইপ কোয়ার্টার'-এর বড় বড় অফিসাররা; দ্বিতীয় লাইনে 'বি টাইপ কোয়ার্টার'-এর অফিসাররা; আর তৃতীয় লাইনে আছেন 'এ টাইপ কোয়ার্টার'-এর অফিসের বাবুর দল। বুকের পাটা ঘরের আয়তন অনুযায়ী কম-বেশী। লাইন সাজানোর জন্য চেষ্টা করতে হয়নি; সরকারী কলোনির সবাই নিজের নিজের স্থান জানে। উর্দিপরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দাঁড়িয়েছে একটু দূরে। সকলেই নীরব, কেননা 'সি টাইপ কোয়ার্টার'-এর বড়-সাহেবরা পর্যন্ত এখন কথা বলছেন না নিজেদের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মের করবীতলার খেঁকি কুকুর দুটো পর্যন্ত যেন ধ্যানে বসেছে। রেলিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সরকারী কলোনির ছেলেমেয়ের দল, তিন দলে ভাগ হয়ে। সেখানেও এই সি টাইপ, বি টাইপ, আর এ টাইপের ভাগাভাগি।

দূরে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। হাত দিয়ে জামাকাপড় ঝেড়ে নিয়ে সকলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এসে গেল গাড়ি। 'সিভিল লিস্ট'-এর অগ্রাধিকার অনুযায়ী গুলরাজানী সাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরার দরজা খুলতে গেলেন। নামলেন ডক্টর বোস। প্রৌঢ়, মাথা-জোড়া টাক, লম্বাচওড়া দেহ। গবাদি পশুর সংকর প্রজনন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। আমাদের এ-দেশী 'ব্রাহ্মণী' ষণ্ড ও বিলাতী 'এয়ারশায়ার' গাভীর বর্ণসংকরের উপর তাঁর গবেষণার খ্যাতি এখানকার গভর্নমেন্টের কানে পেঁৗছেছিল তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরবার আগেই। তারপর গত বাইশ বছর থেকে এখানকার এই বিরাট সরকারী গবেষণা-কেন্দ্রের সর্বময় কর্তা তিনি।

কিন্তু এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে তাঁর এই ক'দিনের মধ্যে! একেবারে মুষড়ে পড়েছেন! এত লোকজন সহকর্মীর দল কিছুই যেন নজরে পড়ছে না তাঁর। জিনিসপত্র গাড়ি থেকে নামানো হল কিনা সেদিকে খেয়াল নাই। গেরস্থ বাড়ির সদ্য-বিধবা বউও বুঝি এরকম উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখায় না। কেউ ঠিক এরকমটা আশা করেনি অমন একজন জাঁদরেল সাহেবের কাছ থেকে। তার উপর মেমসাহেব যে কি চিজ ছিলেন একখানি, সে কথা কে না জানে! তাঁরা স্টেশনে এসেছিলেন চাকরির অঙ্গ হিসাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কর্তব্য করতে; কিন্তু গভীর শোকের মূর্ত রূপ দেখা মাত্র নিজেদের অজানতে

জড়িয়ে পড়লেন তার আবর্তে। বড়দের এই অনবধানতার মুহূর্তে ছেলে-পিলের দল সি টাইপ-এ টাইপের ব্যবধান ভুলে রেলিং ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সকলেই বোসসাহেবের কাছে যেতে চায়। বউরা কিন্তু এরকম সময়েও লাইন ভাঙ্গতে পারেন না। সি টাইপ অফিসাররা 'কর্ডন' করে ঘিরে ডক্টর বোসকে নিয়ে চলেছেন মোটরগাড়িতে তুলে দেবার জন্য। দুটি অপেক্ষাকৃত বড় মেয়ে সঙ্কোচে রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকতে পারেনি। তার মধ্যে একটি মেয়ের চোখে জল। এত অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও কি করে যেন ডক্টর বোসের নজর গেল চোখে জলভরা রেবার দিকে।

"আমার স্ত্রী ওই মেয়েটিকে খুব পছন্দ করতেন।"

স্বগতোক্তির মত শোনাল, যদিও কথাটা বলা গুলরাজানী সাহেবকে। গুলরাজানী সাহেব তাকালেন রেবার দিকে; কাজেই বি টাইপ, এ টাইপ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সব কর্মচারীই তাকাল সেদিকে। এ টাইপের মধ্যে রেবার বাবাও ছিলেন।

'গ্রেড' অনুযায়ী দল বেঁধে বাড়ি ফেরবার সময় সকলে সেদিন শুধু মেমসাহেবেরই গল্প করে।....কড়া, আর বদমেজাজী হলে কি হয়, মানুষটি ছিলেন ভাল। বোসসাহেবের মত জাঁদরেল স্বামীকে শাসনে রাখতে গেলে ঐরকম কড়া টাইপের মেমসাহেবেরই দরকার। এক একদিন স্বামীকে জুতো দিয়েও পেটাতেন; ইংরেজের মেয়ে তো! তবে হ্যাঁ, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া কোন্ বাড়িতে না হয়! মনটা ভাল ছিল তাঁর; এই অগ্নিমূর্তি—এখনই আবার জল! খানসামাকে একবার চায়ের কাপ ছুঁড়ে মেরে তারপর দশ টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন। আর চেহারা ছিল কি! লম্বায় চওড়ায় বোসসাহে-বেরই সমান। দুজনেরই পালোয়ানের মত চেহারা! যে ওঁকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারবে তাকেই উনি বিয়ে করবেন, বোধ হয় এই রকমই ছিল মেম-সাহেবের পণ কুমারী অবস্থায়!......

সেদিনকার শোকজ্ঞাপনের পর্ব তো এইভাবে মিটল। রেবার কিন্তু খুব খারাপ লাগছিল অমন দিনে মেমসাহেবকে নিয়ে বড়দের মধ্যে ওইসব সস্তা হাসিঠাট্টা।

জীবনে মাত্র দু' দিন সে মেমসাহেবের কাছে যেতে পেয়েছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার ভদ্রমহিলাকে।

লোকে যে যা খুশি বলুক তাঁর সম্বন্ধে।

মেয়ে স্কুলের 'স্পোর্টস'-এর দিন এই লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি প্রথম মিসিজ বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাইজ দেবার সময় রেবাকে একটু আদর করে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—"আমাদের বাড়িতে একবার যেও।"

রেবা ছাড়া আর সব মেয়েই অবাঙালী। তারা বলল, স্বামী বাঙালী

কিনা, তাই মেমসাহেব রেবা মিত্রকে বাড়িতে যেতে বলেছেন। মিসিজ বোসের আচরণ সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কেননা তিনি কোনদিন এখানকার বড় অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে পর্যন্ত মেলামেশা করেননি। এখান থেকে সতর মাইল দূরের ইউরোপীয় ক্লাবে তিনি যেতেন প্রত্যহ।

একে সি টাইপ কোয়ার্টারের ভয়, তার উপর মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলবার ভয়। রেবা কখনই যেত না; কিন্তু মা-বাবার মত হল যে, যখন বলেছেন তখন যাওয়াই উচিত; না গেলে দেখায় খারাপ। কাজেই বাবার চাকরির খাতিরে রেবাকে যেতেই হল বড়সাহেবের কুঠিতে। সেই হল দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ মিসিজ বোসের সঙ্গে। সি টাইপ কোয়ার্টারের বাথরুমের বৈশিষ্ট্যই ছোটবেলা থেকে তাদের কৌতূহলের খোরাক যোগাত; কিন্তু বসবার ঘরের জিনিসপত্রের ধরন যে এরকম হতে পারে, সে কথা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি এর আগে। তার ভয় করছে দেখে মেমসাহেব তাঁর কুকুরটাকে চেন দিয়ে বাঁধলেন। তারপর রেবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। খ্রীস্টানী এঁটো কপালে লেগে থাকায় তার গা ঘিনঘিন করে। মেমসাহেব কত কি জিজ্ঞাসা করলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে, তারপর এল সেই প্রত্যাশিত ফাঁড়া। তিনি কেক খেতে দিলেন। রেবা খেল না। তিনি চটে উঠে বললেন—"হামি মেহটর না আছি।"

রেবা ভয়ে ভয়ে বলে—"খেলে মা বকবেন।"

রঙিন ছাতাটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন—"চল তোমার মার কাছে।"

ভয়ে তার বুক দুরদুর করে। কি আবার করে বসবেন মেমসাহেব কে জানে! গটগট্ করে জোরে জোরে পা ফেলে তিনি হাঁটছেন; রেবাকে ছুটতে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। হুলস্থূল পড়ে গেল এ টাইপ কলোনিতে। রেবার মা বাড়ির দরজা খুলে দিতেই মেমসাহেব বললেন যে, ভিতবে ঢুকে তিনি তাঁদের ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করতে চান না; শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন যে, রেবাকে যদি তিনি কোন জিনিস উপহার দেন তা হলেও কি তাঁর জাত যাবে? হ্যাঁ কি না তাই তিনি শুনতে চান; বেশী কথা খরচ করবার দরকার নাই।

রেবার মা বললেন—"না।"

"আর যদি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়, তা হলে?"

"জাত যাবে না।"

"মেয়ে ফিরে এলে একটু গঙ্গাপানি দিঁয়ে দেবেন গায়ে।"

গটগট্ করে মেমসাহেব চলে গেলেন বিদায়সম্ভাষণ করে।

এ হেন দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর মিসিজ বোসের কাছে আর কোনদিন যাওয়া হয়নি রেবার। ডাকতে এলে হয়ত যেত, কিন্তু গত দু বছরের মধ্যে তিনি ডেকে পাঠাননি।

দিন পনের আগে মেমসাহেব হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে

নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইয়ে, একটা কঠিন অপারেশনের জন্য। সেখান থেকেই আজ বোসসাহেব ফিরলেন—একা।

স্টেশনে রেবার চোখে জল এসেছিল মিসিজ বোসের ভালবাসার কথা মনে পড়ায়।

পরের দিন সকালে আবার এক অভাবনীয় ঘটনা। সি টাইপ কম্পাউণ্ডের বেড়ার ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে রঙবেরঙের উড়ুনি সালোয়ার শাড়ির উঁকিঝুঁকি দেখতে পাওয়া গেল। বি টাইপ কোয়ার্টারের বন্ধ জানলা-দরজার খড়খড়ি ফাঁক হল। এ টাইপ কোয়ার্টারের ছেলেপিলের দল ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল। এ টাইপ পাড়ায় ডক্টর বোস! হেঁটে!

বোসসাহেব গিয়ে দাঁড়ালেন রেবাদের বাড়ির দোরগোড়ায়। রেবার মা ভয়ে অস্থির। বললেন—"রেবা, বল উনি বাড়ি নেই।"

বাইরে থেকেই বোসসাহেব বললেন—"আমি তাঁর কাছে আসিনি, আমি রেবার কাছেই এসেছি।"

হাতের কাগজের মোড়কটা তিনি রেবার হাতে দিলেন।

"এটা আমার স্ত্রী নিজ হাতে বুনেছিলেন তোমাকে দেবার জন্য। বছর দেড়েক আগে এই স্কার্ফটা বোনা। প্রথমে একটা সোয়েটার বুনতে আরম্ভ করেছিলেন। পরে সেটাকে ফেলে স্কার্ফে হাত দেন। বলেছিলেন যে, এখন ওর বাড়ের সময়, সোয়েটার মাস কয়েকের মধ্যেই ছোট হয়ে যাবে। তুমি তো আমাদের বাড়ি আর গেলে না; অসুস্থ হবার পরও মিসিজ বোস সে কথা বলেছিলেন।"

গলা ধরে এল বোসসাহেবের এ কথা বলতে বলতে। বাড়ের সময়ের কথাটা শুনে একটু লজ্জা লজ্জা করে রেবার। বড়সাহেব চলে যাবার পর তার আড়ষ্টতা কাটে।

সবাই এ ঘটনাটাকে নিল ডক্টর বোসের শোকের গভীরতার একটা মাপকাঠি হিসাবে। স্ত্রীকে যে ভদ্রলোক এত ভালবাসতেন সে কথা সহকর্মীরা কেউ আগে আন্দাজ করতে পারেনি। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দেখে সকলে ভাবত, তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়; বিলাতে পড়বার সময় ঝোঁকের মাথায় মেম বিয়ে করে পরে বাইশ বছর ধরে তার ঠেলা সামলাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, স্ত্রী মারা গিয়ে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু সকলের হিসাব গুলিয়ে দিলেন বিপত্নীক বোসসাহেব।

একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। ছিলেন গরীব গেরস্থ বাড়ির ছেলে। পড়াশোনায় ভাল ছিলেন বলে বিলাত যাবার সুযোগ পান। মেম বিয়ে করবার জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। যার জন্য আত্মীয় পরিজন সব ছেড়েছিলেন, সে এমন হঠাৎ চলে গেল! এর জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বড় একলা একলা লাগে। ভাবেন, কাজে ডুবে

থাকবেন; কিন্তু মন বসে না। সময় কাটাবার জন্য বিকাল বেলায় ক্লাবে গেলেন দিনকয়েক। সেখানেও লোকজনের সঙ্গ ভাল লাগে না; মদ খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। চেষ্টা করে আলস্য কাটিয়ে ক্লাবে যাবার উদ্যম সঞ্চয় করাও কঠিন। মনে হতে আরম্ভ হয় যে, বাড়িতে বসে মদ খাওয়াতেই শান্তি বেশী। ক্রমে অফিস যাওয়াও ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে বসেই অফিসের কাগজপত্র দস্তখত করে দেন। কাজের মধ্যে সারাদিন শুধু মদ খাওয়া, আর মেমসাহেব যে রেকর্ডগুলো ভালবাসত সেইগুলোকে বাজানো। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, বড়সাহেবের যদি একটি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকত, তা হলে উনি এরকম হয়ে যেতেন না কখনই। তাঁর আজকালকার দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি তারা সংগ্রহ করে খানসামা-বাবুর্চির কাছ থেকে। এদেরই মারফত কলোনির সকলে খবর পায় যে, সাহেবের কড়া হুকুম : মেম-সাহেবের জামা, জুতো, টুপি, জিনিসপত্র ঘরে ঠিক আগে যেখানে ছিল, সেখান থেকে যেন একটুও নড়চড় করা না হয়। দেখলে পরে মনে হয় যেন মেমসাহেব বেড়াতে বেরিয়েছে, এখনই ফিরবে! আর একটা খবর যে, মেমসাহেবের আদরের কুকুর ট্রিক্‌সিকে সাহেব আজকাল নিজে হাতে দু বেলা খেতে দেয়। মেমসাহেবের কুকুর হলে কি হয়, ওটা সাহেবকেও চিরকাল খুব ভালবাসে। মেমসাহেবকে সাহেবের উপর জুলুম করতে দেখলেই ওটা দু'জনার মধ্যে পড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, ডেকে হইচই বাধিয়ে দিত।

এটুকু বলবার পর বড়সাহেবের বেয়ারারা কোন গল্পটা করবে তা এ টাইপ বি টাইপ কলোনির সবার জানা। বহুবার শোনা কিনা! হোলি আর দেওয়ালির বকশিশ নিতে এসে ছেলেমেয়েদের পীড়াপীড়িতে প্রতি বছর তারা গলার স্বর নামিয়ে সেই পুরনো মজার খবরটা বলে।....বড়সাহেব যে দিনই খুব বেশী মাত্রায় খেয়ে নেশায় চুর হয়ে ঘুমুত, সেদিনই হত কাণ্ড বাড়িতে। মদ খাওয়ার জন্য কিছু নয়; সে তো মেমসাহেব নিজেও মদ খেত। কোন্ সাহেব মেম না খায়! নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমুলে বড়সাহেবের নাক মুখ দিয়ে ফর্‌-র্‌-র্‌ ফর্‌-র্‌-র্‌ করে একটা অদ্ভুত শব্দ বার হয়। মেমসাহেব বলত যে, ঘোড়ারা ঘাস খাওয়ার সময় নাকি মধ্যে মধ্যে ঐরকম শব্দ করে। অর্ধেক রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে কানের কাছে ওই শব্দটা শুনলেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠত। ঘোড়ার আবার বিছানায় শোবার দরকার কি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুলেই তো পারে! ধাক্কা দিয়ে সাহেবকে খাট থেকে মেঝের উপর ফেলে দিত। ট্রিক্‌সি চিরকাল শোয় ঠিক দরজার বাইরে। মেঝেতে পড়ার শব্দটা শোনা, আর আরম্ভ হত তার চীৎকার আর দোর আঁচড়ানি। যতক্ষণ ঘরের দরজা না খুলছ, ততক্ষণ নিস্তার নাই! শেষকালে মেমসাহেব বেরুত চাবুক নিয়ে। সেসব কথা মনে করলে হাসিও পায়, আবার সাহেবের উপর

মায়াও হয়! সে সময় মারলেও কি কুকুরটা থামে! শেষ পর্যন্ত সেটাকে শোবার ঘরে ঢ্নকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত মেমসাহেব। তখন কুঠি ঠান্ডা।..

প্নরনো হওয়ায় এইসব গল্পের স্বাদ যখন পানসে হয়ে এসেছে, তখন সাহেবের খানসামার কাছ থেকে পাওয়া গেল এক অতি চাঞ্চল্যকর খবর। প্রত্যহ রাতদ্নপ্নরে ট্রিক্সি ডেকে ডেকে বাড়ি মাথায় করছে। ডাকে আর দোর আঁচড়ায়। সাহেব উঠে দরজা খ্নলে তাকে ভিতরে নিয়ে যান। পর পর ক'দিন সাহেবের ঘ্নমের ব্যাঘাত হতে দেখে বেয়ারা সাহসে ব্নক বেঁধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কুকুরটাকে রাত্রিতে বাড়ির বাইরে বেঁধে রাখবে কিনা। সাহেব কোন কথা না বলে কটমট করে শ্নধ্ন একবার তাকিয়েছিলেন তার দিকে। তারপর তিন দিন তিনি ঘর থেকে বার হননি; খানসামা-বাব্নর্চির সঙ্গে কোন কথাও বলেননি। চতুর্থ দিন সকাল বেলা দেখা গেল, সাহেব নিজে ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ করলেন। বেয়ারারা তো অপ্রস্তুতের একশেষ। কোথাও যাবেন নাকি? কাছে গিয়ে সেলাম ঠ্নকে সাহেবের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিতে গেল। তিনি বাধা দিলেন না। মেমসাহেবের জিনিসপত্রগ্নলোকে দেখিয়ে সেগ্নলোকে আলমারির মধ্যে তুলে রাখতে বললেন। গলার স্বরে সাহেবী হ্নকুমের সে ঝাঁজ নেই। এতকাল ও জিনিসগ্নলোতে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। ব্যাপার কি! কাল সারা রাত মদ চলেছিল; তারই জের সকালেও রয়েছে নাকি? জামা, জ্নতো, ট্নপি থেকে আরম্ভ করে ছাতা, পাউডারের কৌটো, ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত সব জিনিস ভরা হল তিনটে আলমারিতে। তারপর সাহেব বললেন, আজ থেকে অন্য ঘবে যেন তাঁর শোবার বিছানা পাতা হয়। অবাক হয়ে গেল বেয়ারা। এ আবার কি নতুন খেয়াল সাহেবের! বাব্নর্চিখানায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও তারা এর কোন কারণ খ্নঁজে পেল না। টেবিলের উপর মেমসাহেবের যে ফোটোগ্রাফখানা ছিল সেখানাকে কাগজে ম্নড়ে নিয়ে সাহেব বের্নলেন বাড়ি থেকে আজ অনেকদিনের পর। সোজা গেলেন এ টাইপ কলোনিতে। রেবার হাতে ফোটোগ্রাফখানা দিয়ে বললেন—"আমার স্ত্রী তোমায় খ্নব ভালবাসতেন; তাই এটা তোমায় দিচ্ছি।" তিনি চলে যাওয়া মাত্র প্রতিবেশিনীরা ছ্নটে এলেন মেমসাহেবের ফোটোগ্রাফ দেখতে। মাতালকে তাঁরা ভয় করেন ঠিকই; তব্ন তাঁদের মন এই বিগতদার মান্নষটির প্রতি সহান্নভূতিতে ভরা।

"কি চেহারা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!"

"খাওয়াদাওয়া তো প্রায় নাই বললেই হয়; খালি মদে কি শরীর টেকে!"

"বউ নিয়ে ঘর করা যাদের একবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, বিয়ে না করলে তারা অবধারিত পাগল হয়ে যায়।"

"সেই রকমই লক্ষণ।"

"ছুটি নিয়ে বিলাত গিয়ে আর একটা মেম ধরে আনলেই তো পারে!"

রেবার মা সায় দিলেন—"পঞ্চাশ বছর বয়সে সাহেবদের মধ্যে কত লোক প্রথমবার বিয়ে করে।"

"ইনিও করবেন; সবুর কর না কিছুদিন।"

এই হল অন্তিম রায় এ টাইপ কলোনির মেয়েমহলের।

আর ওদিকে সাহেবের কুঠিতে, বেয়ারা-বাবুর্চিরা সারা দিন মাথা ঘামিয়েও আসল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। বুঝল শেষরাত্রিতে। ট্রিক্‌সির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল বেয়ারার। কিন্তু কুকুরটা আজকাল প্রত্যহ ঐরকম করে ডাকে বলে সে আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। হঠাৎ দরজার বাইরে জুতোর শব্দ শুনে উঠতে হল। সাহেব নিজে এসেছেন 'আউট হাউস'-এ তাকে ডাকতে। ট্রিক্‌সিও সঙ্গে আছে। হাঁফাচ্ছেন তিনি। সাহেব বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের শোবার ঘরে, তারপর বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসলেন গদিওয়ালা চেয়ারটায়। অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। ট্রিক্‌সি খাটের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কি যেন শুঁকছে। ভোর হবার পর সাহেব জানালেন তাঁর বিপদের কথা। মেমসাহেব তাঁকে প্রত্যহ খাট থেকে নীচে মেঝের উপর ফেলে দিচ্ছে, তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায়।

তারপর ডাকা হল রসুলপুরের নামজাদা রুস্তম ওঝাকে। তার কথা অনুযায়ী জিনিসপত্র কেনা হল। সেগুলোকে রাখা হল সাজিয়ে, একটা প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে। শনিবারের দিন ঠিক দুপুর বেলা রুস্তম ওঝা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে একখানা চারকোনা রেশমী চাদর দিয়ে হাঁড়িটাকে ঢেকে দিল। ভরা দুপুরে সেটাকে মাথায় করে বোসসাহেব রেখে এলেন তেরাস্তার উপর—ঠিক যেখান থেকে এ টাইপ কলোনির রাস্তাটা বেরিয়েছে সেই মোড়ে।

এ নিয়ে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল সারা কলোনিতে। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি লোকটার একেবারে? কয়েকদিন এ ছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই এখানকার লোকের মুখে। পুরুষরা নাক সিঁটকাল অত বড় একজন বৈজ্ঞানিককে এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর কুসংস্কারের আওতায় পড়তে দেখে। রেবার মা মেয়েকে বারণ করে দিলেন যেন পথের মোড়ের সেই জায়গাটা দিয়ে ভুলেও না হাঁটে। রাস্তার ঝাড়ুদার পর্যন্ত সেই জায়গাটুকু ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করে দিল।

আর এদিকে তেমাথার উপর হাঁড়িটা রেখে বোসসাহেব বাড়িতে এসে বসলেন বোতল আর গ্লাস নিয়ে। দুপুর থেকে আরম্ভ করে রাত বারোটা পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন একনাগাড়ে। নেশায় বুঁদ না হয়ে পড়া পর্যন্ত ছাড়বেন না

এই সঙ্কল্প। নইলে ওঝার ওষ্বধের পরীক্ষা হবে না। খানসামা, বাব্বর্চি, র্বস্তম ওঝা, সবাই সারা রাত জেগে, কান খাড়া করে। সকাল সাড়ে আটটার সময় ঘ্বম ভেঙে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন বোসসাহেব। ওষ্বধে ফল ধরেছে! যাবার আগে র্বস্তম ওঝা কম্পাউন্ডের চতুঃসীমার উপর কি কি যেন ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে দিল। বলে গেল, শরাবের উপরই মেমসাহেবের রাগ, আর বোধ হয় সাহেবকে বলছেন আবার বিয়ে করতে।

সাহেব বাব্বর্চিকে বলে দিলেন ভাতে জল দিয়ে রাখতে। রাত্রিতে আজ তিনি শ্বধ্ব পান্তা ভাত খাবেন লেব্বর রস দিয়ে। অনেককাল পর আজ অফিস গেলেন।

সন্ধ্যাবেলাটায় মদের লোভ সামলানো শক্ত। সন্ধ্যা থেকে রাত্রিতে ভাত খাওয়ার সময়ট্বকু কোনরকমে মদ না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে হল। তারপর খেয়ে-দেয়ে শ্বয়ে পড়া। এ না করলে ওঝার মন্ত্রের ধক নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লাবে গেলে পান না করে ফেরা অসম্ভব! সিনেমা প্রত্যহ দেখা চলে না। কফি, চ্বর্বটের মাত্রা বাড়িয়ে দেখলেন; দেশবিদেশের মদ্যপান নিবারণী সভায় চিঠি লিখলেন উপদেশের জন্য; করে দেখলেন আরও অনেক রকমের বৈকল্পিক নেশা। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে ব্বঝলেন, এ টাইপ কোয়ার্টারে রেবাদের বাড়ি সন্ধ্যাবেলায় যাওয়াটাই সব রকম নেশার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী।

গৃহস্থালির শত জিনিসে ভরা এ টাইপ কোয়ার্টারের ছোট ঘর। মোড়ার উপর তাঁর খাতিরে 'আস্বন বস্বন' লেখা আসন পাতা। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি। তিনিও ছোটবেলায় এই পরিবেশেই মান্বষ। সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যের ধ্বনোর গন্ধটা আরও বেশী করে সেইসব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ায়। এ ঘরে ঢ্বকলেই বেশ বাড়ি বাড়ি মনে হয়। প্রকান্ড কম্পাউন্ডওয়ালা সি টাইপ বাড়িগ্বলো, তাঁদের ছেলেবেলার ধারণা অন্বযায়ী, স্কুল, অফিস, কাছারির মত লাগে দেখতে। সি টাইপ বাড়িতে তাঁদের থাকবার ধরনেও এ'দের তুলনায় একট্ব যেন হোটেল-হোটেল ভাব। খ্বব ভাল লাগে রেবাদের এই ঘরখানা। রেবার বাবা প্রথম থেকে বড়সাহেবের সঙ্গে মাখামাখি করবার বির্বদ্ধে; কিন্তু অত বড় একজন লোককে নিষেধ করতে সাহস পান না। তারপর বড়সাহেব রেবার মার হাতের স্বক্তানি খেতে চাইলেন; মোচার ঘণ্ট খেতে চাইলেন; কেমন করে স্বক্তানি রাঁধতে হয়, সেটা রেবাকে একখানা কাগজে লিখে দিতে বললেন, বাব্বর্চিকে শেখাবার জন্য। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তখন আর তাঁকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করা চলে না।

এখানকার সরকারী কলোনিতে সি টাইপ পরিবারের সঙ্গে এ টাইপ পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এর আগে পর্যন্ত কখনও হতে দেখা যায়নি। রীতি-

বিরুদ্ধ বলেই এই মাখামাখি প্রথম থেকে দৃষ্টিকটু লাগছিল সকলের চোখে। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধরনে এর ব্যাখ্যা করে। নানারকম কানাঘুষা আরম্ভ হয়। উপরে বেনামী চিঠি যায়। ফলে গোপন তদন্ত করবার জন্য উপর থেকে লোক পাঠানো হয়। তখন বোসসাহেব রেবার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তোলেন। রেবার মা বললেন, পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে তিনি কিছুতেই ষোল বছরের মেয়ের বিয়ে দেবেন না। বোসসাহেব বললেন, তাঁর বয়স কখনই পঞ্চাশ নয়—তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর সাত মাস। রেবার বাবা সায় দিলেন। বোসসাহেব অনুরোধ করলেন—এ বিষয়ে রেবার মতামত জানতে। রেবার মা আরও চটলেন—"অতটুকু মেয়ের আবার মতামত কি?" রেবার বাবা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জানাল যে, সে বোসসাহেবকে বিয়ে করবে।

মা রাগারাগি করলেন; গালাগাল দিলেন।

"উনি যে তোর বাপের বয়সী!"

মেয়ে চুপ করে থাকল; কিন্তু মত বদলাল না।

বাবা বললেন—"বেবার গড়ন বেশ বাড়-বাড়ন্ত।"

অফিসারদের ক্লাবে সবাই হাসাহাসি করল Beefy Cowদের উপর ডক্টর বোসের মজ্জাগত পক্ষপাত নিয়ে।

এই সময় এখান থেকে বদলির খবর এল বোসসাহেবের। এতদিনকার কাজে ঢিলেমির ফলে তাঁর চাকরিতে দুর্নাম হয়েছে। তাই তাঁকে পাঠাচ্ছে এক ভেটারিনারি কলেজের অধ্যক্ষ করে। বোসসাহেবের পক্ষে এ হল শাপে বর। শ্বশুর তাঁর অধীনে এখানকার অফিসে চাকরি করতেন, জিনিসটা দেখাত বড়ই খারাপ। বিয়ে করে বউ নিয়ে তিনি চলে গেলেন নতুন কর্মস্থলে। সঙ্গে নিলেন পুরনো খানসামাকে।

মাথাজোড়া টাক হলেও বোসসাহেবকে দেখতে রেবার খারাপ লাগে না। বিবাহিত জীবনে অর্থ-সাচ্ছল্য কে না চায়! এত বড় একজন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবার সৌভাগ্যে সে পরম তৃপ্ত; একজন ইংরেজ মেমের জায়গা নিচ্ছে বলে একটু গর্বিতাও। ছোটবেলা থেকে সি টাইপ কোয়ার্টারগুলোকে সে বেশ ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। যে লোকটা এতকাল একজন মেম নিয়ে ঘর করে এসেছে, তার বাড়ির গৃহিণীপনা হাতে তুলে নিতে ভয়-ভয় করে। যদি অখাদ্য কুখাদ্য খেতে বলে! কার্পেট, সোফা, বাথরুম, খাওয়ার টেবিল, অ্যালসেসিয়ান কুকুর, রাতের পোশাক, সব জিনিসের নামগুলোর সঙ্গে ঠিক আতঙ্ক না হলেও গভীর উদ্বেগ জড়ানো। পারবে তো সে শেষ পর্যন্ত? অত বড় একটা মানুষ! যতই ভাল লাগুক, তাঁকে ভয় আর সমীহ না করে উপায় নাই।

রেবার মনের এই দিকটার উপর বোসসাহেবেরও খেয়াল আছে। তার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি সজাগ। বয়স বেশী হবার জন্য রেবার কাছে তাঁর একটু কুণ্ঠা আছে। তার উপর, স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলবার বিলাতী কায়দায় তিনি অভ্যস্ত। বয়সের ব্যবধানটা থাকবেই; স্ত্রীর মন ধরে রাখতে হবে শুধু বুঝে-সুঝে চলে। বুঝে-সুঝে চলতে গিয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললেন। বিয়ের আগেকার পরিচয়ে রেবার পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছিলেন, নিজের পছন্দ-অপছন্দও সেই অনুযায়ী খানিকটা কাটছাঁট করে নেবার চেষ্টা করলেন। রেবা যে ধরনের জীবনে এতকাল অভ্যস্ত, সেইটা যাতে তাঁর নিজেরও ভাল লাগে তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' কিনলেন; রেবাকে শুনিয়ে দিলেন যে, মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে কাঁসার থালায় ভাত খেতে তাঁর খুব ভাল লাগে। একটি অল্পবয়সী মেয়ের মনের মতন হবার চেষ্টার মধ্যে বেশ খানিকটা উদ্দীপনা আছে। তার মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর মধ্যে প্রবেশ কববার কৌতূহল সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয়। রেবার কথাবার্তা, হাবভাবের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর তিনি লক্ষ্য রাখেন; আর ইচ্ছা না থাকলেও স্বর্গগতা এমিলির আচরণের সঙ্গে সেগুলোর তুলনা না করে পারেন না। অনেক কথা আছে, যা মেমসাহেবকে বলা চলত, অথচ একে বলা চলে না। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে মনে হয়, রেবাই ভাল। তার বালিশে কেমন নারকোল তেলের গন্ধ; হঠাৎ লজ্জা পেলে সে কেমন সুন্দর করে জিব কাটে; আরও কত কি আছে। রেবার ছেলেমানুষি ভাবটা তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। তাঁর যদি বিশ-বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হত একটি ঘোমটা-পরা টুকটুকে বউয়ের সঙ্গে তা হলে সে যেমন ব্যবহার করত বরের কাছে এলে, তারই স্বাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর। সেই রকম করে পিছন থেকে চুপি চুপি এসে তাঁর চোখ চেপে ধরুক; নাকের ডগায় এলো চুলের সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে খিলখিল করে হাসুক; শীতের রাতে ঠান্ডা আঙুলগুলো ঘাড়ের পিছনে ঠেকিয়ে পালিয়ে যাক; কিন্তু রেবা সেসব করে কই!

আর রেবা! অত বড় একজন হোমরাচোমরা সাহেবকে 'তুমি' বলতে তার বাধো-বাধো ঠেকে। স্বর্গগতা মেমসাহেবের সংসার দেখাশোনা করবার ভার সে পেয়েছে, তার অযোগ্যতা সত্ত্বেও। সব সময় সে তটস্থ—এই বুঝি কিছু ত্রুটি হয়ে গেল তার। প্রতিটি কাজ করবার আগে তাকে একবার ভেবে নিতে হয়। স্বামীর দুটো দাঁত বাঁধানো। মধ্যে মধ্যে বাঁধানো দাঁত ওষুধে ভিজিয়ে রেখে পরে বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করেন বোসসাহেব বাথরুমে। রেবা চায় এ কাজটা করে দিতে; কিন্তু পারে না। স্বামী যদি কিছু মনে করেন! বয়সের ব্যবধানজনিত এই রকমের সঙ্কোচকাতরতার বাধা

তার পদে পদে। কিন্তু এর চেয়েও বড় আর এক রকমের বাধা তার মনের সম্মুখে খাড়া আছে অষ্টপ্রহর। মুখ্য সেটা 'সি টাইপ এ টাইপ'-এর ব্যবধানজনিত। বিয়ের পর থেকে আইনের চোখে সে নিজেকে 'সি টাইপ' বলে দাবি করতে পারে বটে; কিন্তু সে কিছুতেই নিজের হীনতার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাইরের লোকের কাছে সি টাইপ কোয়ার্টারসুলভ ভাব প্রয়োজনের চেয়েও উগ্রভাবে প্রকাশ করে ফেলে; কিন্তু স্বামীর সম্মুখে গেলেই কেন যেন অন্য রকমের হয়ে যায়। সে ভাবে যে, তার স্বামী ঠিক সি টাইপ কোয়ার্টারের অন্য অফিসারদের মত নন। তিনি যে বাইশ বছর ইংরেজ মেমসাহেবের সঙ্গে ঘর করেছেন। সেইটাই তাঁর সত্যিকারের পছন্দ। মেঝেতে বসে খাওয়া, 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়া ইত্যাদি কাজগুলো যে জোর করে করা, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তার আছে। উনি এমিলি-মেমকে কি ভালবাসতেন, জানে তো সে! স্বচক্ষে দেখেছে তো মেমসাহেব মারা যাবার পর তাঁর অবস্থাটা! বিয়ে হলে পর, তার বয়সী অন্য মেয়েরা পায় বর; সে পেয়েছে স্বামী। স্বামীর মনের মত হওয়ার মানে সেই মেমসাহেবের মতন হওয়া। সে তো মেমসাহেব নয়; পারবে কেমন করে? সেরকম গায়ের রঙও কোনদিন হবে না, সেরকম ইংরেজী বলতেও পারবে না কোনদিন; সেরকম টুপি, গাউনও সে কোনদিন পরবে না মরে গেলেও। কিন্তু তিনি যেমন করে সংসার চালাতেন, স্বামীর দেখাশোনা করতেন, তা কেন নকল করতে পারবে না! চেষ্টা করলেই পারবে। দরকার শুধু সেইসব ছোট ছোট খবরগুলো জানবার। বলতে পারেন একমাত্র স্বামী। কিন্তু যা চাপা মানুষ উনি, ওসব কথার ধার দিয়েও যান না। মেমের কথা জিজ্ঞাসা করতেও বাধো-বাধো লাগে তাঁর কাছে। রেবা স্বামীর হাবভাব দেখে তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বোঝবার চেষ্টা করে। পুরনো বেয়ারাকে যখন তখন খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেও সে অনেক কথা জেনে নেয়। স্বামীর চোখমুখের উপর লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অনেক সময় সে ধরা পড়ে গিয়েছে; কিন্তু তিনিও যেন ধরা পড়ে গেলেন, মুখের ভাব হয়ে যায় তাঁর তখন। কি ভাবেন, তিনিই জানেন। বেয়ারার সঙ্গে একদিন পুরনো মেমসাহেবের গল্প করছে, হঠাৎ মনে হল স্বামী তাদের কথা শোনবার জন্য দরজার পাশে চেয়ারখানায় এসে বসলেন। কেন, কে জানে!

বোসসাহেব ব্যথা পান, রেবা বেয়ারার সঙ্গে পর্যন্ত সহজভাবে কথা বলে, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় অন্য রকম হয়ে যায়। কেন তাঁর সম্মুখে এলেই একটু আড়ষ্ট ভাব দেখতে পান তার মধ্যে? কেন রেবাকে কিছু বলতে গেলেই তাঁর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে? নিজের অধিকার বুঝে নিতে কেন তার কুণ্ঠা? কেন সে তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করে না? খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও সে কোন বিষয়ে নিজের মতামত দেয় না। রেবা তাঁর

কথা শোনে ঠিক; কিন্তু যার মন চাও, তার কাছ থেকে শুধু বাধ্যতা আর বশ্যতা পাওয়া, কতটুকুনি পাওয়া? কেন তার সঙ্কোচ-ভীরুতা? আচরণে কোন ত্রুটি নেই, অথচ কি একটা জিনিসের যেন অভাব তার মধ্যে। হাতের বন্ধনের মধ্যেও তার দেহ আড়ষ্ট। দুর্বোধ্য তার মনের এই জটিলতা। যে একেবারে আপন, সে যদি সব সময় একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে, তা হলে ব্যথা পাবারই কথা। আগের মেমসাহেব এমিলিকে তিনি বুঝতেন; সে যা বলত, পরিষ্কার খোলাখুলি বলত। কর্তব্যে ত্রুটি তার বেশী হত রেবার চেয়ে; সেবা হয়ত এমন নিখুঁত ছিল না; কিন্তু কোন দোষ করবার পরও স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াতে একদিনের জন্যও সে এরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে মাইনে-পাওয়া ঝি-চাকরে। বিবাহিতা স্ত্রী কেন করবে? এমিলি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতেও জানত; আবার নিজেকে নিঃশেষ করে দিতেও জানত। রেবা তা পারছে না। পারছে না বোধ হয় তার বয়সের জন্য। একটি ছেলেপিলে হলে হয়ত পারত। স্বামীর প্রৌঢ়ত্বের উপর যদি এত বিরূপতা তবে রেবা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল কেন? আগে বোধ হয় বুঝতে পারেনি নিজের মন। ভেবেছিল, সব ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু এখন বোধ হয় দেখছে যে, কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না তাঁর প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে। এ নিয়ে রেবাকে কোন প্রশ্ন করা চলে না। শুধু এ নিয়ে কেন, কিছু একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলেই তার মুখ-চোখে একটা শঙ্কাকুল ভাব ফুটে ওঠে। অসহ্য লাগে বোসসাহেবের কাছে রেবার এই চাউনিটা। এর চেয়ে এমিলির স্বভাবের ভাল দিকটার স্মৃতি রোমন্থন করে বাকি জীবনটুকু কাটানোই ছিল ভাল। ভেবেছিলেন, বিয়ে করে অশান্ত মন শান্ত হবে; কিন্তু এই পেয়ে না পাওয়ার যন্ত্রণার হাত থেকে যে মুহূর্তের জন্যও নিস্তার নাই! ভোলবার জন্য আবার মদ ধরলেন বোসসাহেব।

স্বামীর মতিগতির পরিবর্তন দেখে রেবা ভয় পায়। একটা পরামর্শ করবার পর্যন্ত লোক নাই এ বাড়িতে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের তফাত বেশী হবার সঙ্কোচে সে কোন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইচ্ছা করেই করেনি। মাকে এসব কথা লিখতে বাধে। কারও কাছে বলতে পারলে বোধ হয় নিজের বুকের বোঝা হাল্কা হত, একটি ছেলেপিলে হলে হয়ত স্বামীর টান বাড়ত; কিন্তু ভগবান দিলেন কই!

রেবা জানে, কোথায় তার দুর্বলতা—কেন সে স্বামীর মন পাচ্ছে না। তাঁর পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়ার শখ মিটতে দেখেই সে বুঝেছে। একনাগাড়ে বাইশ বছর এমিলি-মেমের সঙ্গে ঘর করে তাঁর মেজাজ হয়ে গিয়েছে সাহেবী; জোর করে নিজেকে অন্যরকম দেখাবার চেষ্টা দিনকয়েক ছিল; এখন সে

ঝোঁক ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে। এমিলি-মেমের মত না হতে পারলে ওঁর মন পাওয়া যাবে না এই হল তার বদ্ধমূল ধারণা। সে বাবুর্চির কাছে নূতন নূতন বিলাতী খানা রান্না করা শিখতে লাগল; সুক্ত, ডাঁটা-চচ্চড়ি রাঁধবার পাট তুলে দিল; রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে নিজের স্যুটকেসে রাখাল; করল আরও অনেক কিছু এমিলি-মেমের মত হবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মদের মাত্রা দিন দিনই বাড়ছে। কলেজে থাকতে আরম্ভ করেছেন বোসসাহেব আগের চেয়ে বেশীক্ষণ; সকালে যান, সন্ধ্যার সময় ফেরেন। দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিতে হয় সেখানে।

কলেজে বেশী সময় কাটাবার কারণ রেবা যা-ই ভাবুক, তাঁর সহকর্মীরা বলে যে, বোসসাহেব আবার পূর্ণ উদ্যমে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেছেন। মদের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কাজের মাত্রাও বাড়িয়েছেন। এবারকার গবেষণার বিষয় গবাদি পশুর কৃত্রিম-প্রজনন সম্পর্কিত। ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন আর মদ খান। বাড়ি ফেরবার পর তো কথাই নাই।

একটা কথা বলি বলি করেও স্বামীকে বলতে পারছিল না দিনকয়েক থেকে। সেদিন বোসসাহেব সন্ধ্যার সময় ফিরে বোতল-গ্লাস নিয়ে বসেছেন। রেবা সাহসে বুক বেঁধে তাঁর সম্মুখে গিয়ে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল যে, ইংরেজীতে কথাবার্তা বলা শেখাবার জন্য একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রীর তার দরকার।

কোন্ মেজাজে ছিলেন তখন বোসসাহেব তিনি জানেন। চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন—"Shut up!" এরকমভাবে স্ত্রীকে তিনি কখনও এর আগে তাড়া দেননি। রেবা চলে এল সেখান থেকে; চোখ ফেটে জল আসছে তার। বোসসাহেব আর এক পেগ ঢেলে নিলেন বোতল থেকে; এবার আর সোডা মেশালেন না।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা রেবার। শুনে আসছে বটে বেয়ারার কাছে যে, দু' পেগের পরই সাহেবের মেজাজ সপ্তমে চড়ে; তাই ও সময় পারতপক্ষে বেয়ারা তাঁর সম্মুখে যায় না। আরও শুনেছিল যে, একটু বেশী পেটে পড়লেই সব গন্ধ সাহেবের নাকে উগ্র লাগে। আগেকার মেমসাহেবের হাস্নাহেনার গাছ একবার রাত্রিতে কাটতে গিয়েছিলেন; তাই নিয়ে সাহেব-মেমে কি কাণ্ড সেদিন! গালাগালি, মারামারি। ইংরেজীতে গালাগালি। সাহেব প্রথমে আরম্ভ করেন শুয়োর-কা-বাচ্চা দিয়ে। তারপর চলে ইংরেজী। ওই ভয়েই সে সাহেবের সম্মুখে যায় না তখন নেহাত বাধ্য না হলে।......

এসব গল্প শুনেও ঠিক বিশ্বাস করত না রেবা আগে। ভাবত যে, বেয়ারা বাড়িয়ে বলছে আসর জমাবার জন্য। এখনও সে বিশ্বাস করে না। তবে এ

কথা ঠিক যে, রাগের মাথায় স্বামী নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন ওই 'shut up' কথাটার মধ্য দিয়ে। মান-অভিমান করে বসে থাকলে তার চলবে না। মনের অবস্থা স্বামীর যে এত দ়ূর বদলে গিয়েছে এরই মধ্যে, সে কথা সে আন্দাজ করতে পারেনি। তার কোন সন্দেহ নেই যে, মেমসাহেবের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন স্বামী, আর তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। অনেক কিছ়ু সে করতে পারত এতদিনে স্বামীর মনের মত হবার জন্য; কিন্তু বোকার মত গড়িমসি করে এমিলি-মেমের আদব-কায়দা শিখতে দেরি করে ফেলেছে সে; মেমের গায়ের রঙ সে না পাক, টুপি গাউন সে পরতে পারত ইচ্ছা করলে; বমি এলেও অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া অভ্যাস করতে পারত হয়ত; গা ঘিনঘিন করলেও ট্রিক্‌সি কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে চ়ুম়ু খেতে পারত; মার কাছে চিঠি লিখে জানতে পারত যে, স্বামীর মনের মত হবার জন্য সিঁথিতে সিঁদ়ুর না দিলে চলে কিনা। আর এক ম়ুহ়ূর্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কি করা উচিত, কে তাকে পথ দেখাবে! স়ুটকেস খ়ুলে সে ঠাকুরকে প্রণাম করল কাঁদতে কাঁদতে। মেমরা হাতে চুড়ি পরে না; সে হাতের চুড়ি, বালা, গলার হার খ়ুলে ফেলে। কানের দ়ুল হয়ত রাখা চলে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। স্নানের আগে গায়ে সরষেব তেল মাখা তার অভ্যাস। কি ভুলই সে করেছে বাথর়ুমে স্বামীর চোখের সম্ম়ুখে এতদিন সরষের তেলের বাটিটা রেখে! ছ়ুটে গিয়ে সে বাথর়ুমেব জানলা দিয়ে তেলের বাটিটা ফেলে দিল বাইরে। মেমসাহেব হতে গেলে তার সাজ-সরঞ্জাম কিছ়ু কেনবার দরকার। গ়ুছিয়ে সেসব জিনিসের একটা 'লিস্ট' করা উচিত আগে। ফর্দ করতে বসে দেখল, বর্তমান মানসিক অবস্থায় কোন জিনিসের নাম মনে আসছে না। মেমসাহেবদের মত পোশাক পয়সা দিলেও এ শহরে এখনই পাওযা সম্ভব নয়। 'লিস্ট' করতে বসে বার বার নজর পড়ছিল ফড়িংয়ের পিছনে ধাবমান ট্রিক্‌সির উপর। রেবা উঠল কুকুরটাকে এমিলি-মেমের মত জড়িয়ে ধরে আদর করতে। হাত বাড়াতেই ট্রিক্‌সি র়ুখে দাঁড়িয়ে গর়্-র্ করে একটা আওয়াজ বার করল গলা দিয়ে। ভয়ে পিছিয়ে এল সে।

খানসামা খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছে। সাহেব বলেছেন খাবেন না রাত্রিতে; মেমসাহেব এখন খেতে যাবেন নাকি? রেবা বলে দিল—সে-ও খাবে না; শরীরটা ভাল নেই।

এরা তাকে মেমসাহেব বলে ডাকে। মেমসাহেব, না ছাই! কুকুরেরও অধম হয়ে গিয়েছে সে এ বাড়িতে! নটা বাজল, দশটা বাজল ঘড়িতে। ভেবে কিছ়ু কুল-কিনারা পাওয়া যায় না! বেয়ারা, বাব়ুর্চি বাইরে যাচ্ছে; প্রায় এগারোটা হল। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে আসবার সময় দেখল, শোবার ঘরে নীল আলোটা এখনও জ্ব়লেনি। তার মানে তিনি এখনও শোননি।

এখনও ওই বিষ গিলছেন নাকি? স্বামীর উপর রাগ-অভিমান করে থাকলে তার চলবে না। এবার শোবার ঘরে যেতে হয়!

এই সময় হঠাৎ খেয়াল হল একটা কথা।......একবার করে দেখলে হয়; কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়! যদি পরের জিনিস ব্যবহার করতে দেখে স্বামী আরও চটে ওঠেন! ভয়ে বুক দুরদুর করে। কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে আর বেশী খারাপ কি হতে পারে!

মনের সমস্ত বল সঞ্চয় করে সে এমিলি-মেমের জিনিসপত্রে ঠাসা আলমারিটা খোলে। রাতে শোবার সময়ের একটা পোশাক সে বার করল আলমারি থেকে। শাড়ি ছেড়ে সেগুলোকে পরে একবার আয়নায় দেখে নিল নিজেকে। দেখতে মেম-মেম লাগছে ঠিকই। এমিলি-মেমের পাউডারের গন্ধ এখনও নষ্ট হয়নি। তা-ই কৌটো থেকে নিয়ে খানিকটা লাগাল মুখে। মেমসাহেবের ব্যবহার করা এক টুকরো লিপস্টিক পড়ে রয়েছে এক কোনায়। রাতে ও জিনিস মেমসাহেবরা লাগায় কিনা ঠিক জানা নেই। সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সেটাকে একটু ঘষে নিল ঠোঁটে। মেমসাহেবের ব্যবহার করা লিপস্টিক ঘষবার সময় বড় ঘেন্না ঘেন্না করছিল তার। ইলেকট্রিক আলোতে ঠোঁট কালো দেখাচ্ছে আয়নায়। দেখাক গে! মেমদের ঠোঁট ঐরকমই দেখায়! এমিলি-মেম শোবার ঘরে হিল-তোলা জুতো পরত নাকি? শোবার সময় সেন্ট লাগাত নাকি? ট্রিক্‌সি ঘরে এসে ঢুকেছে। রেবার পরনের পোশাক শুঁকছে, আর লেজ নাড়ছে। সে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল, মেমসাহেবের মত করে। ট্রিক্‌সি লেজ নাড়াচ্ছে আরও বেশী করে। এতে রেবা মনে জোর পায়। এইবার সে শোবার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত। নীল আলোটা তো জ্বলছে না ও ঘরে! মনে মনে ঠিক করে নিল, ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে স্বামীকে কি বলবে। তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে প্রথমটায় বোধ হয় চিনতে পারবেন না; বোধ হয় চমকে উঠবেন এত রাতে একজন ফিরিঙ্গী মেমকে ঘরে ঢুকতে দেখে। চিনতে পারবার পর কি বলবেন, সেইটাই হচ্ছে কথা। ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সে শোবার ঘরে ঢুকল।

এ কি কাণ্ড! স্বামী বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছেন। মদের নেশায় জুতো জোড়া পর্যন্ত খোলা হয়নি পা থেকে। দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ল রেবা। ভগবান তার বিরুদ্ধে! তার এত সাজ-সজ্জা, জল্পনা-কল্পনা সব বৃথা হয়ে গেল! চোখে জল আসছে তার। নিদ্রিত স্বামীর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে। এই অবস্থায় কি ওই বিছানায় গিয়ে শুতে ইচ্ছা করে মানুষের! কিন্তু দমলে তার চলবে না। কিছু তাকে করতেই হবে। শক্ত হতে হবে। স্বামীর মন তাকে ফিরে পেতেই হবে, যেমন করে হোক!

নিদ্রিত নেশাগ্রস্ত মানুষটির নাক-মুখ দিয়ে ঘোড়ার মত সেই ফর্‌-র্‌-র্‌

ফর্-র্-র্ শব্দটা বার হচ্ছে। ঘরের আলোটা নিবিয়ে নীল আলোটা জেবলে দিল রেবা। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। নিজের লেপটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে দ্ব ভাঁজ করে ঠিক খাটের পাশে মেঝেতে পাতল। বেশ প্বর্ব গদিমত হয়েছে। সেই গদির ওপর রাখল নিজের বালিশটা! মেমসাহেবের মত হতে গেলে যে এত মনের বলের দরকার আগে ব্বঝতে পারেনি। হে মা কালী, শেষ ম্বহ্বর্তে আর মনের জোরটুকু কেড়ে নিও না! স্বামীর নাক-ম্বখের সেই শব্দটা কানে আসছে, আর ভয়ে তার ব্বক কাঁপছে। খাটের উপর থেকে ঝ্বঁকে আর একবার মেঝেটা দেখে নিল। লেপটা ঠিক জায়গায় পাতা হয়েছে। তারপর শরীর-মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে নিদ্রিত স্বামীর গ্বর্বভার দেহটাকে সে খাট থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিল। ঠিক বালিশের উপর পড়েছে মাথাটা। স্বামী নেশার ঝোঁকে বিড়্বিড় করে কি যেন বললেন। ট্রিক্সির উন্দাম চীৎকার ও দোর আঁচড়ানিতে সব কথা শোনা গেল না। রেবার কানে এল শ্বধ্ব—"এমিলি, তোমার গায়ে নারকোল তেলের গন্ধ কেন?"

লজ্জাহর

বিমল মিত্র

রামায়ণের যুগে ধরণী একবার দ্বিধা হয়েছিল। সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই। কিন্তু কলিযুগে যদি দ্বিধা হত ধরণী, তো আর কারও সুবিধে হোক আর না হোক—ভারি সুবিধে হত রমাপতির।

সত্যি, অমন অহেতুক লজ্জাও বুঝি কোনও পুরুষমানুষের হয় না।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সবাই গল্প করছি।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠল ননীলাল। বললে—ঐ আসছে রে—

কিন্তু ওই পর্যন্ত! আমরা সবাই চেয়ে দেখলাম—রমাপতি আমাদের দেখেই আবার নিজের বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সবাই বুঝলাম—রমাপতির যত জরুরী কাজই থাক, এখনকার মত এ-রাস্তা মাড়ান ওর বন্ধ। বাড়িতে ফিরে গিয়ে হয়ত চুপ করে বসে থাকবে খানিকক্ষণ। তারপর হয়ত চাকরকে পাঠাবে দেখতে। চাকর যদি ফিরে গিয়ে বলে যে, রাস্তা পরিষ্কার, তখন আবার বেরুতে পারবে!

বললাম—চল আমরা সরে যাই, ওর অসুবিধে করে লাভ কি?

ননীলাল বললে—কেন সরতে যাব? এ-রাস্তা কি ওর? লেখাপড়া শিখে এমন মেয়েছেলের বেহদ্দ—আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলব?

এমনই রমাপতি! রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে পাছে কেউ জিজ্ঞেস করে বসে—কেমন আছ? তখন যে কথা বলতে হবে। মুখ তুলতে হবে। চোখে চোখ রাখতে হবে।

সম-বয়সী বউদিরা হাসে। বলে—ছোট ঠাকুরপো বিয়ে হলে কী করবে?

মেজ বউদি বলে—আমাদের সামনেই মুখ তুলে কথা বলতে পারে না তো বউ-এর সঙ্গে কি করে রাত কাটাবে ভাই?

বাড়িতে অনেকগুলো বউদি। কেউ কেউ কমবয়সী আবার। তারা নিজের নিজের স্বামীর কথা কল্পনা করে নেয়। যত কল্পনা করে তত হাসে। অন্য সব ভাইরা সহজ স্বাভাবিক মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু রমাপতি।

শুনতে পাই বাড়িতেও রমাপতি নিজের নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঘরের মধ্যে বসে কী করে কারও জানবার কথা নয়। খাবার ডাক পড়লে একবার খেয়ে আসে। তরকারিতে নুন না হলেও বলবে না মুখে।

জলের গ্লাস দিতে ভুল হলেও চেয়ে নেবে না। পৃথিবীকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন ভাল।

এক-একদিন হঠাৎ বাড়ি আসার পথে দূর থেকে দেখতে পাই হয়ত রমাপতি হেঁটে আসছে। সোজা ট্রামরাস্তার দিকেই আসছে। তারপর আমাকে দেখতে পেয়েই পাশের গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। পাঁচ মিনিটের রাস্তাটা ত্যাগ করে পনের মিনিটের গলিপথ দিয়েই উঠবে ট্রামরাস্তায়।

কিন্তু তবু অতর্কিতেও তো দেখা হওয়া সম্ভব!

গলির বাঁকেই যদি দেখা হয়ে যায় কোনও চেনা লোকের সঙ্গে। হয়ত মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন পাড়ার প্রবীণতম লোক। জিজ্ঞেস করে বসলেন—এই যে রমাপতি, তোমার বাবা বাড়ি আছেন নাকি?

নির্দোষ নির্বিরোধ প্রশ্ন। আততায়ী নয় যে, ভয়ে আঁতকে উঠতে হবে। পাওনাদার নয় যে, মিথ্যে বলার প্রয়োজন হবে। একটা 'হাঁ' বা 'না'—তাও বলতে রমাপতির মাথা নিচু হয়ে আসে, কান লাল হয়ে ওঠে, কপালে ঘাম ঝরে। সে এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা যেন। তারপর সেখান থেকে এমন-ভাবে সরে পড়ে, যেন মহাবিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।

ছোটবেলায় রমাপতি একবার কেঁদে ফেলেছিল।

তা ননীলালেরই দোষ সেটা।

একা-একা রমাপতি চলেছিল কালীঘাট স্টেশনের দিকে। ওদিকটা এমনিতেই নিরিবিলি। বিকেল বেলা ট্রেন থাকে না। চারিদিকে যত দূর চাও কেবল ধূ ধূ ফাঁকা। বড় প্রিয় স্থান ছিল ওটা রমাপতির। আমরা জানতাম না তা।

দল বেঁধে আমরাও ওদিকে গেছি। ধূমপানের হাতেখড়ির পক্ষে জায়গাটা আদর্শস্থানীয়। হঠাৎ নজরে পড়েছে সকলের আগে বিশ্বনাথের। বলে—আরে, রমাপতি না?

সকলে সত্যিই অবাক হয়ে দেখলাম—দূরে রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে একা একা চলেছে রমাপতি। আমাদের দিকে পেছন ফেরা। দেখতে পায়নি আমাদের।

দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় চাপল ননীলালের। বললে—দাঁড়া, এক কাজ করি—ওর কাছা খুলে দিয়ে আসি।

যে-কথা সেই কাজ। তখন কম বয়েস সকলের। একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে পারার উল্লাসে সবাই উন্মত্ত। ননীলালের উপস্থিতি টের পায়নি রমাপতি। ননীলালের রসিকতার সিদ্ধিতেই সবাই মাঠ কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছি।

কিন্তু রমাপতির কাছে গিয়ে মুখখানার দিকে চেয়ে ভারী মায়া হল। রমাপতি হাউ হাউ করে কাঁদছে।

সে-গল্প বিয়ের পর প্রমীলার কাছেও করেছি।

প্রমীলা বলে—আহা বেচারা, তোমরাই ওকে অমনি করে তুলেছ—

সেদিন প্রমীলা বললে—ওই বুঝি তোমাদের রমাপতি—এস—এস—দেখ—দেখে যাও—

বললাম—ওকে তুমি চিনলে কী করে?

প্রমীলা বললে—ও না হয়ে যায় না, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—একবার মুখ তুলে পর্যন্ত চাইলে না ওপর দিকে, ও-বয়সে এমন দেখা যায় না তো!—বারান্দার কাছে গিয়ে দেখি সত্যি ঠিকই চিনেছে। রমাপতি বটে।

বললাম—সরে এস, নইলে মূর্ছা যাবে এখনি—

তা অন্যায়ও কিছু বলিনি আমি।

ক্লাস সেভেন-এ গুড-কন্‌ডাক্ট-এর প্রাইজ পেয়েছিল রমাপতি। মোটা মোটা তিনখানা ইংরিজী ছবির বই। সেই প্রথম আমাদের স্কুলে ও-প্রাইজের প্রচলন হল। স্কুলের হলে লোকারণ্য। আমরা স্কুলের ছাত্ররা সেজেগুজে গিয়ে একেবারে সামনের বেঞ্চিতে বসেছি। আমরা খারাপ ছেলের দল সবাই। কেউ প্রাইজ পাব না। কমিশনার ম্যাকেয়ার সাহেব নিজের হাতে সবাইকে প্রাইজ দিচ্ছেন। এক-একজন করে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর প্রাইজ নিয়ে প্রণাম করে নিজের জায়গায় এসে বসছে।

তারপর ম্যাকেয়ার সাহেব ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিন্‌হা—

কেউ হাজির হল না।

সাহেব আবার ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিন্‌হা—

সেক্রেটারী পরিতোষবাবু এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। হেডমাস্টার কৈলাসবাবুও একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আমাদের দিকে, তারপর নিচু গলায় কী বললেন সাহেবকে গিয়ে। তারপর থেকে গুড-কন্‌ডাক্টের প্রাইজটা বরাবর রমাপতিই পেয়ে এসেছে। কিন্তু কখনও সভায় এসে উপস্থিত হয়নি। সে-সময়টা কালীঘাট স্টেশনের নিরিবিলি রেল-লাইনটার পাশের রাস্তা ধরে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে সে।

এর পর আমরা একে একে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে ঢুকেছি। একা রমাপতি আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে। আমাদের সঙ্গে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা যদিই-বা হয় তো সে একতরফা!

দেখা না হলেও কিন্তু রমাপতির খবর নানা সূত্রে পেয়ে থাকি। চুল ছাঁটতে ছাঁটতে কানাই নাপিত বলেছিল—ছোটবাবু, দাড়িটা এবার কামাতে শুরু করুন—আর ভাল দেখায় না!

আমরা তখন সবাই ক্ষুর ধরেছি। কিন্তু রমাপতি তখনও একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে দিব্যি মুখ ঢেকে বেড়ায়।

কানাই এ-বাড়ির পুরনো নাপিত। পৈতৃক নাপিতও বলা যায়। রমাপতিকে জন্মাতে দেখেছে।

বললো—নতুন ক্ষুরটা আপনাকে দিয়ে বউনি করি আজ—কী বলেন, ছোটবাবু!

রমাপতি মুখ নীচু করে খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিল—না, না, ছিঃ—লোকে কী বলবে!

কানাই নাপিত বলেছিল—লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তো—আপনার দাড়ি নিয়ে যেন মাথা ঘামাচ্ছে সব—

—না, থাক রে, সামনে গরমের ছুটি আসছে সেই সময় কলেজ বন্ধ থাকবে—তখন দিস বরং কামিয়ে—

হঠাৎ যেদিন প্রথম দাড়ি গোঁফ কামান চেহারা দেখলাম—সেদিন ঠিক চিনতে পারিনি। ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকে চলেছে রমাপতি। আমাকে দেখে হঠাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। নতুন জুতো পরতে লজ্জা! নতুন জামা পরতে লজ্জা! ওর মনে হয় সবাই ওকে দেখছে যেন।

উমাপতিদার বিয়েতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—সেজদা, রমাপতিকে দেখছি না যে—সে কোথায়?

সেজদা বললে—সে তো সক্কালবেলা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, সব লোকজন বিদেয় হলে রাত্তিরের দিকে বাড়ি ঢুকবে—

এ-পাড়ায় মেয়েরা পরস্পরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাসটা রেখেছে। যেদিন দুপুরবেলা কেউ এল বাড়িতে, রমাপতি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে টিপি-টিপি পায় বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তায় বেরিয়ে কোনও রকমে ট্রামে বাসে উঠে পড়তে পারলেই আর ভয় নেই। সব অচেনা লোক। অচেনা লোকের কাছে বিশেষ লজ্জা নেই তার!

বড় যদুপতির শ্বশুর এ-বাড়িতে কাজে-কর্মে ছাড়া বড় একটা আসেন না। মেজ ঊষাপতির শ্বশুর মশাই মারা গেছেন বিয়েব আগে। সেজ ভাই উমাপতির শ্বশুর নতুন। রবিবার রবিবার মেয়ে এখানে থাকলে দেখতে আসেন। তিনি আবার একটু কথা বলেন বেশী।

বাড়ির সকলকে ডাকা চাই। সকলের সঙ্গে কথা কওয়া চাই। সকলের খোঁজ খবর নেওয়া চাই।, মেয়েকে বলেন—হ্যাঁ রে, তোর ছোট দেওরকে তো কখনও দেখতে পাই না—এতদিন ধরে আসছি—

মেয়ে বলে—ছোট ঠাকুরপোর কথা ব'লো না বাবা, তুমি রবিবারে আসবে শুনে সকালবেলাই সেই যে বেরিয়ে গেছে বাইরে—আর আসবে সেই

দুপুরবেলা বারোটার সময়, তা-ও বাড়ির বাইরে থেকে যদি বুঝতে পারে তুমি চলে গেছ—তবে ঢুকবে, নইলে এক ঘণ্টা পরে আবার আসবে।

উমাপতিদার শ্বশুর হাসলেন। বলেন—কেন রে, আমি কী করলাম তার!

মেয়ে বলে—তুমি তো তুমি, বাড়ির লোকের সঙ্গেই কখনও কথা বলতে শুনিনি—ছোট ঠাকুরপো বাড়িতে থাকলেই টের পাওয়া যায় না ঘরে আছে কি নেই—

উমাপতির শ্বশুর কী ভাবেন কে জানে! কিন্তু এ-বাড়ির লোকের কাছে এ-ব্যাপার গা-সওয়া।

মা বলেন—তোমরা কিছু ভেব না বউমা, রমা আমার ওই রকম—আমার সঙ্গেই লজ্জায় বলে কথা বলে না—

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও একেবারে মিথ্যে নয়।

স্বর্ণময়ীর সেবার ভীষণ অসুখ হয়েছিল। ছেলেরা রাতের পর রাত জেগে মায়ের সেবা করতে লাগল। বউদেরও বিশ্রাম নেই। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসে। ইন্‌জেকশন্‌, ওষুধ, বরফ—অনেক কিছু!

একটু সেরে উঠে স্বর্ণময়ী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন—রমা কোথায়?

রমাপতি তখন ঘরে বসে বই পড়ছিল দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

বড়দা একেবারে ঘরে ঢুকে বললেন—মার এত বড় একটা অসুখ গেল আর তুমি একবার দেখতে গেলে না?

দাদার কথায় রমাপতি অবশ্য গেল দেখতে মাকে। রোগীর ঘরে তখন বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। রমাপতি কিন্তু কিছুই করল না। কিছু কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। চুপচাপ গিয়ে খানিকক্ষণ সকলের পেছনে দাঁড়াল সসঙ্কোচে। তারপর কেউ দেখে ফেলবার আগেই পালিয়ে এসেছে আবার নিজের ঘরে।

স্বর্ণময়ীর সে-কথা এখনও মনে আছে। বলেন—তোমরা ভাব ওর বুঝি মায়া-দয়া কিছু নেই—আছে বউমা, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম যে—দোতলার বারান্দায় মেজ বউমার ছেলে ঘুমোচ্ছিল, কেউ কোথাও নেই, রমু আমার দেখি ছেলের গাল টিপে দিচ্ছে—মুখময় চুমু খাচ্ছে, সে যে কী আদর কী বলব তোমাদের, রমু যে আবার ছেলেপিলেদের অমন আদর করতে পারে আমি তো দেখে অবাক····তারপর হঠাৎ আমায় দেখে ফেলতেই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রতিবেশীরা বেড়াতে এসে বলে—তোমার ছোট ছেলের বিয়ে দেবে না দিদি?

স্বর্ণময়ী বলেন—রমুর বিয়ের কথা ভাবলেই হাসি পায়, ও-ও আবার সংসার করবে, ছেলেপিলে হবে। যার কাছা খুলে যায় দিনে দশবার, তরকারিতে নুন না হলে বলবে না মুখ ফুটে, এক গেলাস জল পর্যন্ত চেয়ে খাবে না, একবারের বদলে দু'বার ভাত চেয়ে নেবে না....

তা এই হল রমাপতি। রমাপতি সিংহ। একে নিয়েই আমাদের গল্প।

আমার এক আত্মীয় একদিন টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে।

বললেন—তোমাদের পাড়ায় রমাপতি সিংহ বলে কোনও ছেলেকে চেন?

বললাম—চিনি, কিন্তু কেন?

তিনি বললেন—ছেলেটি কেমন? আমার রেবার সঙ্গে মানাবে?

রেবাকে চিনতাম। আই-এতে দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়েছিল। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। বেশ স্মার্ট মেয়ে। বাবার কাছে মোটর চালান শিখে নিয়েছে। অটোগ্রাফের খাতায় জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে কোনও লোকের সই আর বাদ নেই। নিজে ক্যামেরায় ছবি তোলে। ভায়োলিন বাজিয়ে মেডেল পেয়েছে কলেজের মিউজিক কর্মাপিটিশনে। মোট কথা যাকে বলে হাইলি অ্যাকমপ্লিশড্!

আমি সেদিন সম্মতি দিলে বোধ হয় বিয়েটা হয়েই যেত। পাত্র হিসেবে রমাপতি খারাপই বা কি! নিজে শিক্ষিত। কলকাতায় নিজেদের তিনখানা বাড়ি। সংসারে ঝামেলা নেই কিছু। বোনদেরও সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। চার ভাই-ই বেশ উপার্জনক্ষম! ভাইদের মধ্যে মিলও খুব।

রেবার মা বলেছিলেন—কিন্তু কেন যে তুমি আপত্তি করছ বাবা, বুঝতে পারছি না।

আমি বলেছিলাম—রেবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন মাসীমা, এসব শুনেও যদি মত দেয় তো......

কিন্তু রেবাই নাকি শেষ পর্যন্ত মত দেয়নি।

আজ ভাবছি সেদিন সম্মতি দিলেই হয়ত ভাল করতাম। শেষ পর্যন্ত রেবার বিয়ে হয়েছিল এক বিলেতফেরত অফিসারের সঙ্গে, তারপর সে ভদ্রলোক শেষকালে....কিন্তু সে-কথা এ-গল্পে অবান্তর।

এর পর ননীলাল এসে খবর দিয়েছিল—ওরে, রমাপতির বিয়ে হচ্ছে যে—

আমরা সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—সে কি? কোথায়?

ননীলাল বললে—খবর পেলাম এবার আর কলকাতায় সম্বন্ধ নয়—জব্বলপুর—

বললাম—কী জানি, চিনতে পারলাম না—কিন্তু যার বিয়ে তারই দেখা পেলাম না।

—সে কী?

—সে যে কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—অনেক চেষ্টা করলাম দেখতে, কিছুতেই দেখা পেলাম না।

পরদিন সেই কথাই আলোচনা হল।

ননীলালকে জিজ্ঞেস করলাম—বউ দেখলি রমাপতির?

ননীলাল যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। বললে—বউটার কপালে অনেক দুঃখু আছে ভাই—বেচারী ওর হাতে পড়ে মারা যাবে, দেখিস।

জিজ্ঞেস করলাম—রমাপতিকে দেখলি কাল?

কেউ দেখতে পায়নি। সমস্ত লোকজন আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রইল রমাপতি, সে-ই এক সমস্যা। বিশ্বনাথ বললে—সে-ও দেখেনি।

কিন্তু কনক বললে—আমি দেখেছি।

—কোথায়?

—দেখলাম, মিষ্টির ভাঁড়ারে গেঞ্জী গায়ে ওর পিসীর কাছে তক্তাপোশের ওপর বসে রয়েছে—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে।

—কানাই নাপিতকে চেপে ধরলাম। সে বরের সঙ্গে গিয়েছিল।

সে তো হেসে বাঁচে না। বলে—ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক সেখানে—

—সে কী রে?

—আজ্ঞে, সবাই বলে বর বোবা নাকি? কনের বাড়ির মেয়েছেলেরা খুব নাকাল করেছেন ছোটবাবুকে সারারাত, মাঝরাতে বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোটবাবু আমার কাছে হাজির। আমি ছাতের এক কোণে ঘুমোচ্ছিলাম, ছোটবাবু চৌপর রাত সেই ছাতে বসে কাটাবে আমার কাছে—কিন্তু মেয়েছেলেরা শুনবেন কেন? তাঁরা আমোদ-আহ্লাদ করতে এসেছেন······

কিন্তু পরদিন প্রমীলার কাছে যা শুনলাম তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। প্রমীলা ভোরবেলা উঠেই ওদের বাড়ি গিয়েছিল। আর ফিরে এল বেলা দশটার সময়।

বললাম—এত দেরি হল? দেখা হয়েছে?

প্রমীলা বললে—গেছি বউ দেখতে, আর না দেখে ফিরে আসব? গিয়ে

বললাম—মাসীমা, তোমার বউ দেখতে এলাম—কাল শরীর খারাপ ছিল, আসতে পারিনি—

মাসীমা বললে—ছেলে-বউ তো এখনও ঘুমোচ্ছে—তা ব'সো মা একটু।

—তা দরজা খুলল বেলা ন'টার সময়। তোমার বন্ধু তো আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল কোথায়। বেবি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে। আমাকে দেখেই বললে—মিলি তুই ?

তারপর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল আমায়। দেখলাম—সমস্ত বিছানাটা একেবারে ওলোট-পালোট। নতুন খাট-বিছানা, নয়ন-সুখের চাদর বালিশের ওয়াড়। পাশাপাশি দুটো বালিশ একেবারে সিঁদুরে মাখা-মাখি। বেবির মুখে-গালেও সিঁদুরের দাগ।....বিছানায় শুকনো ফুল ছড়ান।

আমি হাসছিলাম দেখে বেবি জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস যে!

বললাম—সারারাত ঘুমোসনি মনে হচ্ছে—

বেবি বললে—ঘুমোতে দিলে তো' বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমিও স্তম্ভিত। বললাম—বললে ওই কথা ?

—তারপর শোনই তো—

প্রমীলা আবার বলতে লাগল--তাবপর আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোর বর কেমন হল ? তা শুনে কী উত্তর দিলে জান ?

বললাম—কী ?

প্রমীলা বললে—প্রথমে বেবি কিছু বললে না, মুখ টিপে হাসতে লাগল, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে হাসতে হাসতে বললে—বড় নির্লজ্জ ভাই—

সমুদ্র

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সেই রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি। বা বলা যায়, আমি ঘুমোতে চাইনি। যেন দু-তিনবার আমার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। জোর করে চোখ খুলে রেখেছি। তাতে ফল হয়েছে। আর ঘুম আসেনি। জেগে থেকে রাত্রির ভয়ংকর শব্দ শুনেছি, অন্ধকারের গর্জন। যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে একটা মেঘ দূরে কোথাও মাটির কাছে নেমে এসে সারাক্ষণ গুরগুর করে ডাকছিল। কান পেতে গভীর গম্ভীর শব্দটা শুনেছি। বারবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হয়তো সেই শব্দ শুনতে আমি জেগে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীটাকে কেউ নতুন করে তৈরি করছে; ঢালাই-গড়াইয়ের কাজ চলছে; বা অদৃশ্য কোন শক্তি এই সৃষ্টি ভেঙেগ দিচ্ছে—দূব থেকে ভাঙগার কাজ আরম্ভ হয়েছে, ভাঙগতে ভাঙগতে ক্রমে এখানে চলে আসবে সেই শব্দ। এই ঘরের ভিত ভাঙগবে, দেওয়াল ভাঙগবে। ভয়ে বুক কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল; আবার আশ্চর্য এক সুখ, একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে আমি কান পেতে ছিলাম। নতুন সৃষ্টির শব্দ শুনতে, নতুন ধ্বংসের গর্জন শুনতে কার না ভাল লাগে! কষ্ট হচ্ছিল হেনার জন্য। বেচারা সেই শব্দ শুনছে না। অথবা যদি সন্ধ্যার দিকে শুনে থাকে, বুঝতে পারেনি এই শব্দ কেন, কোথায়। না হলে তখন আলোর নীচে বসে ভাত খেতে খেতে দুবার চমকে উঠে ও আমার মুখের দিকে তাকাবে কেন? তারপর একসময় ওর চোখের ঝিলিক নিবে গেছে, ভুরুর বাঁক সোজা হয়ে গেছে; হেসে বলছিল : 'প্লেন!' উত্তর দিইনি প্রশ্নের। অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে ওর থুতনির রেখা, চোয়ালের ঢালুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, হেনাকে এখানে না আনলেই ভাল হত। বেচারাকে এখন কত ছোট দেখাচ্ছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে ও। হাত-পা গুটিয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেছে। তারপর ওকে ভুলে গেলাম। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম—এখানে এসে হেনাকে আমি কত সহজে ভুলে থাকতে পারছি! এখানে, রাত দুটো যখন, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জেবলে ঘড়ি দেখে নিয়ে ভাবলাম, স্ত্রীকে একলা ঘুমোতে দিয়ে কেমন সুড়সুড় করে বিছানা ছেড়ে আমি জানালার কাছে ছুটে আসতে পেরেছি! অন্ধকার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দূরের শব্দ শুনছি, কাছের শব্দ শুনছি। ভাত খেতে খেতে হেনা বলছিল : 'বিচ্ছিরি বাতাস! ঘরের পিছনে বুঝি ঝাউ গাছ আছে! তাই এত সোঁ সোঁ!' দ্বিতীয়বার ওকে

অনুকম্পা করেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, মনে মনে বললাম, এমন চট করে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে আর আমি জেগে থেকে দূর সমুদ্রের গভীর নিস্বন, নিকট সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাস শুনব। আমরা যে সমুদ্রের কত কাছে রয়েছি, কথাটা ভুলে গিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার গর্তে নিশ্চিন্ত আরামে একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে ঘৃণা হচ্ছিল। বলতে কি, প্রথম রাত্রেই মনে হয়েছে, আমি বড়—অনেক বড়; সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ শোনার অধিকার আমারই আছে, তোমার নেই; তুমি ছোট—অনেক ছোট; সমুদ্রকে তুমি বোঝ না, চেন না। প্লেনের শব্দ, বাতাসের সোঁ সোঁ—তা বটে! কেবল কান পেতে শোনা নয়, জানালার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে আমি বিরাটের আশ্চর্য রূপ দেখে নিলাম। তারাখচিত আকাশের নীচে দিগন্তবিসারী অন্ধকারের সে কি ভয়ংকর আলোড়ন! দূরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না, দেখা যায় না—এখানে, তীরের কাছে, না আরও দূরে, যেন স্পন্দমান কম্পমান অন্ধকার ফেটে ফেটে রাশি রাশি ফুলের স্তবক হয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসতে চাইছে! কিন্তু আসে কি? আসে না। আমাদের কাছে আসবার আগে তারা মিলিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন মানুষকে ভয়, অভিশপ্ত মানুষের নিশ্বাসকে ভয়। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে অগাধ উত্তাল ফেনোচ্ছল ভয়ংকর সুন্দরকে প্রণাম করলাম। সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোশের মতো দেখাচ্ছিল। ও যে মানুষ, কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোন ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা, সমুদ্রতীরের এই ছোট ঘরের বিছানাটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কে বলবে! মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় বুক ভার হয়ে উঠল। যেন আমি নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করলাম। ওই ঘুমন্ত খরগোশের বুকের স্পন্দন দেখতে, হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক শুনতে আমি কত রাত্রে ওর গাত্রাবাস সরিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছি, কান পেতে থেকেছি! দেহ-সমুদ্র—দেহ-সমুদ্র! কত মূঢ় উচ্ছ্বাসবিবর্ণ ইচ্ছার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায়, আমি তৃপ্ত ছিলাম। চিন্তা করে প্রায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। চোখে জল এল। সমুদ্র আমার অতীতকে এমন করে তুচ্ছ করে দেবে, কে জানত! ঘুমের ঘোরে হেনা বিড়বিড় করছিল। ঝামাপুকুরের বাড়িতে আমি তৎক্ষণাৎ আলো জেবলে ওর ঠোঁট পরীক্ষা করতাম—দেখতাম, হাসি জেগেছে, কি কান্নার বাঁকাচোরা রেখা জেগেছে ঠোঁটে। সুখের স্বপ্ন দেখছে, কি দুঃখের। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সেসব কিছুই করলাম না। বিছানার কাছে গিয়ে একটা পোকা হাঁটকাবার প্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেন নিষ্ক্রিয় কঠিন থেকে শক্ত হাতে জানালার গরাদ চেপে ধরে বাইরে চোখ ফেরালাম। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে; সফেন তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে তীরের দিকে ছুটে আসছে। একটা এল, ভাঙল; আবার একটা।

আবার, আবার, আবার··কত কোটি বছর ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এভাবে ছুটে আসছে, গর্জন করছে, হাসছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারে! মনে পড়ল, এই সেই অশান্ত উদ্দাম—স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যেতে রামচন্দ্র নিষ্ঠুর তীর মেরে একে শাসন করতে চেয়েছিল। সীতা-উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু শান্তি পেয়েছিল কি শ্রীরাম? কেন পায়নি, কোথা থেকে অভিশাপ এসে লাগল সেদিনের সেই দাম্পত্য-জীবনে? বারবার মনে হতে লাগল—প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, সমুদ্র ক্ষমা করতে পারেনি ওদের। হেনার জন্য এমন কাজ করতে পারব কি আমি? শক্তি নেই। কিন্তু শক্তি থাকলেও আমি এ কাজ করব না। বরং ওই রুদ্রের কাছে নিজেকে কীটাণুকীট—প্রায় একটা বুদ্‌বুদের মতো ক্ষীণায়ু—কল্পনা করতে ভাল লাগছিল। ইচ্ছা করছিল, ঘরে বাইরে ওই বালির বিছানায় একটা ঝিনুক হয়ে আমি অনন্তকাল শুয়ে থাকি। হেনা নেই, সংসারে আর কেউ নেই। যেন এমনও ইচ্ছা করছিল—সকাল হতে সরাসরি ওকে জানিয়ে দেব, তুমি ফিরে যাও, আমি এখানে থেকে যাব। বলব—তুমি যতক্ষণ কাছে আছ, আমার সমুদ্রদর্শন হবে না, সাগরে অবগাহন অসম্পূর্ণ থাকবে। তোমার উপস্থিতি পীড়াদায়ক, একটা অতিরিক্ত বোঝাবিশেষ। তা তো বটেই! সমুদ্র থেকে হেনা আমার কাছে বেশী প্রিয় না, আমি রাম নই। শুনে হেনা কি বলবে, অভিমানে মুখ কালো হয়ে যাবে—নাকি ঠাট্টা ভেবে উচ্চকিত হেসে উঠবে? চিন্তা করতে পর্যন্ত সে রাত্রে আমার খারাপ লাগছিল।

পরদিন সকাল হতে আবার মামার দর্শন পাওয়া গেল। চোখে সাংঘাতিক পুরু লেন্স, গায়ে আধ-ময়লা খদ্দরের হাফ-শার্ট, পায়ে টায়ারের মোটা চপ্পল। মানুষটাকে দেখেই মনে হল, রাত্রে ঘুমোয়নি। চোখের কোলে কালি, কপালে অসংখ্য রেখা, হাঁটা ও কথা বলার মধ্যে ক্লান্তি। আমাদের দুজনকে দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসছে; মনে হল, দাঁতের মাথাগুলি অ্যাসিডে খেয়ে ফেলেছে, তার ওপর পান-দোক্তার কালো লালচে ছোপ। মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে—অল্পস্বল্প যা আছে, মাস ছয়েকের মধ্যে সে ক'টাও অদৃশ্য হবে অনুমান করতে কষ্ট হল না। মানুষ উপোসী থাকলে বা আধপেটা খেয়ে খেয়ে দিন কাটালে যে চেহারা ধরে, মামাকে দেখে তা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা নয়। ভাতের অভাব মামার নেই, একটা হোটেলের কর্মকর্তা সে—হয়তো অসুখবিসুখ কিছু থাকতে পারে, চিন্তা করলাম। আর এদিকে আমার সব দুশ্চিন্তা ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে যেন মামা কাছে এসে হেসে আমার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিল : 'কি মশাই, কেমন ছিলেন? রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন?'

'চমৎকার ঘর হয়েছে আমাদের! আমি তো সেই সন্ধ্যাবেলা চোখ বুজেছি

আর এই সকাল হতে চোখ খুললাম!' হাতের বটুয়া দুলিয়ে হেনা হাসছিল। আমি নীরব। যেন হেনার দিকে চোখ পড়তে মামা একটা হোঁচট খেল। অসম্ভব না। কাল গাড়ির রাস্তায় আসতে আসতে বেশবাস-প্রসাধনের দিকে নজর দেবার সময় ও সুযোগ ছিল না—বরং ধোঁয়ায় কালিতে কাপড়চোপড় ময়লা হবে আশঙ্কা করে হেনা আধ-ময়লা শাড়ি ও ব্লাউজ পরে এখানে এসে নেমেছিল। বলতে কি, ও যখন রিক্‌শা থেকে নেমে মামাদের হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, ওর আলুথালু চুল ও শুকনো মুখখানা দেখে আমার মনে হচ্ছিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে। নাকি সেই চেহারা ওর আসল চেহারা, সেই বয়স ওর আসল বয়স ধরে নিয়ে মামা এখন কচিকাঁচা-মুখ সুবেশিনী হেনাকে দেখে এমন থমকে গেল। যেন ওর কাজল-বোলানো চোখের উজ্জ্বল ধারালো দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মামা সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরাল। কাজেই আমাকে মুখ খুলতে হল। জানি না, হয়তো অপরিচ্ছন্ন চেহারার রুগ্নদেহ ছোটখাট মানুষটাকে খুশী করতে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, 'আমি মোটেই ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন, কেন মশাই ঘুম হল না?' মামা আমার চোখ দেখল। 'এমন ভাল ঘর দেখে দিলাম—একেবারে সমুদ্রের ওপর!'

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। অপাঙ্গে হেনাকে দেখলাম। তারপর, যেন হেনা শুনতে না পায় এমন নীচু গলায় বললাম, 'ঢেউ—ঢেউয়ের শব্দে ঘুম হয়নি!' বস্তুত আমার ও মামার কথা শুনতে হেনা এদিকে তাকিয়ে নেই, একটু দূরে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর ঝিনুক ও শঙ্খের দোকান নিয়ে বসেছে লোকটা—একটু একটু করে সেদিকে এগোচ্ছে ও। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবং অবাক হলাম, মামার গলার স্বরটাও সঙ্গে সঙ্গে আবার কেমন ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'সমুদ্রের শব্দে ঘুম হয়নি, কেমন না?' পুরু লেন্সের ওপারে দৃষ্টিটা ঝিকিয়ে তুলে মামা অল্প শব্দ করে হাসল। 'আমিও রাত্রে ঘুমোতে পারি না।'

'কোন দিন না?'

'কুড়ি বছর।'

চুপ থেকে মানুষটার চোখের কোলের কালি, গালের গর্ত, কপালের কোঁচকানো চামড়া, এমন কি হাত-পায়ের মোটা শিরাগুলি পর্যন্ত নতুন করে দেখলাম।

'অবাক হয়ে গেলেন!' মামার ভাঙ্গাচোরা ময়লা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল, বেশ বড় করে হেসে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে বলল, 'কুড়ি বছর রাত জেগে জলের গুরগুর ঢেউয়ের আছাড় শুনে আসছি।'

হেনা বটুয়া খুলে টাকা বার করছে। যেন এর মধ্যেই দুটো বড় শঙ্খ ও কিছু ঝিনুক-শামুক কিনে ফেলেছে ও।

'যাক গে, আর কোন কষ্ট হয়নি তো?'

'না।' মৃদু গলায় বললাম, 'আর ঘুম হয়নি বলে যে কষ্ট হচ্ছিল বা এখন হচ্ছে, তাও না। ভাল লাগছিল শব্দগুলি শুনতে। আমি ইচ্ছা করে জেগে ছিলাম।'

'হুঁ।' মামা আর হাসল না, বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেল; পাছে ঘাটের দিকে চোখ ফেরালে আমার স্ত্রীকে দেখতে হয়, তাই সেদিকে না তাকিয়ে ডান দিকের বালির ওপর চোখ রাখল লোকটা, আর কেমন জানি অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন গলায় বলল, 'প্রথম প্রথম ইচ্ছা করে জোর করে রাত জাগতে হয়—তারপর আপনা থেকে চোখের পাতা খুলে থাকে—তখন সমুদ্রের ডাক ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। আর তখন....'

শেষের কথা কয়টা বোঝা গেল না। দূরে একটা রিক্‌শা দাঁড়িয়েছে। বেডিং, স্যুটকেস দেখে মামা টের পেল—নতুন যাত্রী। যেন পড়ি-মরি করে যাত্রী ধরতে সেদিকে ছুটেছে। অবশ্য একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল, আবার দেখা হবে। ঘাড় কাত করে আমি হাসলাম। মামা আবার ছুটছে।

'কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?'

'কেন?' অবাক হয়ে হেনার মুখ দেখলাম। হাতের শামুক-শঙ্খগুলি আমার চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে ও, কিন্তু উৎসাহ নেই এমন ভান করে আমি জলের দিকে চোখ ফেরাই।

'বাজে লোক, ঐ শাঁখওয়ালা বলছিল; যেমন ওর চেহারা তেমনি চরিত্র।' একটু চুপ থেকে হেনা আবার বলল, 'কেমন বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছিল তখন!'

'কিন্তু একবার তাকিয়েই তো সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে,' আমার বলতে ইচ্ছা করল, 'তা ছাড়া আমাদের ঘর খুঁজে দিয়েছে যখন লোকটা—কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে!' বললাম না কিছু। আস্তে আস্তে এগোই। হেনা আমার সঙ্গে হাঁটছে হঠাৎ ভুলে থাকতে চাইলাম। এত বড় সাগরবেলায় দাঁড়িয়েও একটি পুরুষের তাকানোর সমালোচনা করতে, তার চরিত্রের নিন্দা করতে হেনার বাধছে না ভেবে মনটা বিষিয়ে উঠল। যা আশঙ্কা করেছিলাম! মেয়েরা কখনই মনের ক্ষুদ্রতা ঢাকতে পারে না। বিরাটের কাছে এসে তোমার কি লাভ হল মেয়ে? দাঁতে দাঁত ঘষে ভিতরের রাগ চেপে রাখলাম। আর, যেন ঈশ্বরের দয়া, যেন আমার সব বিদ্বেষ রাগ ধুইয়ে দিতে বড় মেঘের টুকরোটা সরে গিয়ে আকাশ-মাটি-জল সোনার রোদ্রে ঝলমল করে উঠল। হাতঘড়ি দেখলাম। দেড় ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল

না। জগদ্দল পাথর হয়ে মেঘটা পূবাকাশ অন্ধকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। আমার হৃদ্‌পিন্ড এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না; এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রং ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ—বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে রং ধরে, আর-একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল, অশান্ত, ক্ষিপ্ত, প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

'আমি স্নান করব না। ভীষণ ভয় করবে জলে নামতে।'

'না-ই বা করলে!' হেনার দিকে মুখ না ঘুরিয়ে উত্তর করলাম।

'হাঙগর কুমির কত কি আছে কে জানে!' হেনা বিড়বিড় করছিল। আমি নীরব। দূরে কালো কালো ফুটকি। এই ডুবে যাচ্ছে, এই ভেসে উঠছে। 'ডিঙ্গি নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে, তাই না?' হেনার অবাক চোখ জোড়া দেখতে আমার একটুও ইচ্ছা করছিল না। একটু থেমে থেমে পরে ও বলল, 'কাল রাত্তিরে কিন্তু তোমার মামার হোটেলে সমুদ্রের মাছ খেতে দেয়নি।'

'না, ওটা চিল্কার চিংড়ি ছিল।' গম্ভীর গলায় বললাম। 'সমুদ্রের মাছ খেয়ে কাজ নেই, পেটের অসুখ করবে।'

'ঠাট্টা করছ!' হেনা হাসল। তার বটুয়ার ভিতর ঝিনুকগুলি ঝনঝন করে বেজে উঠল। 'অথচ সবাই সমুদ্রের মাছ খেতে চায়, খুব মিষ্টি।'

ওর গলায় আদুরে সুর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন গলায় বললাম, 'তা সমুদ্রে নেমে স্নান করলেও তো ভাল লাগে! কিন্তু হাঙগর-কুমিরের ভয়ে সবাই কি নামতে সাহস পায়?'

হেনা চুপ করে গেল। আহত হল। বিস্তৃত বিস্ফারিত জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে আঘাত করতে পেরে আমার যে কি ভাল লাগছিল! তখন ভিড় বেড়ে গেছে জলের কিনারে। হাঁটু-জলে, কোমর-জলে, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে।—ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে; কেউ কেউ তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে যেন খাবি খেতে খেতে কোনরকমে স্নান সেরে ছুটতে ছুটতে তীরে উঠে এল। সাদা টুপি পরা কালো কুচকুচে শরীর নুলিয়ার শক্ত মুঠোর ভিতর আটকা পড়ে সুন্দর মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে: বেগোচ্ছল বিশাল ঢেউ হা হা করে ছুটে আসছে। মেয়ে ভয়ে চোখ বুজল আর সেই মুহূর্তে নুলিয়া ওর বেণীসুদ্ধ ছোট মাথাটা জলের নীচে ঠেসে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল কি ও? না, ঢেউ সরে গেছে—নুলিয়ার কঠিন বাহুর ওপর ফর্সা নরম শরীরের ভর রেখে ভিজে সপসপে সায়া-ব্লাউজ নিয়ে রূপসী মাতালের মতো টলতে টলতে হাসতে হাসতে তীরে উঠে আসছে। কে ওকে মাতাল করল? নুলিয়ার হাতের ঝাঁকুনি? ঢেউয়ের

একটা মাত্র দোলা? বালির বিছানায় বসে পুরুষ হাসছে। হয়তো স্বামী, হয়তো সঙ্গী। ত্রস্ত হাতে শুকনো শাড়ি-ব্লাউজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বোধ করি হেনা সেই মুহূর্তে ফিসফিসে গলায় কিছু একটা মন্তব্য করছিল; আমি অন্য দিকে চোখ সরিয়েছি—গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম, মোটা-ভুঁড়ির ভদ্রলোক হাঁটু-জলে কেমন ভয়ে ভয়ে একটা ডুব দিয়ে পাকা চুলে একরাশ বালি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে এল। সমুদ্রকে এত ভয়! ভদ্রলোককে চিনলাম। আমাদের কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের এক প্রতিপত্তিশালী ব্যারিস্টার যেন। ডাঙগায় তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ—রাস্তার মানুষকে হতচকিত করে দিয়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলে; সমুদ্রের কাছে শিশু, অসহায় শিশু।

'আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

'তাই যাও।'

ঝিনুক খুঁজতে লেগে গেছে ও। শরীর বেঁকিয়ে, লম্বা ঘাড় নুইয়ে হেনা বালু খামচাতে খামচাতে এগিয়ে যায়। স্বস্তি বোধ করি। লবণগন্ধী হাওয়ায় ওর বেণী দুলছে, আঁচল উড়ছে। উড়ুক। চিন্তা করলাম, সমুদ্রের ধারে এসে একবার যার ঝিনুক-শামুক কুড়োবার নেশায় পেয়ে বসে, সারাক্ষণ বুঝি তাকে বালুর ওপর চোখ রেখে চলতে হয়, ছুটতে হয়; ঢেউয়ের নাচ, জলের রং ফেরা তার আর দেখতে হয় না। মন্দ কি! মনে মনে হাসলাম। সমুদ্র অনেক ছোট জিনিস ঠেলে ঠেলে তীরে তুলে দিচ্ছে। যাদের ছোট মন তারা ওসব নিয়ে মেতে থাকুক। হেনা, তোমার জন্য শামুকের খোলস, মাছের কাঁটা, জলের নীচে মরা গাছের শিকড়—কি জলের অন্ধকারে নিহত ভক্ষিত আর কোন জীবের নখ দাঁত হাড়, যা সমুদ্রের কাছে অপবিত্র, উচ্ছিষ্ট, অনাবশ্যক। দু হাতে সব কুড়িয়ে আঁচল ও থলে বোঝাই করে নিয়ে এস। কাল রাত্রির মতো আজ আবার স্বচ্ছ দিনের আলোয় ঝামাপুকুর লেনের মেয়েটিকে অনুকম্পা করতে করতে ওপরে উঠে এলাম।

মামা—আমাকে দেখতে পেয়ে চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খর্বকায় মানুষটি। নাকি আমাকে এখানে পাবে আশা করে আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিল? বলতে গেলে প্রায় ঢেউয়ের বাড়ি এসে লাগে এখানে। জলের এত কাছে আর একটিও চায়ের দোকান নেই বলে কাল দুপুরে হেনাকে নিয়ে এখানে প্রথম চা খেতে ঢুকেছিলাম। দোকানের আটপৌরে চেহারা দেখে হেনা নাক সিঁটকিয়েছিল। অথচ এ দোকানে না ঢুকলে কাল মামার সঙ্গে পরিচয় হত না। এবং হোটেলে ঘর পাওয়া শক্ত হত।

'কি মশাই, এর মধ্যেই উঠে এলেন?'

হেসে ঘাড় কাত করলাম। 'চায়ের পিপাসা পেয়েছে।'

'তাই বলুন, চা-খোর মানুষের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই।' দোকানে ঢুকে মামা হাঁকডাক শুরু করে দিল : 'কই রে, বাবুকে ভাল করে চা বানিয়ে দে। বসুন।'

একটা বেঞ্চির ওপর আমি বসলাম। মামা পাশে বসল।

'এই চায়ের দোকানও আমার ভাগ্নের।'

কথা শুনতে আমি তার চোখের দিকে তাকাই। কোটরগত রাত-জাগা চোখ দুটো কুঁচকে মামা মিটিমিটি হাসে।

'হোটেল করার পরামর্শ দিয়েছিলাম আমি। মামার পরামর্শমতো কাজ করে লাভ হয়েছে কিনা, একবার বীরেনকে জিজ্ঞেস করুন না! সাত বছরে দুখানা বাড়ি কিনেছে বীচের ওপর। তার আগে অবশ্য এই চায়ের দোকান। চামড়ার দোকান ছিল একটা। হরিণ আর সাপের চামড়ার জুতো ব্যাগ তৈরি করে বেচত ব্যাটা। যুদ্ধের সময় চামড়ার টান পড়ে। আসলে পুঁজি কম ছিল মুচির। না হলে তখনই তো ফেঁপে ওঠার সময় গেছে। চার টাকার ব্যাগ চৌদ্দ টাকা, দশ টাকার জুতো বত্রিশ টাকায় বিকিয়েছে। তা ক্যাপিটাল না থাকলে কি দিয়ে কি হবে। দোকান ফেল পড়ল। আমি বীরেনকে বললাম দোকানটা রেখে দিতে—চমৎকার চায়ের দোকান হয়। কিছুতেই শুনবে না কথা, শেষটায় রাজী হল যদিও। কি, এই দোকানই তো ভাগ্নের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে! হুঁ, চায়ের দোকানের টাকায় হোটেল—আর হোটেল খুলে সাত বছরের মাথায় বীচের ওপর দু-দুখানা পাকা বাড়ি।'

মামা চুপ করল। চা এসে গেল। আমার জন্য পুরো কাপ, মামার জন্য 'একটুখানি'।

'লিভারটা একেবারে গেছে। চা সহ্য হয় না। দেখলেই অবশ্য খেতে ইচ্ছে করে, তাই ওই এক চুমুক। আমার কড়া অর্ডার আছে—চা চাইলে কখনই এর বেশী দিবিনে।' কাপে চুমুক দিয়ে মামা বলল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম, আজ বড়লোক হয়ে বীরেন আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না; না বলুক, আমি চিরকাল তোমার উপকার করে এসেছি, তোমার ভালটা দেখে এসেছি যখন, আজও করব, করছি, দেখছি। তখন দেখলেন তো, চেঞ্জার এসে নামল আর অমনি খপ্ করে ধরে ফেললাম—দিলাম পাঠিয়ে প্যারাডাইসে।'

হেসে মৃদু গলায় বললাম, 'দেখেছি।' এখন বুঝতে পারলাম, সবাই একে 'মামা' ডাকে কেন? হোটেলের মালিকের মামা, কাজেই বোর্ডারদেরও মামা—তারপর বুঝি সেই ডাক আস্তে আস্তে এখানকার রিক্শাওয়ালা, মুদী, পান-বিড়ির দোকানের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম, আর স্থির দৃষ্টি মেলে সামনের উত্তাল অশান্ত জল দেখছিলাম, শব্দ শুনছিলাম।

'দূরের সমুদ্র সুন্দর, কি কাছের—কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে?'

চমকে উঠলাম। আমার মতো কথা বন্ধ রেখে মামাও হঠাৎ জল দেখছিল। লেন্সের ও-পিঠে ফ্যাকাশে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। প্রশ্নটা অতর্কিত। কিন্তু এত ভাল লাগল! মৃদু মৃদু হাসছে রোগা মানুষটা; এবার আমার চোখ দেখছে।

'বলুন, ষোল ঘণ্টার বেশী এখানে কাটিয়ে দিলেন তো! দূরের সমুদ্র টানছে আপনাকে, না বালির ওপর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা ঢেউ—সেগুলো?'

চুপ করে রইলাম। যেন নতুন করে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কাল অন্ধকারের সমুদ্র দেখে ঢেউয়ের শব্দ শুনে যেমন হয়েছিল। যেন ঠিক করতে পারছিলাম না, আকাশের কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকা শান্ত গম্ভীর নীল রহস্যে ভরা দূরের সমুদ্রকে আমি বেশী ভালবাসব, কি এখানে তীরের কাছের তরল হাস্যোচ্ছল শুভ্র ফেনাবিকীর্ণ খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত মুখর তরঙ্গমালা!

'ঠিক করতে পারছি না।' অসহায়ের মতো মামার দিকে তাকাই।

'তাই বলুন।' মামা তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করল। 'চট্ করে এর উত্তর দেওয়া যায় না। যারা দেয় তারা না বুঝে বলে। হুঁ—পুরো দু বছর লেগেছিল আমার এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে—হা-হা।'

কিন্তু আমি তার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সমুদ্র নিয়ে রোগা মানুষটা তা হলে রাত-দিনই অনেক কিছু ভাবছে! কুড়ি বছর রাত জেগে ঢেউয়ের গর্জন শুনছে তখন বলছিল না!

'কই রে, আর একটুখানি দিবি?'

দোকানের প্রৌঢ় কর্মচারীটির দিকে মামাকে সকাতরে তাকাতে দেখে অবশ্য আমার হাসি পেল। লিভারের রুগী এইমাত্র চা খেয়ে আবার চা চাইছে। হাসলাম এবং এও লক্ষ করলাম, কর্মচারীর চেহারা নিদারুণ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ফিনাইলের ন্যাতা বুলিয়ে সে ওপাশের টেবিলটা মুছছিল। ওখানকার যত মাছি তাড়া খেয়ে আমাদের কাছে চলে এল।

'কি, তুই যেন রাগ করলি নীলাম্বর!' কর্মচারীর মনের ভাব বুঝে ফেলে মামা গলাটাকে আরও করুণ করে ফেলল। 'দে, দে—পয়সা দেব; আমি তোদের ক্ষতি করব না। তোর মনিব দু বেলা দু কাপ বরাদ্দ করে দিয়েছে আমার জন্য—কিন্তু অতিরিক্ত যেটা খাচ্ছি তার জন্য কি আমি দাম দিই না?'

হাতের ন্যাতা ফেলে রেখে নীলাম্বর গজগজ করে উঠল। 'আপনার কাছে পয়সা চাইছে কে? আপনার ভাগ্নের দোকান—যত খুশি খেয়ে যান। কিন্তু সময়-অসময় আছে তো! এখন বেলা দশটা বাজে, ধোয়া-মোছার কাজ করব, কি চা বানাব?'

মামা আমার চোখ দেখল।

'বুঝলেন তো! আসলে বীরেন বারণ করে—চা চাইলেই মামাকে চা দিবিনে। আমি বুঝি—সাতচল্লিশ বছর বয়স হল এমন সাদা কথাটা বুঝব না! বীরেন এখন আমাকে পছন্দ করে না। না করুক। কিন্তু আমি তার উপকারই করে যাব, তার ভালটাই দেখব; আমি হোটেলের যত বোর্ডার যোগাড় করি—'

কথা শেষ হল না। নীলাম্বর ঠক্ করে পেয়ালাটা মামার সামনে রাখল। চা পেয়ে মামার মুখ উজ্জ্বল হল, তৎক্ষণাৎ একটা চুমুক দিয়ে সরস গলায় বলে চলল : 'হ্যাঁ, বলছিলাম, তা বলে তোমার এদিকের বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে বা কি পরিমাণ হার্ড ক্যাশ আছে সেসবের খোঁজ আমি রাখি না—দরকার নেই আমার রাখবার। আমি ভিখিরী আছি, আছি। আমার যদি ওসবের দিকে নজর থাকত, লোভ থাকত, তো নিজে একটা হোটেল বা রেস্টুরেণ্ট খুলে বসতে পারতাম না কি? কুড়ি বছর হল এখানে আছি—না, কিছুই আমাকে টানল না, কিছুই আমার দরকার নেই—খাই না-খাই, ছেঁড়া কাপড় পরলাম না-পরলাম, একবার চিন্তা করি না—' ক্লান্ত শীর্ণ হাতটা সমুদ্রের দিকে তুলে ধরে মানুষটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমি আছি আর সে আছে—আর কিছু চাই না, দরকার নেই।'

হাসলাম আর কেমন যেন একটু শ্রদ্ধার চোখে—গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, কবি বা দার্শনিকের দিকে মানুষ যেমন তাকায়—রোগা মানুষটাকে আর একবার দেখে নিয়ে তার মতো আমিও স্থির দৃষ্টি মেলে সমুদ্র দেখতে লাগলাম।

দূরের গাঢ় নীল ফিকে হয়ে গেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র বুকে নিয়ে সমুদ্র এখন অন্য রূপ ধরেছে; যেন কিছু গলানো সীসা, কিছু রূপা হয়ে গিয়ে ওদিকের রাশি রাশি জল গর্জন করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে।

'লক্ষ করেছেন—রূপা ও সীসার সঙ্গে খানিকটা জাফরান রঙের মিশেল আছে?'

মামার দিকে চোখ না ফিরিয়ে আমি ঘাড় কাত করলাম।

'রোদের তেজ যত বাড়ছে তত তার বিক্রম বাড়ছে।' হাসল মামা।

'তাই,' বললাম, 'মেছো ডিঙিগুলো আর দেখছি না।'

'সব উঠে এসেছে।' নাকের একটা শব্দ করে নোংরা দাঁতগুলো ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা বুঝি ভিতরের উল্লাস প্রকাশ করল। 'আর কতক্ষণ—এখন ওখানে থাকলে আছাড় মেরে ডিঙি ফাটিয়ে ফালা ফালা করে দেবে না! ওর সঙ্গে কি আর চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ারকি চলে!'

কথাটা বুকের মধ্যে গেঁথে রইল। 'চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ারকি চলবে না বলে তো এখন আর দূরে-কাছে একটা মানুষকে জলে নেমে স্নান করতে দেখছি না।' চিন্তা করলাম। বালুতট প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। বালুর ওপর ভেঙে

পড়া শব্দের ঝড় খরতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তটের গায়ে আঘাত করেও সে শান্তি পাচ্ছে না, যেন তৎক্ষণাৎ এতটা করে ভালবাসার ফেনা সান্ত্বনার শুভ্র প্রলেপ বুলিয়ে দিতে এক একটা ঢেউ জল ছেড়ে কত দূর পর্যন্ত উঠে আসছে। মহতের যা গুণ! কাউকে আঘাত দিতে নেই, হিংসা করতে নেই; প্রেম-ভালবাসা যত পার বিলিয়ে যাও। বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ে সাদা সাদা ফেনার আবেগময় চুম্বন এঁকে দিয়ে ঢেউগুলি আবার নেমে যায়।

'আমার মনে হয়, কাছের জল দেখছেন, বালু ছিটানো ঢেউ।'

মনের কথা লোকটা কি করে টের পেল; অবাক হয়ে ঘাড় কাত করে হাসলাম। 'তাই ফেনাগুলো দেখছি যুঁইফুলের মতো সাদা।'

'এখন কিছুকাল ফেনা দেখেই কাটবে, আর ঘোলা জলের মাতলামি।' মামা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তারপর আর এখানে চোখ থাকবে না, আর ক'দিন পর আপনার চোখ আর কোথাও সরে যাবে।'

দূরের সমুদ্র! আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেননা, পাশের মানুষটির গাঢ় দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল যে, কথা বা হাসি কোনটাই যেন তখন মানাত না। চুপ করে দিগন্তে ধূসর নীল বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর গুরুগুরু শব্দ শুনলাম। না, কেবল দেখা নয়, শোনা নয়, বুকের ভিতর কি যেন হাহাকার করে উঠল। যেন আমার কি নেই, হারিয়ে গেছে—নাকি সারা জীবন যা চেয়েছি তা আজও পাইনি বলে হৃদ্‌পিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল।

আমার কানের কাছে অপরিচ্ছন্ন রেখাসংকুল মুখটা সরিয়ে এনে মামা ফিসফিস করে উঠল, 'আপনার রক্তের মধ্যে ওই শব্দ চলে যাবে—মগজের ভিতর ছবিটা আটকা পড়বে—আজ না, ক'দিন তাকিয়ে থাকুন—তখন আর কোন কাজকর্ম ভাল লাগবে না, চোখের ঘুম উধাও হবে, ক্ষুধা কমে যাবে—'

'ভয়ংকর নেশা!' বিড়বিড় করে বললাম। ভাল লাগছিল, আবার ভয়ও করছিল শুনতে। অত্যন্ত আস্তে কথা বলছিলাম দুজন। যেন এসব জোরে বলতে নেই, অন্যকে শুনতে দিতে নেই।

'ক'দিন আছেন এখানে?'

'সাত দিন—তারপর ছুটি ফুরিয়ে যাবে।' মামার চোখের দিকে তাকাই।

যেন বিশ্বাস করতে পারল না আমার কথা, এমনভাবে মানুষটা মাথা নাড়ল। 'হুঁ, ওই সাত দিন চৌদ্দ দিন হয়ে যাবে—চৌদ্দ দিন দেখতে দেখতে মাসে গিয়ে দাঁড়াবে—মাস বছর।' একটু থেমে মামা শেষ করল : 'আমি চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছিলাম সমুদ্র দেখতে—চব্বিশ ঘণ্টা আজ কুড়ি বছর হতে চলল।'

অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ফ্যালফ্যাল করে মানুষটাকে দেখছিলাম।

একদিন চাকরি করত তা হলে! বিয়ে-থা করেছিল কি? কিন্তু সেসব প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হল অবান্তর—শুধু সমুদ্র আর সমুদ্রের ধারের রুগ্ন জীর্ণ মানুষটাই সত্য—মাঝখানে আর কিছু নেই, থাকা উচিত নয়; কি, আমারও কি কাল প্রথম রাত্রেই মনে হয়নি, যদি আমিও এই গর্জমান স্পন্দমান ভয়ংকর সুন্দরের সামনে হারিয়ে যাই—হারিয়ে যেতে পারতাম—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মামা। চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন। একটু আগের মুগ্ধ আবিষ্ট ভাবটা কেটে গেছে।

'কি হল?' আস্তে শুধাই। কথার উত্তর দিচ্ছি না বলে কি রাগ করল—ভাবলাম।

'নাঃ মশাই, আর দেখা হল না—ভাল লাগছে না।'

'কেন?' জলের দিকে চোখ ফেরাই, তারপর আবার মানুষটার মুখ দেখি। বুঝতে পারি না।

'আপনার ওই যুঁই ফুলের মতো সাদা ফেনার দিকে এখন আর চোখ রাখা যায় না।'

'কেন?' একটা বড় ঢোঁক গিললাম। একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

'কেন আবার কি—ফুলের ওপর যদি একটা মাছি বসে থাকে, আপনার ভাল লাগবে?' অসমান ময়লা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা রীতিমতো ভেংচি কাটল : 'কতক্ষণ সেই ফুলের দিকে আপনি তাকাবেন, বলুন? ঐ, ঐ দেখুন।' আঙুল তুলে মামা আমাকে সামনের রৌদ্রখচিত সুন্দর বালুতট দেখাল।

বালুর ওপর ছুটে ছুটে আসছে দুধ-রং ফেনা; নির্জন শূন্য—আর কেউ নেই ওখানে স্নান করতে, ঢেউ দেখতে; না আছে—একজন, একটা মেয়ে; মেঘের টুকরো হয়ে সিল্কের আঁচল উড়ছে, বেণী দুলছে। একটা বেশ বড়মতন ফেনা পর পর দুবার ছুটে এসে ওর আলতা-ছোপানো পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলে। খিলখিল করে হাসছে হেনা। ঢেউ সরে যেতে আবার একটু এগোয়, নুয়ে ঝিনুক কুড়ায়; এবার আগের চেয়েও বড় হয়ে রামধনুর মতো বেঁকে দ্রুত ধাবমান ফেনার উচ্ছ্বাস ওকে আক্রমণ করে—কিন্তু ছুঁতে পারে না, ছুটে হেনা শুকনো বালুর ওপর উঠে আসে আর খিলখিল করে হাসে। যেন সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে ভেঙ্গে কুটিকুটি হতে চাইছে ও।

'ইয়ারকি করা হচ্ছে, তামাশা চলছে সমুদ্রের সঙ্গে!' আমার দিকে তাকায় না মামা, ওদিকে চোখ রেখে রাগে গজগজ করে।

আমি নীরব। লজ্জায় চোখ তুলতে পারছি না। সত্যি তো, এত হাসবার কি আছে, মনে মনে বললাম। সমুদ্র দেখে মানুষ যেখানে বিমূঢ় বিস্মিত, সেখানে হেনার এই চাপল্য কত অশোভন, কেমন অসংগত ঠেকছিল।

ফ্লের গায়ে মাছি—ঢেউয়ের মাথার প্ঞ্জ প্ঞ্জ ফেনার গায়ে আলতা-পরা পা ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার তুলে আনা আর ছ্টে পিছনে সরে আসা! উপমাটা মনে-প্রাণে আমাকে অন্মোদন করতে হল। রাগে, দ্ঃখে ছটফট করছিলাম।

আমার মনের অবস্থা মামা ব্ঝতে পেরেছিল কি? নিশ্চয় চেহারা দেখে অন্মান করতে তার কষ্ট হয়নি! ম্খটা কানের কাছে সরিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এমন সেজে-গ্জে জলের কাছে যাওয়াটাও কিন্তু ঠিক না মশাই—তখনই আপনাকে আমি বলব ভেবেছিলাম।'

যেন একটা সতর্কবাণী, একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের ইশারা। প্রো লেন্সের ও-পিঠের বিবর্ণ চোখ দ্টোর দিকে আমি একবার মাত্র দৃষ্টি ব্লিয়ে আবার জলের দিকে চোখ ফেরালাম।

'চলি, দেখা হবে।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল।

একট্ স্বস্তিবোধ করলাম বইকি তখনকার মতো! সিল্কের আঁচল উড়িয়ে, বেণী দ্লিয়ে সম্দ্রকে সামনে রেখে হেনার ছ্টোছ্টি, নির্বোধ হাসি আর একজন না দেখ্ক, তৃতীয় একটি প্রাণীর চোখে না পড়্ক, মনে মনে আমি তাই চাইছিলাম। একটা বিজাতীয় ক্রোধ, অপরিসীম ঘৃণা ব্কের মধ্যে চেপে রেখে চিন্তা করছিলাম, রং-করা ঠোঁটের বিচ্ছ্রিত হাসির বিদ্রূপ ছড়িয়ে, কাজল-বোলানো চোখের কুটিল কটাক্ষ হেনে প্রমত্ত ভয়ংকর সম্দ্রকে অপদস্থ করার ধৃষ্টতা চিরদিনের মতো থামিয়ে দিতে হেনাকে কি শিক্ষা দেওয়া যায়!

'ব্ঝলেন মশাই, স্বিধের লোক নয়—ওর সঙ্গে মেলামেশা কম করবেন।' নীলাম্বর। মামা দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে টেবিলের কাপ সরাতে লোকটা এসে পাশে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে ওর চোখ দেখি।

'কে? কার কথা বলছ?' প্রশ্ন করতে করতে অবশ্য ব্ঝে গেলাম কর্মচারীটির এই আক্রোশ কার উপর। যখন-তখন চা করে দেওয়ার দ্ঃখ সে কিছ্তেই ভুলতে পারে না নিশ্চয়। অল্প হাসলাম। 'কেন, আমার তো মনে হয়, বেশ ভাল লোক—দিনের বেলা সম্দ্র দেখে আর রাত জেগে ঢেউয়ের শব্দ শোনে—ওই তো কাজ ওর!'

'পাজী মশাই, মহাপাজী! বীরেনবাব্ ভাল মান্ষ বলে দ্ বেলা দ্ ম্ঠো ভাত দেয়—অন্য লোক হলে ওকে ঘাড়ে ধরে কবে বার করে দিত।'

'কেন, হোটেলের বোর্ডার-টোর্ডার যোগাড় করে দেয় তো শ্নি।' প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চ্প করে রইলাম। বিষয়ী ব্যবসায়ী বীরেনবাব্র কাছে—তার কর্মচারীর কাছে মাঝে মাঝে দ্-একটি খদ্দের বা বোর্ডার যোগাড় করে দেওয়ার ম্ল্য কতখানি! যে লোক সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো ঘ্রে বেড়ায়, সম্দ্রের ঢেউ গ্নে সময় কাটায়, সে লোক তাদের চোখে মহা অপদার্থ বা পাজী হওয়া বিচিত্র নয়। 'শালা মাতাল, শালা নেশাখোর!'

টেবিল সাফ করতে করতে নীলাম্বর নিজের মনে গজগজ করে। কিন্তু বলতে কি, এইমাত্র যে আমার পাশে বসে ছিল—কাছের সমুদ্র আর দূরের সমুদ্রের রহস্য ব্যাখ্যা করতে যার জুড়ি নেই, যার কথা শুনে সমুদ্রকে আরও নিবিড় করে চিনতে চলেছি, ভালবাসতে আরম্ভ করেছি, সে মাতাল, নেশাখোর জানতে পেরে আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। বরং চিন্তা করলাম, মদ বা গাঁজা টেনেও যদি সে নেশা করে, মাতলামি করে, সেই নেশা তার কতক্ষণের! বরং বলা যায়, যে নেশার টানে আজ কুড়ি বছর মানুষটা সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে, সেটাই তার আসল নেশা; সেই ভয়ংকর নেশা বুঝতে পারার ক্ষমতা বীরেনের নেই, চায়ের দোকানের কর্মচারী টাক-পড়া নীলাম্বরের নেই, হয়তো আর কারোরই নেই; আমি ব্যতিক্রম এবং এইজন্য ভিতরে গৌরববোধ করলাম। কবি, শিল্পী, সাধকের সংখ্যা এই জগতে খুব বেশী কি? চিন্তা করে নীলাম্বরের চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সফেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উন্মুক্ত সমুদ্র দেখতে, ঝড়ো লোনা হাওয়ায় বুক পুড়ে নেশায় আতুর হতে ছুটে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

হুঁ, একসময় শাড়ির আধখানা ভিজিয়ে বালি-মাখানো পা দুটো টেনে টেনে হেনা যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, আমি ঘৃণায় অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আঁচলের খুঁটে আবার এতগুলি ঝিনুক বেঁধে এনেছিল ও; ঘাম-তেলতেলে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের কোলের কাজল ফিকে হয়ে গিয়ে সেখানে বুঝি চাপ চাপ ক্লান্তি বুলেছিল। শিউরে উঠেছিলাম। নারীর এই দলিত মথিত ক্লান্ত বিপর্যস্ত রূপের সঙ্গে কি আমি পরিচিত ছিলাম না? বড় বেশী পরিচিত ছিলাম বলে রৌদ্রালোকিত প্রশান্ত বালু-বেলার পবিত্র পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার করে দিযে ঝামাপুকুরের বাড়ির গাঢ় রাত্রির নৈঃশব্দ্যগুলি আমার চোখের সামনে ঝুলছিল—বিছানার ছবিটা মনে পড়ছিল। ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। এক মায়াবিনী ডাইনী সমুদ্রের ধার পর্যন্ত আমাকে ধাওয়া করে ছুটে এসেছে!

'তুমি যাও, ঘরে ফিরে যাও!' কণ্ঠস্বরের বিকৃতি নিজের কানেও লাগল, কিন্তু তখন উপায় ছিল না।

'তুমি যাবে না? বেলা হল, কখন খাবে?' চমক নেই, ভয় নেই, কুণ্ঠা নেই। সেই পরিমিত সংক্ষিপ্ত নিস্তরঙ্গ ধূসর দিনগুলির ডাক।

আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। এখানে এসেও খাওয়ার ডাক!

'তুমি যাও, কাপড়-চোপড় বদলাবে তো, না কি?' কোনরকমে উত্তর সেরে গরম বালুর উপর জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। ঢেউয়ের শব্দে ওর কণ্ঠস্বর চাপা পড়বে চিন্তা করে দূরে সরে গেলাম।

ওর সাধ মিটেছিল। সমুদ্রের মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিটোল

একটা ঘুমের ভিতর দিয়ে সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিতে পেরেছিল। ঢেউয়ের শব্দে ঘুম ভাঙবে ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছিল। প্রতিবাদ করিনি। কেননা, চোখে জল দেখতে না পারলেও জলের গর্জন আমার রক্তের মধ্যে বাজছিল, জলের ছবি মগজের ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছিল। শিয়রের পাশে ঝিনুক-শামুকগুলি ছড়িয়ে রেখে ঘুমোচ্ছিল হেনা। ইচ্ছা করছিল, সবগুলি তুলে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কি, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না—এগুলিও ওর সঙ্গে ট্রেনে চড়ে খুব শিগগিরই কলকাতায় ফিরে যাবে, হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি চাপবে। তারপর এক ছুটে ঝামাপুকুর লেন। তারপর কাঁচ-পরানো আলমারির তাক। না, তখন আর হেনার সময় নেই ওদের দিকে তাকাবার। অফিসের রান্না নামছে না। আর একবার একটু জায়গা। তারপর লিফট-এর সোঁ সোঁ। তারপর? তারপর আব কিছু নেই। মানুষের গরম নিশ্বাস আর ঘামের গন্ধের মধ্যে ট্রামের এক কোনায় একটু জায়গা। তারপর লিফ্ট-এর সোঁ সোঁ। তারপর? তারপর আর কিছু নেই। সমুদ্র অনেক দূরে। ঢেউয়ের গভীর নিস্বন স্তব্ধ। ঝকঝকে বালির বিছানায় রূপালী ফেনার উচ্ছ্বাস অতীতের স্বপ্ন হয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছট-ফট করতে লাগলাম। যেন কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। হেনার মাথার কাছে দেওয়ালের ছবিটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি।

ঘুম থেকে উঠেই সকলের আগে ও খোঁজ করে চিরুনির, চুলের কাঁটার।

'আমি জানি না।'

'পাউডারের কৌটো গেল কোথায়?'

'আমি দেখিনি।'

'বা রে, আমার লিপস্টিক কাজললতা বা কে সরালে!'

'সত্যি আমি বলতে পারব না।' অনুনয়ের চোখে স্ত্রীর মুখ দেখি। একটু বেশী গম্ভীর থেকে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চোখ ফেরাই।

'অবাক কাণ্ড তো! ঘরে কি চোর ঢুকেছিল?' হেনা বিড়বিড় করে; আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গলা টান কবে উঁকি দিয়ে দেওয়ালের তাক দুটো দেখল ও, তারপর হাঁটু মুড়ে, পিঠ বেঁকিয়ে খাটের নীচ দেখে শেষ করল। 'না, কোথাও নেই—ওখানে আলতার শিশিটা ছিল—নেই। বিচ্ছিরি কাণ্ড তো!'

ঘুরে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মুখের পেশী কঠিন করে আমি মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতের নখ দেখি, চামড়া দেখি।

'কি হল, তুমি চুপ করে যে?'

'আমি কি জানি?' ভয়ে ভয়ে চোখ তুললাম।

'তুমি লুকিয়েছ, নিশ্চয় তুমি!'

'সত্যি না।'

'উ'হ্, আর কে আসবে এ ঘরে—দরজার ছিটকিনি আটকানো—তুমি চেয়ারে বসে ঢুলছ। শোবার সময় আমি কানের রিং দুটো খুলে টিপয়ের ওপর রেখেছিলাম—দেখ, ঠিক ওখানে রয়ে গেছে। আর চোর এসে কিনা সোনা রেখে আলতা লিপস্টিক নিয়ে গেল! আর, চোর ঢুকবেই বা কি করে!' হেনা আমার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয় : 'তুমি—তুমি দুষ্টুমি করে—'

কাজটা কাঁচা হয়ে গেছে। আর গম্ভীর হয়ে থাকাও অর্থহীন, বরং হেসে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। হাসলাম।

'কোথায় রেখেছ? কি আশ্চর্য, এমন কাজ করে তুমি এতক্ষণ চুপ থাকতে পার!' হাসির ঝলক তুলে হেনা আমার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তার আগেই আমি শার্টের নীচে লুকানো কোলের ওপর জড়ো করা চিরুনি, চুলের কাঁটা, আলতা, লিপস্টিক বের করে দিই। এবার হেনা হাসতে হাসতে মেঝের ওপর ভেঙে পড়ল, এলো খোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলের রাশ কালো কালো ঢেউয়ের মতো সাদা নরম পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চট করে চোখটা সরিয়ে নিই, বুকের ভিতর ধাক্কা লাগে, অপরাধী মনে হয় নিজেকে। সেকেন্ডের জন্যও কি আমি আমার ঘরের কাছের প্রচণ্ড প্রমত্ত যুগ-যুগান্তের বিস্ময় ভয়ংকর সুন্দর পবিত্র সমুদ্রতরঙ্গকে ভুলতে চেয়েছিলাম? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে জানালার পাল্লাগুলি খুলে দিলাম। হেনা ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঁচল সামলে নিয়ে চিরুনি দিয়ে ও চুল আঁচড়ায়। টের পেয়ে আমি আর ওদিকে তাকাই না।

'হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

'এমনি।'

'এসব লুকিয়েছিলে কেন?'

'এমনি।'

'এখানে এসে মাঝে মাঝে তোমার কি যে হচ্ছে—তখন বীচ্-এ কত বড় এক ধমক—'

'ধমক দিইনি তো! বলছিলাম—তুমি যাও, আমি আসছি।'

'ও, তাই নাকি! আমি ভাবলাম—' হাসির শব্দ।

'কি ভেবেছিলে, শুনি।' সমুদ্রকে পিছনে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে হল: ঢেউয়ের শব্দ ওর হাসির শব্দে চাপা পড়ে যায় অনুভব করে মাথাটা আবার গরম হতে থাকে। এমন আর কতকাল চলবে যেন ঠিক করতে না পেরে হতভম্বের মতো ওর মুখ দেখি, ভুরু দেখি।

সুযোগ বুঝে নারী অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে। 'তাকিয়ে কি দেখছ?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয় দেখছ, আমাকে দেখছ।' প্রতিশোধ তুলতে ঠোঁটের হাসি নিবিয়ে হেনা গম্ভীর হয়ে ওঠে : 'তা আমায় দেখে দরকার কি—ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ, সমুদ্র আমার চেয়ে সুন্দর।'

এর পর আর আঘাত করা চলে না চিন্তা করে অনুকম্পার হাসি দু চোখে ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, 'অত সেজে-গুজে কোথায় বেরোনো হচ্ছে?'

'আমি সেজে-গুজে বেরোই তুমি চাও না—কেমন, তাই তো এসব লুকিয়েছিলে।' দাঁত দিয়ে ফিতা কামড়ে ধরে ও বেণীর গলায় ফাঁস পরায়, তারপর ফিতাটা মুখ থেকে আলগা করে দেয় : 'নাকি এটা কলকাতা না বলে আমার সাজতে-গুজতে মানা—এখানে কেবল তুমি আছ আর জল আছে আর তোমার ঐ কুৎসিতদর্শন মামাটি আছে, তাই যথেষ্ট—' একটু চুপ করল ও, হাতের আরশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সদ্যোরচিত খোঁপাটি দেখল, তারপর : 'আমি ভাবতেই পারি না, বেছে বেছে তুমি ঐ বাজে চরিত্রের ছোটলোকের মতো দেখতে মানুষটার সঙ্গে কি করে মিশে যেতে পারলে—একটা ঘণ্টা ওর সঙ্গে বসে চায়ের দোকানে গল্প করে কাটালে, আমি কি লক্ষ করিনি!'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করলাম না, চুপ করে গেলাম। যেমন তখন চায়ের দোকানের নীলাম্বরের কথা শুনে চুপ থেকেছি। কিন্তু নীলাম্বর না বুঝুক, হেনা বুঝত, পৃথিবীর যে মানুষ প্রথম ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়েছিল সে বাজে চরিত্রের ছিল, ছোটলোক ছিল; আকাশের গ্রহনক্ষত্রের রহস্য যে বোঝাতে চেয়েছিল সে উন্মাদ ছিল, অপরাধী ছিল—হোটেল-রক্ষক বীরেনবাবুর মামার মুখে সমুদ্র ছাড়া কথা নেই, অগাধ বিস্তৃত ধূসর নীল ছাড়া চোখে আর কোন রং নেই, স্বপ্ন নেই, কাজেই—

'আমি এখন মন্দির দেখতে যাব, বুঝলে—মন্দির দেখা হয়নি—এ বেলা আর বীচ্-এ যাব না।'

'তাই যাও।' অস্ফুটে বললাম। আমার গায়ে যেন দক্ষিণের হাওয়া লাগল। এখানে এসে ত্রিশ ঘণ্টা পর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করতে লাগলাম।

আকাশের আলো নিবে যাচ্ছে, সমুদ্র সীসার রং ধরেছে; কাছের সীসা গলে গলে তরল রুপা হয়ে সোঁ সোঁ শব্দ করে অবিশ্রাম ছুটে আসছে। ম্রিয়মাণ রৌদ্রের গন্ধ লবণের গন্ধ গায়ে মেখে ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হু-হু বাতাস বইছে, আমি নড়ছি না, আমার পিছনের শুকনো বালু উড়ছে। সামনের বালু লোনা জল খেয়ে ভারি হয়ে শুয়ে আছে, বাতাস তাকে নড়াতে পারে না। সেই ভারি ভিজা বালুর ওপর পায়ের দাগ নেই, কোন দাগ নেই—

মসৃণ, গাঢ়, অকলঙ্ক, নিটোল; জল সরে গিয়ে এই বুঝি পৃথিবীর প্রথম মাটি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে মনে করা যায়। আর আমার ঠিক পিছনে কত কোটি পায়ের চিহ্ন পড়ে বালু ক্ষতবিক্ষত—যুবকের পায়ের দাগ, যুবতীর পায়ের ছাপ। কত লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিশু কিশোর-কিশোরী না হেঁটে গেছে এর ওপর দিয়ে! মনে হতে পারে, সব মানুষ বুঝি এখানে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে; মনে হতে পারে, সব মানুষ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল, তারপর যার যেখানে যাবার চলে গেছে। আসলেও কি তাই নয়, ভাবলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, আর নগ্ন নির্জন সমুদ্র একভাবে ফুঁসে চলেছে। তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, প্রাণের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিরবয়ব অন্ধকার অতলস্পর্শ গর্ভ জুড়ে লক্ষ যড়যন্ত্রের আবর্ত তৈরি করে চলেছে।

'কি দেখছেন? কাকে খুঁজছেন?'

'আপনাকে।'

'আমি তো এখানেই আছি, মশাই!' হাল্কা শীর্ণ হাত দুটো আমার কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বীরেনবাবুর মামা হাসল। 'লক্ষ করছিলাম, সব চলে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল, আপনি একলা ঘুরে ঘুরে জল দেখছেন কেবল।'

'ভাল লাগছে, আবার ভয়ও করছে।' অল্প হাসলাম।

'তা করবে। আরও কিছু দিন যাক, আমার মতো যেদিন আর পিছুটান থাকবে না সেদিন আর ভয়-ডর থাকবে না।'

গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। একটা কি পায়ে লাগল।

'ডাব।' মামা নাকের শব্দ করে হাসল। খুব ভাল লাগল না হাসিটা, কিন্তু তা হলেও কথাগুলি শোনার মতন : 'কেউ নিবেদন করেছিল আর কি—সমুদ্র দেখতে এলেই তো ফল-ফুল ছুঁড়ে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়!'

'কিন্তু রাখল না তো উপহার, সমুদ্র আবার ওটা বালুর ওপর রেখে গেছে।' বিড়বিড় করে বললাম।

'সমুদ্র এসব রাখে না—কিন্তু মানুষ কি তা বোঝে!' একটু চুপ থেকে লোকটা আস্তে আস্তে বলল, 'কেন রাখবে, আপনিই বলুন! ডাবটার মধ্যে কি আছে—না শাঁস, না জল; সবে ফুল কেটে বেরিয়েছিল হয়তো—ওই ফল আপনি খাবেন না, আমিও না। খাওয়া যায় না। কাজেই সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়েছে। ফুল? ফুল-বেলপাতা আপনি চিবিয়ে খান, না আমি খাই? কিন্তু মূর্খের দল এসবই ঢেউয়ের মাথায় ছেড়ে দিয়ে ভাবে, অনেক কিছু দিলাম।'

'তা তো বটেই!' সায় না দিয়ে পারলাম না।

'পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না—সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।'

চুপ করে শুনলাম। তারা-ছড়ানো আকাশের নীচে কালো জলের অশ্রান্ত গর্জন এ কথাই কি মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভাবলাম, আমি জীবন্ত, আমি ভয়ংকর—

'আমি যখনই বালুর ওপর বেড়াতে আসি, পকেটে করে কিছু মাছভাজা, কেক্, পাঁউরুটি বা আর কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

হাসছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এত জোরে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি লাগল, যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হল, রোগা মানুষটার শরীরে এত বল!

'কি, বিশ্বাস করছেন না? আমার আপনার মতো তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা, রুচি—সব কিছু। ওই দেখুন কেমন রাক্ষসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।'

হাসি মিলিয়ে গেল, বুকের ভিতর দুবদুব করছিল। গাঢ় জমাট অন্ধকার কেটে ফালা ফালা করে দিয়ে ভয়াল বিশাল ঢেউ এত বড় এক একটা হাঁ নিয়ে ছুটে আসছে, অস্বীকার করবে কে?

'আপনি তখন বলছিলেন যুঁইফুল—সাদা যুঁইয়ের মালা মাথায় জড়িয়ে ওরা আপনাকে আমাকে ভালবাসতে আসে। তা তো বটেই—একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন, ফুল, কি সাদা শক্ত ধারালো দাঁত ওগুলো।'

অস্বস্তি বোধ করছিলাম। না, আমি মেনে নিতে পেরেছিলাম, রুপালী ফেনা না, কোমল ফুল না—ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর কঠিন দাঁতের সারি মেলে ধরে ওরা আসছে, একটার পিছনে আর একটা, আর একটা, আর একটা—আমার পাশের মানুষটা আবার নাকের শব্দ করে হাসছে। যেন ঘিনঘিনে হাসিটা আমার মগজের ভিতর আটকা পড়ে যাবে। মেরুদাঁড়ায় শিহরন অনুভব করলাম। আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিচ্ছে না কেন, মুহূর্তের জন্য তাও চিন্তা করলাম।

'কি মশাই, একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, মুখে রা নেই—খামকা কথা বলছি?'

'না, না, না।' প্রতিবাদের সুর তুললাম, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। 'তা তো বটেই। তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, সাধ, রুচি—সব।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছিলাম, ধান-দূর্বা-বেলপাতাও খাবে না সে—ফুলকাচ ডাব-পেয়ারাও খাবে না। আমি যখনই বীচ-এ আসি, পকেটে করে মাছভাজা, সিঙ্গাড়া, রুটি, কেক্, ডিমের বড়া নিয়ে আসি।' চুপ করল মামা। এবার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় বলে ভাল লাগে। কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবছিল মানুষটা। বালু পার হয়ে দুজন আস্তে আস্তে শক্ত উঁচু তীরের দিকে এগোই। আমিই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাত হলে

হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিরুক্তি না করে মামা উঠে আসতে রাজী হয়। অথবা গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে এবং আমাকে সেটা বলতে হবে ভেবে যেন চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আর ঢেউয়ের শব্দ পিছনে রেখে রাস্তার আলোর কাছে এসে গেছি যখন, মামা বলল, 'ওই আমার নেশা, সমুদ্রকে খাওয়ানো! ওরা ধান-দূর্বা-ফুল-বেলপাতা দেয় বলে আমি ওদের মূর্খ বলি, পাগল বলি—উল্টে আমাকে ওরা বলতে ছাড়ে না, হুঁ, আমি বাজে—সৃষ্টি-ছাড়া মানুষ; পাজী, বদমায়েশ—কেউ কেউ বলে।'

'কেন, আপনি তো—' হঠাৎ কি বলতে থেমে গেলাম।

আশ্চর্য অনুভবশক্তি লোকটার। আমার চোখে চোখ রেখে হাসল। আলো-অন্ধকারে কপালের ভাঁজগুলি খরতর হয়ে ফুটে উঠছিল। 'ঠিক বলেছেন, কারও তো অনিষ্ট করিনি—নিজের খেয়াল নিয়ে নিজে চলি। কিন্তু কি করবেন মশাই, মানুষ তাতেও আপনাকে রেহাই দেবে না। ঠিকই বলেছেন। আমার ভাগ্নে বীরেন—আজ সে অনেক পয়সার মালিক, আর সেই গরমে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবহেলা; হুঁ, আমার ওপর সে চটে আছে। কেন জানেন? জানেন না?'

'কাল শুনব।'

'আরে মশাই, এ কি সমুদ্রের গর্জন—আজ, কাল, পরশু, সারাজীবন শুনলেও শেষ হবে না! আমার কথা একটুখানি—ওই বলতে বলতে ফুরিয়ে যাবে—শুনুন। কলকাতা থেকে অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা কিনে এনেছিল বীরেন—কত আদর-যত্ন পয়সা খরচ কুকুরের জন্য। হঠাৎ বাচ্চাটা একদিন হারিয়ে গেল। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হল, পাওয়া গেল না। এখন বীরেন সন্দেহ করছে আমাকে—হুঁ, তার মামাকে।'

'কেন? আপনি কুকুর দিয়ে কি করবেন?'

'আর কি!' ঘিনঘিনে নাকের হাসিটা আবার কানের কাছে, মুখের কাছে ছড়িয়ে দিল লোকটা : 'ওই ওখানে দিয়ে দিয়েছি।' গর্জমান অন্ধকার সমুদ্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে মামা শেষ করল : 'বীরেন আমাকে দিয়ে বিশ্রী সন্দেহটা করছে—আজ চার বছর—অথচ সে জানে, ভাল করে জানে, মাছটা ডিমটা রুটি-কেকটা ছাড়া অন্য কিছু আমি কোনদিন ওকে খেতে দিইনি। আচ্ছা, চলি মশাই—কথায় কথায় অনেক রাত হল।'

আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে, একটা কিছু আমার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে পেরেছিল লোকটা। আবার সারারাত জেগে কাটালাম। বাইরে অন্ধকার বালুর ওপারের শব্দের ঝড় যত না শুনেছি, লোভী নিষ্ঠুর অতৃপ্ত অশান্ত ঢেউয়ের দাঁতালো ভয়ংকর চেহারা যত না দেখেছি, তার চেয়ে আমি বেশী দেখেছি আমার বিছানা—কুকুরের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা

একটা নরম তুলতুলে শরীর। আলোটা জ্বলছিল। ইচ্ছা করে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তা নিয়েও অবশ্য রাগারাগি হয়ে গেছে। আমি আমার ভাতের থালা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। হেনার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল ও। মন্দির দেখতে বিস্তর হাঁটতে হয়েছিল।

'ক্লান্ত।'

'তুমি খেয়ে নাও।'

'তুমি ?'

বিরক্ত হয়ে হাত তুলে তাকে চুপ করতে বলেছিলাম। যেন কথা বললে আমার বাইরের সোঁ সোঁ শব্দ শোনার ব্যাঘাত হবে।

হাসছিল ও। 'রাত বারোটা পর্যন্ত বীচ্-এ কাটিয়ে এসে এখনও তোমার জানালায় দাঁড়িয়ে জল দেখতে হবে, ঢেউয়ের গর্জন শুনতে হবে! উঃ, আমার তো এক দিনেই ক্লান্তি লাগছে! জল কত দেখা যায়—ওই একঘেয়ে শব্দ কত শোনা যায়!'

'চুপ, চুপ। তুমি খেয়ে নাও।'

অগত্যা ও খেয়ে নিয়েছিল। খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। আলোর জন্য চোখ বুজতে কষ্ট হচ্ছিল, টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার তখনও খাওয়া হয়নি, ঘর অন্ধকার করতে বলতে পারে না। ওর একটা পা বিছানার ওপর টান করে ছড়িয়ে দেওয়া। আর একটা পা তুলে রেখেছিল। সায়ার লেস্ হাঁটুর কাছে উঠে গিয়েছিল। হাঁটুটা একটু একটু করে আন্দোলিত করছিল ও, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর ডুমটা দেখছিল, আমাকে দেখছিল। হাঁটু তুলে রাখার দরুন পায়ের নরম মাংসল ডিমের ছবিটা আমার চোখে পড়েছে, দুবার চোখে পড়েছে; ছি, তখন থেকেই আমার মাথাটা গরম হচ্ছিল! আমার মগজের ভিতর সমুদ্র ফুঁসে মরছে, সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁতের হাঁ নিয়ে অসংখ্য ঢেউ ছুটে আসছে, আর সাদা ধবধবে সায়ার নীচে হেনার পায়ের নরম মাংস কাঁপছিল। আর ঠিক তখনই কিনা ও হাই তুলে ঘুমের ছোপ-লাগা লালচে চোখ দুটো করুণ করে আমার দিকে মেলে ধরে বলছিল, 'ওই বাজে লোকটার সঙ্গে মিশে মিশে তোমার এমন হয়েছে—জলের নেশা ধরে গেছে।'

উত্তর করিনি। মহৎকে ভালবাসতে, বিরাটের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিতে সংযম অভ্যাসের দরকার, যেন চিন্তা করছিলাম; তাই হেনার কথায় কান দেব না বলে চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ও চুপ থাকেনি, আবার কথা বলছিল। ঘুমের জলে ভিজে-ওঠা ভার ভার কথা—'ভয়ংকর নিষ্ঠুর ওই মামা লোকটা। পাশের ঘরের মহিলা বলছিলেন, ওর সঙ্গে আপনার কর্তাকে মিশতে দিচ্ছেন কেন?'

আমার সংযম আর রইল না। পাশের কামরার মহিলার সঙ্গে হেনা মন্দির দেখতে গিয়েছিল, মনে পড়ল।

'তোমার ঘুম পেয়েছে তাই আবোল-তাবোল বকছ, আমি খেয়ে আলো নিবিয়ে তোমার পাশে শুয়ে পড়ি তাই চাইছ।'

ধমক দিয়ে উঠেছিলাম। লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলাম।

'কেন, নিষ্ঠুর কেন? কি করেছে ও?' ছুটে বিছানার কাছে চলে গেছি। ধমক খেয়ে, আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে ছিল ও। নাকি সমুদ্র-পাগল সৃষ্টি-ছাড়া লোকটার নিষ্ঠুরতার কথা আমার কানে তুলতে নেই, পাশের ঘরের মহিলার সেরকম কিছু নির্দেশ ছিল? কথাটা পরে চিন্তা করেছি। হেনা আর চোখের পাতা খুলছিল না। আমি রাগ করে ভাতের থালা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলেছি। আলোটা তেমনি জ্বলছিল। গজগজ করছিলাম : 'এটা কলকাতার বাসা না—সকাল সকাল খেলাম আর ঘর অন্ধকার করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তবে আর বাইরে বেড়াতে আসা কেন?' শেষের কথাটা নরম গলায় বলেছিলাম। কিন্তু বেচারা আর চোখ খোলেনি। তাই চাইছিলাম। আলো জ্বলছিল। জানালার বাইরে অন্ধকার সমুদ্র গোঁ গোঁ করছিল। আমার মাথায় তখন একটা কুকুরছানা, নরম মাংস। আমি পরিষ্কার দেখছিলাম, হোটেল থেকে ওটাকে চুরি করে নিয়ে বীরেনবাবুর মামা সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। অট্টহাস্য করে সকলের বড় ঢেউটা ছুটে এসে ওটাকে তুলে নিয়ে গেল। তাই বলছিলাম, রোগা মানুষটা আমার রক্তের মধ্যে কি যেন সংক্রামিত করে দিয়েছিল; না হলে বাইরের উন্মত্ত অশান্ত গর্জন শুনতে শুনতে নেশাতুরের মতো আমি একসময় বিছানার কাছে সরে যাব কেন? হেনার পায়ের নরম মাংসল ডিমটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম, যেন কতটা নরম নখ বসিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, ঘুমের মধ্যেই যন্ত্রণায় ও 'উঃ' করে উঠেছিল, তখনই হাত সরিয়ে এনেছি যদিও।

পরদিন খুব সকালে উঠে হেনা কোন্ এক সাধুবাবার আশ্রম দেখতে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত পাশের ঘরের মহিলাও সঙ্গে গেল। মনটা হাল্কা লাগছিল। রাত্রির ওই ঘটনার পর কেমন করে ও আমার দিকে তাকাত, আমি ওর দিকে তাকাতাম—সেই সমস্যা ভোরের নরম আলোয় ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল। ঘরের দিক থেকে মন হাল্কা লাগছিল, কিন্তু বাইরের ছবি দেখে মন ভার হয়ে রইল। আকাশের চেহারা মেঘে মেঘে মন্থর বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমুদ্রের রঙেরও পরিবর্তন নেই। কোথায় সেই সবুজ ছোপ, নীল নয়নাভিরাম ময়ূরকণ্ঠী রং, রুপালী ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল জাফরান ছটা! দূরের জল কাছের জল এক রং—ছাই রং। যেন

সেইজন্যই সমুদ্রকে আরও ভয়ংকর লাগছিল। হাসি-উচ্ছ্বাসের বালাই নেই—কেবল ক্রোধ, কেবল গর্জন-আলোড়ন ছাড়া আর কিছু জানে না সে। কিন্তু আমার মন আরও খারাপ লাগছিল লোকটাকে একবারও কোথাও দেখতে পেলাম না বলে। নাকি সমুদ্র যেদিন এই চেহারা ধরে, সেদিন মামা তার ধারে-কাছে থাকে না—কেবল রৌদ্রের দিনে মুহুর্মুহু রং ফেরার রহস্য বলতে, কি রাত্রির অন্ধকারের হিংস্র উন্মত্ত কোলাহলের অর্থ খুঁজে বার করতে তার উৎসাহ? কোথায় গেল! বালুর ওপর অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। একবার পূর্বে-পশ্চিমে অনেক দূর হেঁটে গেলাম। কেউ নেই। সমুদ্র আজ মেজাজ খারাপ করে আছে দেখে স্নান করবে দূরে থাক মানুষ যেন জলের কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাচ্ছে না—একটি দুটি মুখ দেখা গেল, ঢেউ-য়ের অবস্থা দেখে দূরে থেকেই তারা বিদায় নিয়েছে। মাছ ধরতে জেলেরা আসেনি। মামাকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে একসময় সেই চায়ের দোকানে ফিরে এলাম। না, সেখানে নেই। আজ চা খেতেই আসেনি বীরেনবাবুর মামা। 'হয়তো রাত্রে খুব টেনেছিল, এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।' চা তৈরি করতে করতে নীলাম্বর বলছিল, 'নেহাত মামা—তাই পারছে না, না হলে কবে বাবু জুতো-পেটা করে বেটাকে তাড়িয়ে দিত।' কান ছিল না তার কথায়; উদাস শূন্য চোখে বিবর্ণ ঢেউগুলির মাতামাতি দেখছিলাম। আমার পাশে একটা লোক নেই—কানের কাছে মুখ এনে অ্যাসিডে খাওয়া ময়লা দাঁত বের করে কথা বলছে না। তাই সমুদ্রকে অপরিচিত ঠেকছিল, দুর্বোধ ঠেকছিল। দু-দিনেই মানুষটা আমাকে সমুদ্রের কত কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একটা সকালের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। যেন আর পাঁচজনের চোখ দিয়ে আমি জল দেখছি, জলের একঘেয়ে শব্দ শুনছি। যেন আর একটা বেলার মধ্যেই আমি হেনার মতো 'বোরিং' বলে সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব। হয়তো আর যে ক'দিন আছি, বীচ্-এ বেড়ানোর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে মঠ মন্দির আশ্রম দেখব। মুখের ভিতরটা তেতো তেতো ঠেকছিল। দূরের ধূসর রেখাটা ক্রমে কালো হয়ে আসছে। গুরগুর শব্দটা গভীর—মন্থরতর হয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, ওপরের মেঘ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। ঝড় উঠল কি? কিন্তু বললে কেউ বিশ্বাস করত না, আমি চায়ের দোকানের বেঞ্চির ওপর বসে তখন ঢুলছিলাম।

কতক্ষণ এভাবে বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম কে জানে; বোধ করি নীলাম্বরের পেয়ালা-পিরিচ ধোয়ার শব্দে একসময় ধড়মড় করে জেগে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম, আর তখন চোখের পাতা টান টান করে মেলে ধরে দৃষ্টি তীক্ষ্ম করে আমি বাইরেটা দেখলাম; স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল; এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে, হাওয়ায় সব ঝেঁটিয়ে কোনদিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে—একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর, সমুদ্রের ওপর, আর সেই পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা রঙের রৌদ্র। আর সেই রোদ শুষে নিতে, লুঠ করে নিতে ঢেউদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে ; তারা কলরব করছে, ছুটছে ; ঠেলা-ঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে রুপার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল ; যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে বলে নীল পেয়ালা থেকে চুঁইয়ে-পড়া সবটুকু আলো শুষে নিতে পেরে ওধারের জল শান্ত গম্ভীর হয়ে আছে।

এখন হয়তো মামাকে দেখতে পাব। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বালুর ঢালু বেয়ে খানিকটা ছুটে আর এগোতে পারলাম না, পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিজের চোখ দুটোকে আবার যেন বিশ্বাস করতে বাধছে; ওপরে রৌদ্র-গাঢ় স্তব্ধ আকাশ, সামনে ফেনশীর্ষ লক্ষ লক্ষ ঢেউ, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে উত্তপ্ত প্রখর ঝকঝকে বালুরাশি—আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না ; কেবল একজন—একটি মূর্তি। বেণীটা দুলছে, শরতের এক টুকরো সাদা মেঘ হয়ে আঁচলটা উড়ছে। কি, একবার আমার মনে হল—সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগ্ন নির্জন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না—মানানো উচিত না।

হেনা খিলখিল করে হাসছে। এত বড় একটা ফেনার ঝলক ওর পায়ের কাছে ছুটে আসে; আলতা-পরা পায়ের পাতা ভিজে যায়। যেন ইচ্ছা করে ফেনার দুধে ও পা ডুবিয়ে রাখছে। কাল তা করেনি, পারেনি, সাহস পায়নি—ঢেউ ছুটে আসার আগে ও ছুটে পালিয়ে এসেছে, ভ্রূকুটি করেছে সমুদ্রকে, ঢেউ সরে যেতে ঝিনুক কুড়িয়েছে। আজ অন্যরকম। ঝিনুক কুড়োতে মন নেই, জলের স্পর্শে ওর বুঝি রোমাঞ্চ জাগছে: অসহ্য পুলকে হেনা হাসছে। ভাল লাগল দেখে। আমার মনে পড়ে না, প্রথম রাত্রে আমার স্পর্শ—পুরুষ-স্পর্শ এত আনন্দ দিতে পেরেছিল তাকে। সায়া-শাড়ি কুঁচকে দলা করে হাঁটুর কাছে তুলে ধরেছে ও। নিটোল সুবলিত সোনার রঙের পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে পড়ে না, এখন, বালির বিছানায়, ঢেউয়ের মুখে ওর পা দুটো যেমন সুকুমার লোভনীয় চেহারা ধরেছে, আমা-দের ঘরের বিছানায় তার হাজার ভাগের এক ভাগ সুশ্রী লাবণ্যযুক্ত মনে হয়েছে কোনদিন। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে

আঙুলের ডগা পর্যন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার আশ্চর্য রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।

'আর একটু—আর এক পা এগিয়ে যাও।'

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতে ও ফিক করে হাসল। 'ভয় করে।'

'আমি আছি, ভয় কি?'

'তুমি আমার হাত ধর।'

আমি ওর হাত ধরলাম।

'ইস, কত বড় ঢেউ!' ভয়ে চোখ বোজে ও।

'ঢেউ এখানে আসছে নাকি?' ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিই। মুঠো আলগা করি না যদিও, কেননা আঁকশির মতো বাঁকানো শক্ত আঙুলগুলি দিয়ে আমি বারবার ওর বাহু ও গ্রীবার নরম মসৃণ মাংস অনুভব করছিলাম, অনুভব করতে ভাল লাগছিল। বালুর শেষ প্রান্তে চলে গেছি আমরা। আমাদের সামনে ধু ধু সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই; সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে ঢেউ, পিছনে আর একটা, আর একটা—

'এই, করছ কি!' ভয়ে আঁতকে ওঠে ও, যেন হৃদ্‌পিণ্ডের ধাক্কা আমার হাতে এসে লাগে।

'একেবারে ছেলেমানুষ!' নরম গলায় ধমক দিলাম, 'আমি তো ধরে রয়েছি, ভয় কি—'

'না, না।' যেন হেনার হঠাৎ কি মনে পড়ে, বিদ্যুতের মতো শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ায়, আমার চোখ দেখে, তারপর বুঝি আমার পিছনের বালুর দিকে চোখ পড়তে ও রীতিমতো আর্তনাদ করে ওঠে : 'যা ভেবেছি তাই! ওই তো শয়তান দাঁড়িয়ে হাসছে—ওর পরামর্শ শুনে তুমি এমন কাজ করতে চাইছ—'

'কিরকম?' অস্ফুট ভয়ের গলায় বলতে গেছি, তার আগেই হাতের মুঠো ছাড়িয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে হেনা ওপরে উঠে গেল। এবার আমি ঘুরে দাঁড়াই। হেনা কাঁপছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ, যেন চোখে জল এসে গেল। আর তখন লক্ষ করলাম, কালো রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন চেহারার সেই মানুষটা—বীরেনবাবুর মামা—হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমাদের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেখে সে হেসেছিল কি? জানি না। দেখলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধা এক তাল কাঁকড়ার মতো কি যেন হাতে ঝুলিয়ে লোকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে।

মনে আছে, সেই সন্ধ্যায় ট্রেন যখন সাক্ষীগোপাল স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তখন আমি স্বাভাবিক হতে পেরেছিলাম, সহজ হতে পেরেছিলাম। হেনার

হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি আমায় বলতে পারতে, জানিয়ে দিতে পারতে, লোকটা এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর—স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল!'

হেনা হঠাৎ উত্তর করল না, জানালার বাইরে অন্ধকার দেখল, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল : 'বলিনি—বলতে ভয় করছিল—কি জানি, যদি ওর রোগের ছোঁয়াচ তোমাকে পেয়ে বসে!' একটু থেমে পরে ও বলল, 'সমুদ্র দেখে এমন পাগল হয়ে উঠেছিলে!'

চুপ থেকে জানালার বাইরে চোখ রাখলাম। অস্বীকার করব কেমন করে? সত্যি কি আমার মধ্যে একটা কিছুর সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল না? আর ঢেউয়ের গর্জন নেই। ঝিঁঝি ডাকছিল। ঝিঁঝির ডাক ও নারিকেল পাতার মৃদু মর্মর শুনতে শুনতে নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

মা ৎ সু মো তো

প্রতিভা বসু

প্রথম দেখাতেই জাপানী মেয়ে মাৎসুমোতো আমাকে ভালোবাসলো, বাঁ হাতের কড়ে আঙুল বাড়িয়ে আমার ডান হাতের কড়ে আঙুল জড়িয়ে ভরা গলায় বললো, 'বন্ধু হলাম।' তার এই আবেগের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, অপ্রত্যাশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'এই বন্ধুতা আমি চিরদিন মনে রাখবো।' এর পরে মাৎসুমোতো আমার দুই গালে দুবার চুমু খেলো। তার অসম্ভব নরম হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

দেখা হয়েছিলো এক ভোজসভায়—ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা সেই ভোজের আয়োজন করেছিলেন, বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন তাঁরা। কিছু জাপানী ছাত্রছাত্রীও ছিলো সেখানে, এই মাৎসুমোতো তাদেরই একজন। বয়স্ক ছাত্রী, মাঝে অনেক দিন বাদ দিয়ে আবার ভর্তি হয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিনী হবার জন্য। সম্পূর্ণ জাপানী প্রথায় আদর-অভ্যর্থনা এবং খাদ্য-পানীয় শেষ হতে সেদিন রাত হয়েছিলো। হোটেলে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বেজে গেলো। যে গাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন ওঁরা, মাৎসুমোতোও সেই গাড়িতে ছিলো। সে সব সময় আমার হাত ধরে বসে ছিলো, কিছু কৌতুক আর কিছু ভালোবাসা মেশানো দৃষ্টিতে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। বিদায় নেবার সময় এতোখানি নিচু হলো, নরম হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে দিয়ে বললো, 'কাল তোমাদের কখন পাবো?'

আমি হিসেব করে বললুম, 'সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কেবল এখানে আর ওখানে—তারপরে ছুটি। তুমি আসবে?'

'সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করলুম।'

'খুব ভালো কথা। তা হলে আটটার পরে এসো।'

'আটটা পনেরোতে আসবো।'

আমাদের পৌঁছে দিতে চারজন অধ্যাপক এসেছিলেন, একে একে প্রথামতো সকলেই বিদায় নিলেন, মাৎসুমোতো গাড়িতে উঠে মুখ বাড়িয়ে ঘাড় কাত করলো।

পরের দিন কাঁটায়-কাঁটায় আটটা পনেরোতেই এলো সে। শুধু-হাতে

নয়, উপহার নিয়ে এসেছে। একটি অতি উৎকৃষ্ট ব্রোকেডের ব্যাগ, একগুচ্ছ চেরী, আর এক বাক্স মিষ্টি। আমি বললুম, 'এসব কি?'

মাৎসুমোতো বললে, 'ভালোবাসা।'

'ভালোবাসার চেহারা যে এরকম, আমি তা জানতুম না।'

'তোমাকে দেখার আগে আমিই কি জানতুম সে কথা? আমার যে তোমার জন্য কতো কিছু আনতে ইচ্ছে করছিলো, তা তো তুমি জানো না! কিন্তু তোমাকে আমি আরো একটা জিনিস দেবো।' এই বলে কালো কুচকুচে একটি কলম আমার হাতে গুঁজে দিলো। বললো, 'এটা আমার নিজের কলম। আমার নাম খোদাই আছে এতে। আমি জানি, পথের দেখা এই ক্ষণিকের বন্ধুকে যদি বা কখনো ভোলো, কলমটি দেখলেই মনে পড়ে যাবে। নামটা পড়ে নিতে পারবে। আমার ডাকনাম মাসু।'

আমি বললাম, 'মাসু, তোমাকে আমি কখনো ভুলবো না, আমার এই দীর্ঘজীবনে এমন সুন্দর বন্ধুতা আর কখনো আমি পাইনি, এমন পবিত্র ব্যবহার আমি কখনো দেখিনি।'

মাসু বললো, 'ভারতীয় মেয়েরা অতুলনীয়।'

আমি বললাম, 'জাপানী মেয়েরা স্বর্গীয়।'

এর পরে আমি আর মাসু রাত এগারোটা পর্যন্ত কতো কি যে গল্প করেছিলাম, মনে নেই। মাসু ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে কথা বলছিলো, মাঝে মাঝে-আটকে গেলে ছোট্ট একটি ডিক্‌শনারি খুলে দেখে নিচ্ছিলো বিশেষ শব্দটি। বিদায়ের সময় মাসু পরের দিন কখন দেখা হবে জিজ্ঞেস করলো।

পবেব দিনও সারাদিন এখানে-ওখানে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের পালা ছিলো। ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেলো না। খুব বিমর্ষ হলো সে। সুদূর ভারতবর্ষের এক কোণের এক বাংলা দেশের একটি নিতান্ত আটপৌবে মেয়ের জন্য তার এই কাতরতা দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম। মাত্র দশ দিনের জন্য এ-দেশে এসেছি আমরা, আমার স্বামীকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন, আমি এসেছি সঙ্গে। চলেছি অবশ্য বহুদূরের পাল্লায়, এটি পথের নিমন্ত্রণ। বরং ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে ছেড়ে কেমন করে দিন কাটাবো তাই ভাবছিলাম, এই মমতায় আমার প্রায় চোখে জল এলো। সেই রাত্রে কিয়োটো হোটেলের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হলাম।

বলাই বাহুল্য, যে ক'দিন ছিলাম, যেমন করে হোক কোনো না কোনো সময়ে আমি আর মাসু একসঙ্গে হয়েছি। কখনো কিয়োটোর মন্দিরের মতো পরিচ্ছন্ন রাস্তায় দু পাশের নুয়ে-পড়া চেরীগাছের ফুলে-ভরা ডালের তলা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গল্প করেছি; কখনো কিয়োটো হোটেলের অগণিত,

নানাবিধ চেহারার ইন্দ্রপুরীতুল্য বসবার ঘরে বসে সময় কাটিয়েছি; কখনো কোনো পুরোনো জাপানী সরাইখানার অভ্যন্তরে টেম্পুরা খেতে খেতে আড্ডা জমিয়েছি।

মাসু ধনীলোকের মেয়ে। তার বাবা কিমোনো-ব্যবসায়ী। কিয়োটো এবং টোকিয়ো শহরে তাদের দুটি বিখ্যাত কিমোনোর দোকান আছে। টোকিয়োর দোকান মাসুর বাবা দেখাশোনা করেন, কিয়োটোর দোকানে বসেন মাসু আর মাসুর মা। এখনকার জাপানী মেয়েরা জাপানীর চেয়ে আমেরিকান বেশী; তারা চুল ছেঁটে ফেলেছে, আঁটো ফ্রক ধরেছে, মুখে ইংরিজী বুলির খই ফুটছে। কিন্তু মাসুর পোশাক তেমনি পা ঢাকা, পিঠে ওবি বাঁধা, ভারি কালো চুলের উঁচু খোঁপায় মুক্তোর লম্বা কাঁটা বসানো। গায়ের রং শাঁখের মতো সাদা, মসৃণ, মুখের লাবণ্য জোয়ারের মতো, যখন ফুলো ফুলো চেরা চোখে তাকিয়ে হাসে শিশুর চেয়েও পবিত্র দেখায়। মাসুর বয়স সাতাশ, কিন্তু এখনো অবিবাহিত।

আমি বললুম, 'বিয়ে করবে না?'

মাসু বললো, 'না।'

'কেন?'

'অনেক বাধা আছে।'

'কিসের বাধা? তুমি এতো সুন্দর, এতো ভালো, বিয়ে না করলে কতোগুলো লোক বঞ্চিত হবে। তোমার মতো স্ত্রী, তোমার মতো মা—'

মাসু এইখানে থামিয়ে দিলো আমাকে। চোখ নিচু করে বললো, 'অন্য কথা বলো।'

আমিও চুপ করে গেলাম; ভাবলাম, সত্যিই তো, এসব ব্যক্তিগত কথায় আমার দরকার কি!

কিন্তু মাসুই একটু পরে আবার কথাটা তুললো। বললো, 'জীবনে আমি দুটি মানুষকে ভালোবেসেছি। অবিশ্যি মা-বাবা বা আত্মীয়ের কথা ধরছি না এর মধ্যে। একজনকে প্রেম দিয়েছি, একজনকে বন্ধুতা দিয়েছি।'

বললাম, 'দুটোই খুব ভালো কথা। যাকে প্রেম দিয়েছ, সেও নিশ্চয়ই তোমাকে প্রেম দিয়েছে; আর বন্ধু তো বন্ধুতা দেবেই।'

Zen মঠের ফুলে-ভরা ঘাসে-ছাওয়া মাঠে বসে আমরা কথা বলছিলাম। মাসু এক মুঠো দূর্বা হাতে তুলে নিলো, ঘ্রাণ শুঁকলো, চুপ করে থেকে সজল চোখে তাকিয়ে বললো, 'কিন্তু দুটোই আমার ব্যর্থ হয়েছে।'

'ব্যর্থ হয়েছে? কেন?'

'যাকে প্রেম দিয়েছি, সে প্রেম দিয়েছে অন্যকে; যাকে বন্ধুতা দিয়েছি, সে প্রেম দিয়েছে আমাকে।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'তুমি বিদেশিনী, তবু আমি আজ তোমাকেই আমার মনের কথা বলবো। তুমি ভারতীয়, তুমি নিশ্চয়ই আমার দুঃখ বুঝবে। কিন্তু একটাই শুধু ভয়, তুমি লেখো।'

'সেটা কি ভয়ের?'

'ভয়ের বইকি! যদি লিখে ফেলো!'

'ক্ষতি কি?'

'ছি, ছি—সবাই জেনে যাবে।'

'আমি বাংলা ভাষায় লিখি, তোমার কোনো ভয় করবার কারণ নেই।'

মাসু হাসলো। মাসুকে যে দেখেনি তাকে বোঝানো যাবে না, সে হাসি কতো মধুর। বললো, 'তা লিখলেই বা কি হয়! লেখারই বিষয়। আমার জীবন বড়ো অদ্ভুত, বড়ো বেদনাময়।' হাতের ঘড়ি দেখলো, 'আরো ঘণ্টা দুই আমরা একসঙ্গে আছি, তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলি। মনের ভার আর আমি না নামিয়ে পারছি না। বিশেষ করে আজ কয়েকদিন যাবৎ বড়ো বেশী অশান্তি যাচ্ছে। মজাটা কি জানো, ঈশ্বর সত্যি করুণাময়' আমার এই প্রচণ্ড অশান্তির সময়ে কেমন তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচতাম না।'

আমি অভিভূত হয়ে বললাম. 'মাসু. তুমি সত্যি আমাকে এতো বন্ধু ভাবো?'

তেরচা চোখে তাকালো মাসু, 'ভাবি না! তোমাকে প্রথম দেখেই তো আমি বুঝেছিলাম, যে মনের সঙ্গে আমি মন মেলাতে পারি. সে হচ্ছে এই। কিন্তু কি দুঃখ ভাবো, দুজন আমবা দুই দেশের। হয়তো জীবনে আর কোনোদিন তোমাকে আমি দেখবো না।'

'ও কথা ব'লো না। আমি তোমাকে মস্ত মস্ত চিঠি লিখবো, তুমি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে আসবে।'

মাসু তার হাতের মুঠোয় আমাব হাত তুলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আমিও একটু সময় চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, 'কি বলবে বলছিলে!'

'হ্যাঁ, বলবো।' এই বলে কোনো ভূমিকা না করে মাসু আমাকে যে গল্পটা বললো তা এই—

মাসুর বাবার এক বন্ধু আছেন, তিনি কিয়োটোর সবচেয়ে বড়ো

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের স্বত্বাধিকারী। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার একটি ছেলের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকেই মাসুর বিয়ের ঠিক ছিলো। ছেলেটি চমৎকার, যেমন বিদ্যাবুদ্ধি সততা, তেমনি দেখতে সুন্দর। আশৈশব একসঙ্গে খেলাধুলা মেলামেশা করে বড়ো হয়ে উঠেছে দুজন, দুই পরিবার পাশাপাশি থাকতে থাকতে আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে। বিয়ের কথাটা মাসু বা ছেলেটি অনেকদিন পর্যন্ত জানতো না, জানবার আগেই ছেলেটি একদিন তাকে প্রেম নিবেদন করলো। ছেলেটির নাম তোসিও হায়াসি। বাড়ির পিছন দিকের বাগান-ঘেরা একটি চাতালে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো তারা। সেই বছর তাদের বাগানে অজস্র ফুল ফুটেছিলো। অজস্র প্রজাপতি এসেছিলো। তোসিও সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার হৃদয় আজ এই বাগানের মতোই উদ্ভাসিত, রক্ত-কণিকারা এই প্রজাপতির মতোই অস্থির চঞ্চল। মাসু, আমার মাসু, তুমি আমাকে ভালোবাসো তো?'

তোসিও মাসুর চিরদিনের বন্ধু, তোসিওকে সে কি আজ ভালোবাসে? জ্ঞান হয়ে থেকেই তো সে কথা সে জানে। তোসিওর জন্য সে কি না করতে পারে! কিন্তু তোসিওর কথা শুনে, তোসিওর গভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সেদিন সে অনুভব করলো, ভালোবাসার অনেক ধরন আছে, সব ধরন সকলের সঙ্গে আসে না। তোসিও তার কাছে আজ যে ভালোবাসার আবেদন জানাচ্ছে, সে ভালোবাসা মাসুর অন্তরে জন্ম নেয়নি। প্রথমটায় মাসু হাসবে ভেবেছিলো, পরে ওর কান্না পেলো। চুপ করে থেকে বললো, 'আমাদের দেশে ভালোবাসার বিয়ে প্রচলিত নেই, তা কি তুমি জানো না? গুরুজনরা এই ভালোবাসার কথা জেনে ফেললে আর কি আমরা দেখা করতে পারবো?'

তোসিও বললো, 'গুরুজনদের এখানে টেনে এনো না, এখানে তাঁদের জায়গা নেই, এখানে তুমি আর আমি। তুমি তোমার মনের কথা বলো।'

মাসু ভেবে পেলো না, কি বলবে। মুখের দিকে প্রত্যাশা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোসিও বললো, 'বুঝতে পেরেছি, জবাব দিতে পারছো না তুমি, এবং সেটা লজ্জার জন্য নয়, আসলে নিজের মনের কথা তোমার জানা নেই বলে। ঠিক আছে, আমি আবার কাল দেখা করবো তোমার সঙ্গে। এবার যাবার আগে তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শুনে যাবো আমি।'

তোসিও পড়াশুনো করতো নিউইয়র্কে। বড়োলোকের ছেলেরা তাই করে এখানে। সেটা তাদের আভিজাত্যের লক্ষণ, তাদের ফ্যাশান। ছুটিতে ছুটিতে আসে। এই দ্বিতীয় ছুটিতে এসেছে সে, দূরে গিয়েই হৃদয়ের এই ভাবটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে যেবার প্রথম গিয়েছিলো, কেঁদে ভাসিয়েছিলো মাসু, মাসুর সব খালি হয়ে গিয়েছিলো। তোসিও যে তার

আবাল্য বন্ধু! তোসিওকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন করে? আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। অন্য বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে সেই অভাববোধ কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু তোসিওর যায়নি, কি করে যাবে? মাসুর মতো বন্ধু তো সে একজনের বেশী দুজনকে পেতে পারে না! দুজনকে চাইতে পারে না! সে ভাব তার আর কারো সঙ্গে আসবেই না হৃদয়ে! মাসুর জায়গা শুধু মাসুর জন্যই, তার প্রাণমন মাসুতেই ভরা।

সেই রাত্রে মাসু ঘুমুতে পারলো না। সারারাত এ-পাশ ও-পাশ করে কাটিয়ে দিলো। পরের দিন যখন দেখা হবার সময় হলো, ভয় করতে লাগলো। তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নিয়েই চিরদিন যার সঙ্গে দেখা করতে অভ্যস্ত, সে মানুষ সেদিন তার ভয়ের কারণ হয়ে উঠলো বলে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগলো। একটা দুর্বোধ্য কষ্টে অশান্ত হয়ে পড়লো। ভেবে-চিন্তে একটা চিঠি লিখলো সে। লিখলো, 'তুমি আমার কাছে যে প্রশ্নের জবাব চেয়েছো, সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হচ্ছে না। এর একটা পরিণতি আছে, সে পরিণতিটা আমি কিছুতেই মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পেরে কেবলই বিধ্বস্ত হচ্ছি। আমাকে সময় দাও।'

চিঠিটা সে দেখা করেই তোসিওর হাতে দিলো। এক পলকে পড়ে ফেলে তোসিও খানিকক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো, তারপর একটি কথা না বলে চলে গেলো।

মাসু পিছনে পিছনে গিয়ে বললো, 'রাগ করলে?'

তোসিও বললো, 'না।'

'কাল আসবে তো?'

'না।'

'কেন?'

'কাল চলে যাবো।'

'কোথায়?'

'যেখানে থাকি।'

'তোমার তো এখন ছুটি।'

'এখানে থাকার আর আমার কোনো অর্থ হয় না।'

মাসু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, 'এতোদিনের এতো ভালোবাসা কি ঐ একটা কথার উপরই নির্ভর করছিলো?'

তোসিও বললো, 'এতোদিন করছিলো না, এখন করছে।' এই বলে দ্রুত পায়ে ঘাস মাড়িয়ে একবারও ফিরে না তাকিয়ে নিজেদের আপেল-বাগিচার মধ্যে ঢুকে গেলো। পাশাপাশি কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে মাসু তাকিয়ে রইলো।

পরের দিন শোনা গেলো, বাবা-মা কারো কথা না শুনে তোসিও নিউইয়র্কে চলে গেছে।

মাসুর বয়স তখন একুশ, মন্দ বয়স নয়, মাসুর মা-বাবা এবার তার বিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। আর এই প্রথম মাসু জানলো, তোসিওর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তার। সে যে কি বলবে, কি করবে, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

যা সহজ, যা সুন্দর, যা উৎকৃষ্ট, সবই মাসুর কাছে উপস্থিত করেছিলেন বিধাতা—মাসুর বিড়ম্বিত ভাগ্য তা গ্রহণ করতে পারলো না। তোসিও তার স্বামী হবে, সন্তানের পিতা হবে—এ কথাটা ভাবতেই দাঁতে কাঁকর পড়লো তার। তবু বিয়ের আয়োজনে বাধা হলো না। মেয়ের মতামতের কথা কোনো বাপ-মা ভাবে না এ-দেশে, মাসুর বাপ-মাও ভাবলেন না।

টেলিগ্রাম পেয়ে তোসিও চলে এলো। এসে সব শুনে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'মাসু কি রাজী হয়েছে?'

তোসিওর বাবা মিস্টার হায়াসি আর মা মিসেস হায়াসি ছেলের কথা শুনে থ হতে হতেও হলেন না। তাঁদের ছেলে আমেরিকা-প্রবাসী, তার মতামত অন্যরকম তো হবেই! তাঁরা ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমার মতো সচ্চরিত্র, বিদ্বান এবং সুপুরুষ স্বামীর জন্য একজন মেয়ের যতো প্রার্থনা দরকার, মাসু ঠিক ততো প্রার্থনা করেছিলো কিনা জানি না, তবে পেয়ে যে সে বর্তে যাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তার মতামত নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

এ কথায় তোসিও শান্ত হলো না, বললো, 'আমি নিজে একবার ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

মিস্টার হায়াসি এবার দৃঢ় হয়ে বললেন, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?'

তোসিও বললো, 'জানি না। তবে বিয়ের আগে একবার ওর সঙ্গে আমি দেখা করবোই।'

'সেটা নিয়ম নয়।'

'যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলা করে বড়ো হয়ে উঠেছি, তার সঙ্গে দেখা করার মধ্যে কি এত নিয়মের প্রশ্ন থাকতে পারে?'

'সে এখন তোমার বন্ধু নয়, বাল্যসঙ্গী নয়, ভাবী স্ত্রী। বিয়ের আর দশ দিন বাকি, এই দশ দিন তোমাদের দেখাশুনো বন্ধ।'

মা-বাবার মুখের উপর কথা বলা অভ্যেস নেই তোসিওর, চুপ করে মাথা

নামিয়ে উঠে গেলো। কিন্তু সময়-সুযোগ বুঝে বাইরে থেকে মাসুর কলেজে ফোন করলো।

হঠাৎ তোসিওর গলা পেয়ে এতো ভালো লাগলো, বিয়ে-টিয়ে সব ভুলে ঠিক আগের মতো সরল আবেগে মাসু তাকে সম্ভাষণ করলো। তার উপরই রাগ করে তিন মাস আগে চলে গিয়েছিলো তোসিও। তিন মাস ধরে প্রতিদিন একবার-না-একবার তার কথা মাসুর মনে হয়েছে, তার হাসি মনে পড়েছে, তার কথা বলার ভঙ্গি মনে পড়েছে, তার দুষ্টুমি করে খেপানোর কথা মনে পড়েছে, তার সঙ্গটা যে কতো মধুর ছিলো সে কথা মনে করে মাসুর বিস্বাদ লেগেছে জগৎটা। তোসিওর মতো একজন বন্ধু সংসারে বিরল। সেই বন্ধুকে হারাবার ব্যথায় সে অতিশয় কাতর হয়েছিলো।

তোসিও বললো, 'কেমন আছো?'

মাসু ব্যাকুল গলায় বললো, 'তুমি কেমন আছো?'

ও-পিঠ থেকে একটু হাসলো তোসিও। 'এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, তরী বোধ হয় কূলে ভিড়লো। মাসু, মাঝনদীতে বড়ো তুফান—ভেবেছিলাম, তলিয়ে যাবো। তা হলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি! কিসের? ও—' এবার বুঝতে পেরে গম্ভীর হলো মাসু। বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠলো। তোসিওর ভালোবাসার স্রোত যেদিকে প্রবহমান, সেই স্রোতে মাসুর বন্ধুতো ভাসতে চায় না। তোসিও তার অবচেতন মনে বোধ হয় স্নেহময় ভাইয়ের আসন পেতে বসেছিলো. তা নইলে মাসুর মন এমন হবে কেন? কান্না পেয়ে গেলো মাসুর।

তোসিও বললো, 'কথা বলছো না কেন?'

'কি বলবো?'

'তুমি প্রস্তুত হয়েছো তো?'

'কি বিষয়ে?'

'বুঝতে পেরেও ভান করছো! আমি আমাদের বিয়ের কথা বলছি।'

সময় নিয়ে মাসু বললো, 'আমার প্রস্তুতির উপর কি কিছু নির্ভর করছে?'

'বিয়েটা যখন তোমার—'

'কিন্তু আমি একজন মেয়ে, আমার কথার মূল্য কি?'

অসহিষ্ণু হয়ে তোসিও বললো, 'বুঝেছি।'

'তোসিও।'

'আর কিছু বলবার দরকার নেই।'

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু এই অপরাধে তুমি আমাকে তোমার বন্ধুতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রো না।'

'মাসু, আমি যা পারি না তা আমি কেমন করে করবো! তুমি আমাকে মরে যেতে বলো, রাজী আছি; তুমি আমাকে একটা একটা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলতে বলো, হয়তো তাও আমি পারবো; কিন্তু হৃদয়-ভরা প্রেম নিয়ে নিছক বন্ধুতার ভান করে আর আমি তোমার কাছে দাঁড়াতে পারবো না। আমাকে বিদায় দাও।'

অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মাসু ডাকলো, 'তোসিও।'

তোসিও ফোন ছেড়ে দিলো।

আবার চলে গেলো তোসিও। হায়াসি দম্পতি ছেলের ব্যবহারে মর্মাহত হলেন। মাসুর মা-বাবাকে মাসু নিজের অমতের কথা জানিয়ে তোসিওর উপর তাঁদের আক্রোশ নিবারণ করলো। নিভৃতে তার মা তাকে বললেন, 'কেন, তোর কিসের আপত্তি?'

মাসু বললো, 'জানি না।'

মা বললেন, 'এমন স্বামী কি একজন মেয়ে ইচ্ছে করলেই পেতে পারে? তোসিওর মতো গুণবান, হৃদয়বান এবং ধনবান পাত্র আর আমি কোথায় পাবো?'

মাসু বললো, 'আমি কোনোদিন বিয়ে করবো না।'

সন্দেহ করে মা বললেন, 'তুই কি গোপনে আর কারো সঙ্গে মিশিস?'

'না।'

'তবে কেন ওকে ফিরিয়ে দিলি?'

'আমি ভাবতে পারি না, কিছুতেই ভাবতে পারি না মা।'

'ভাববার কি আছে এর মধ্যে!'

'আছে, অনেক আছে। ও আমার স্বামী হলে অনেক কিছু ভাববার আছে। আমি তো জানোয়ার নই যে, সব পারি! আর তোসিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ! আমি পারবো না মা, পারবো না।' খোলাখুলিভাবে এই কথা বলে মার কোলে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলো মাসু।

মাসুর মা মাসুর মনের এই অদ্ভুত ভাবের কোনো ব্যাখ্যা না পেলেও দুঃখটা বুঝলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েকে শান্ত হতে বললেন তিনি।

দিন চলতে লাগলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আট মাস পরে মাসুর বি এ পরীক্ষা হলো, পাস করে এম এ-তে ভর্তি হলো সে। এই ছ' মাসে তোসিও আর আসেনি। বি এ পাসের খবর আসার সাত দিন আগে মাসুর জন্মদিন ছিলো, মূল্যবান উপহার এলো একটি নিউইয়র্ক থেকে, প্রেরকের নাম না থাকলেও কে পাঠিয়েছে বুঝতে দেরি হলো না। আবার সাত দিন পরে পাস করা উপলক্ষে আর একটি উপহার এলো।

তার এক বছর পরে তোসিও দেশে এলো মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। কিন্তু সবাই বললো, তোসিওকে দেখে বোঝা যায় না, তার মায়ের অসুখ, না তার নিজের অসুখ। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলের কি হাল হয়েছে!

মিঃ হায়াসি ছেলেকে দেখে রাগ ভুলে বিমর্ষ হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?'

তোসিও মৃদু হেসে জবাব দিলো, 'না তো!'

'তবে এরকম চেহারা হয়েছে কেন?'

'কিরকম?'

'তোমাকে আমি ডাক্তার দেখাবো।'

'তুমি বৃথা চিন্তা করছো।'

'তোমাকে আমি আর ফিরে যেতে দেবো না।'

'আমার থিসিস কমপ্লিট করতে আরো এক বছর বাকি।'

'ছেড়ে দাও।'

'তা কখনো হয়?'

'খুব হয়। এ বছরটা তোমার বিশ্রাম দরকার।'

চুপ করে রইলো তোসিও।

মায়ের অসুখ সেরে গেলেও সত্যিই তার যাওয়া হলো না। কেবলমাত্র পিতার আদেশের জন্যই নয়—এক রাত্রে প্রবল জ্বর এলো তার। মাথার একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় সে মুহ্যমান হলো। আর সেই দুর্বল অবস্থায় তার মনের জোর রইলো না, অর্ধজাগ্রত বোধ নিয়ে সে মাসুকে খুঁজতে লাগলো। মিসেস হায়াসি নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে।

প্রাণমন ঢেলে সেবা করলো মাসু; শুধু তাই নয়, তোসিওর স্ত্রী হবার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করলো সে। মনকে বোঝালো, যে তোমার জন্য ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তোমার কিছু ঋণ আছে, এবং তা তোমার পরিশোধ করা দরকার। আর যার জন্য তোমার মনে এতো শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তাকে গ্রহণ করতে এই দ্বিধা তোমার মনের একটা ব্যাধি মাত্র।

তোসিও সাত মাস পরে সুস্থ হয়ে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে আবার চলে গেলো নিউইয়র্ক। কথা রইলো—মাসু এম এ পাস করলে, তার নিজের থিসিস শেষ হলে তারপর তারা বিয়ে করবে। এটা তাদের নিজেদের মধ্যে শর্ত হলো, বাপ-মায়েরা কিছু জানলেন না।

কাটলো কিছুদিন। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে মাসু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলো সেই সময়ে। মনে মনে ভেবেছিলো—বিয়ে করলেই, প্রেম হলেই এই শারীরিক শুচিতা কেটে গিয়ে শান্তি পাবে সে। কিন্তু প্রেমে পড়া যে সত্যি কি ভীষণ, এবং তার মধ্যে শরীরের প্রাধান্য

যে কতোখানি, সেটা সে প্রথম উপলব্ধি করলো এক জর্মান ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে।

ভদ্রলোক জরুরী সরকারী কাজে কিছুকালের জন্য জাপানে এসেছিলেন, আর জাপানে এলে জাপানী কিমোনো কেনে না এমন বিদেশী কেউ নেই। এক ছুটির দুপুরে, যখন একখানা বই হাতে নিয়ে সে তাদের বিশাল দোকানের একটি নির্জন কোণে উপন্যাসের সবচেয়ে জোরালো জায়গাটায় এসে পৌঁছেছে, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি এসে দাঁড়ালেন। ক্যাশিয়ার ছুটি নিয়েছে, টাকাটা মাসুকেই নিতে হবে। ভদ্রলোক গমগমে গলায় একটু অভিযোগ করলেন দোকানের লোকেরা তাঁর দিকে ভালো করে মনোযোগ দিচ্ছে না বলে। বই-টই রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো মাসু, নিজের অন্যমনস্কতার জন্য লজ্জিত হলো, মাথা নিচু করে অনেকবার ক্ষমা চাইলো, কিমোনোর দাম নিয়ে পঞ্চাশ-বার "আরিগাতো", "আরিগাতো" বলতে লাগলো। আরিগাতো মানে ধন্যবাদ। সব কথাতেই তাদের ধন্যবাদ বলা অভ্যেস। সেদিন তার মাত্রা ছাড়ালো। যাবার সময় ভদ্রলোক খুশী মনে বিদায় নিলেন।

তিন দিন পরে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে কলেজের পথে আবার দেখা হয়ে গেলো ভদ্রলোকের সঙ্গে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে তিনি দৃশ্য তুলে বেড়াচ্ছেন। মাসুকে দেখেই এগিয়ে এসে হাত ঝাঁকিয়ে সম্ভাষণ করলেন। মাসু অনুভব করলো, ভদ্রলোকটি যেন একটু বেশী সময় নিলেন হাত ঝাঁকাতে, আর সেই সময়টুকু মাসুর বুকের তলায় ছোট্ট একটু কম্পন তুললো।

মাসু বললো, 'ভালো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো। আরো ভালো এই যে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।'

মাসু আবার 'আরিগাতো' বললো, খানিকটা পথ একসঙ্গে হাঁটলো তারা, ভদ্রলোক জাপানী মেয়ের নমুনা হিসেবে মাসুর একটি ছবি তুলতে অনুমতি চাইলেন। মাসু গররাজী হবার কোনো কারণ দেখলো না।

এই সূত্রটি ধরেই আনাগোনা আরম্ভ হলো। ছবি দিতে আসা, ছবি তুলতে দেওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একদিন নিমন্ত্রণ করা, তার আবার পাল্টা নিমন্ত্রণ—এইসব করতে করতে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হলো। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেলো, তারা প্রায়ই নির্ধারিত সময়ে দেখাশুনো করছে। মাসু বুঝতে পারলো তার দুর্বলতা, তার বিবেক তাকে অনেক ধমকালো কিন্তু শোধরাতে পারলো না। এই টান বড়ো ভীষণ টান, মাসু প্রেমের শেষ সোপানে গিয়ে পৌঁছলো।

এদিকে চিঠি না পেয়ে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলো তোসিও, টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম আসতে লাগলো। মাসু যেমন বিব্রত হলো, তেমনি বিরক্তও

হলো। গুরুজনরা প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুললেন। তোসিও সম্পর্কে কবে যে কেমন করে একটা দায়িত্ববোধ জন্মে গেছে মাসুর, মাসু তা জানে না। বুকের একটা শিরাতে টান ধরলো। আর যাই করুক, তোসিওকে সে ঠকাতে পারে না। তোসিওকে বঞ্চনা করতে পারে না। রাত্রিগুলো তার চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলো, দিনগুলো প্রেমের স্রোতে। শেষে নিজের সঙ্গে একা হতেই তার ভয় আরম্ভ হলো। মনে হলো, রাত্রি নামক কোনো বিশ্রামের সময় না থাকলে বুঝি বেঁচে যেতো সে।

ভদ্রলোক ছ' মাসের জন্য এসেছিলেন, লেখালেখি করে আপ্রাণ চেষ্টায় কাজের মেয়াদ আরো তিন মাস বাড়িয়ে নিলেন।

বছরের শেষে তোসিও দেশে ফিরলো। সে বুদ্ধিমান ছেলে, মাসুর পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু এতটা ভাবেনি। এসে স্তম্ভিত হলো। কিন্তু কিছু বললো না, বলা তার স্বভাব নয়। এবার আর ফিরে গেলো না সে, চুপচাপ বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগলো। তার মা-বাবা তার বিয়ে দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। তোসিওর মতামতের অপেক্ষা না রেখে দিগ-বিদিকে মেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিয়োটো শহরে হায়াসিরা বিখ্যাত পরিবার। তোসিও হায়াসি বিখ্যাত ছাত্র, মেয়ের বাপেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ছেঁকে ধরলো।

তোসিও বললো, 'সব ফিরিয়ে দাও, মেয়ে আমি নিজে পছন্দ করেছি।'

'কাকে? কাকে?' হায়াসি স্বামী-স্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

তোসিও বললো, 'সময় হলে বলবো।'

ছেলে তাদের সব বিষয়েই ভালো, যেমন বাধ্য, তেমন নম্র, কিন্তু এই এক বিষয়ে মা-বাপকে উতলা করলো সে। উতলা অবিশ্যি নিজেই সবচেয়ে বেশী হলো; তার খাওয়ার ঠিক রইলো না, নাওয়ার ঠিক রইলো না, মাত্র তিন মাসের জন্য থিসিসটা কমপ্লিট করলো না, মাঝখান থেকে একটা ছোটো স্কুলে মাস্টারি নিয়ে বসলো। সারাদিন চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে, আর সময়মতো স্কুলে যায়। তোসিওকে ভালোবাসতো সবাই, বন্ধুরা তাকে প্রাণতুল্য ভাবতো। মাঝে মাঝে তারা এসে জোর করে নিয়ে যেতো এখানে-ওখানে, সিনেমায় অথবা থিয়েটারে। ঐ যাওয়া পর্যন্তই, প্রাণ থাকতো না তাতে। তোসিওর মা-বাবার অশান্তির সীমা রইলো না। এবং কেউ কিছু না বললেও তাঁরা বুঝে নিলেন, এর মূল কারণ মাসু। দুই পরিবারের এতোদিনের বন্ধুতায় একটি অলক্ষ্য ফাটল ধরলো।

জর্মান ভদ্রলোকটির সঙ্গে মাসু যতোই প্রেমে আসক্ত হোক না কেন, তোসিওর কথা সে তা বলে মন থেকে উচ্ছেদ করতে পারলো না। কেন

পারলো না, তাও মাসু জানে না। খবরাখবর সবই তার কানে যায়, মন খারাপ হয়, নিজেকে ফেরাতে চেষ্টা করে; লাভ হয় না।

কোনো এক বিকেলে মাসু যখন কলেজ থেকে একটা পার্কের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো, হঠাৎ তাকিয়ে দেখলো, পড়ন্ত বেলার রোদে একটা নিচু গাছের তলায় একটি উঁচু-নিচু কৃত্রিম ছোট্ট পাহাড়ের একটি পাথরে তোসিও বসে আছে, এক ধাপ নিচে আর একটি পাথরে অন্য একটি বিদেশী মেয়ে। দৃশ্যটা বিকেলের সঙ্গে মিলিয়ে ছবির মতো। মাসু যেতে যেতে হোঁচট খেলো, দাঁড়ালো, শেষে হনহন করে চলে গেলো। বাড়ি গিয়ে মনে হলো, খিদে নেই; সন্ধ্যাবেলা বেরুতে গিয়ে মনে হলো, শরীর খারাপ; নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে মনে হলো, মানুষ জাতটার মতো বিশ্বাসঘাতক আর কেউ না।

তোসিওকে সে প্রায় দু' বছর পরে দেখলো; সত্যিই অনেকটা রোগা হয়েছে, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত, গালের দাড়িও যথোচিত পরিচ্ছন্নভাবে কামানো নয়; তবু মনে হলো, আগের চেয়ে দেখতে যেন অনেকটা বেশী সুন্দর হয়েছে। আর প্রণয়িনীটিকে সামনে নিয়ে মুখের যেরকম আত্মহারা ভাব ছিলো, সেরকম ভাব মাসু অন্তত কোনোদিন দেখেনি। পুরুষ জাতকে মাসু ধিক্কার দিলো, তাদের ভালোবাসার বড়াইয়ের মুখে ছাই দিলো।

শুধু মাসুই নয়, এর পরে পরিচিতদের মধ্যে আরো অনেকে তোসিওকে নানা জায়গায় ঐ মেয়েটির সঙ্গেই ঘোরাফেরা করতে দেখলো। কিছুদিনের মধ্যে একটা চাপা ফিসফাসও আরম্ভ হলো; শোনা গেলো, মেয়েটি তোসিওর স্কুলেরই একজন শিক্ষয়িত্রী। সবাই ওয়াক-থু করলো; বললো, শেষে নাকি তোসিও হায়াসি ঐ একটা কুচ্ছিত বিদেশী শিক্ষয়িত্রীর পাল্লায় পড়ে মাথা মুড়োলো! মনে মনে মাসুও ওয়াক-থু না করে পারলো না।

ততোদিনে জর্মান ভদ্রলোকটি নিজের দেশে চলে গিয়েছিলেন। আসলে ভদ্রলোকটি বিবাহিত, মাসুকে দেখার আগে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিলো না, আর মাসুকে দেখার পরে মাসুকে যতোটা ভালোবাসছেন, স্ত্রীর প্রতি বর্তমানে তার চেয়ে অনেক কম আকর্ষণ অনুভব করলেও জীবন থেকে তাকে একেবারে বাদ দেবেন এরকম একটা কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তার উপরে দুটি বাচ্চা আছে। সুতরাং মাসু বিষয়ে তাঁর যতো দুর্বলতাই থাকুক, আর বেশীদিন এখানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। অথচ মাসুকে এভাবে রেখে নিজের দেশে ফিরে যেতে যথেষ্ট কষ্ট হলো তাঁর।

মাসুর ভাষায় ভদ্রলোকটি সৎ। মাসুর সঙ্গে পরিচয়ের অনতিপরেই তিনি মাসুকে স্ত্রীর কথা জানিয়েছিলেন। তবুও মাসু ভাসিয়ে দিয়েছিলো নিজেকে।

জর্মান ভদ্রলোক নিয়মিত চিঠি লিখছিলেন তাকে, মাসুকে হয়তো তিনি অকারণে একটা অশান্তির মধ্যে ফেললেন এই ভেবে অনুতাপ করছিলেন। মাসু জবাব দিয়েছিলো—অনুতাপ করবার কোনো কারণ নেই; কেননা, মাসুর জীবনে এমন একটি বাধা আছে যার জন্য সেই জর্মান ভদ্রলোক যদি কখনো তার পাণিপ্রার্থীও হতেন, মাসু নিজেই তার প্রতিবন্ধক হতো। মাসু শুধু তাঁকেই না, আরো একজনকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার প্রকৃতিটা যে কি তা অবিশ্যি সে জানে না। শুধু এটা জানে, জীবনে তার সুখী হবার অধিকার নেই।

এর পরে সেই ভদ্রলোকের চিঠির সুর আস্তে আস্তে অন্যরকম হয়ে আসছিলো; তিনি তাকে, সেই আর-একজন ভালোবাসার পাত্রটিকে, বিয়ে করে সুখী হতে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

মাসুর মনে কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে শতস্মৃতিবিজড়িত দিনগুলো তখনো জ্বলজ্বল করছিলো; অথচ যে মুহূর্তে তোসিওর সঙ্গে অন্য একটি মেয়েকে যুক্ত হতে দেখলো, সব ভুলে গেলো। যেন সর্বনাশ হয়ে গেলো তার। পরীক্ষার আর বেশী বাকি ছিলো না, কিন্তু পরীক্ষা দিলো না। অসুস্থতার ভান করে পড়ে রইলো বিছানায়।

মা-বাবার একমাত্র সন্তান সে, তার উপরে যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, যতো বিরক্তই হোন, বিশেষ কিছু বলতেও পারেন না। বাবা তো মোটামুটি টোকিয়োতেই থাকেন, তিনি বেশী দেখেন না, বোঝেনও না, যতো যন্ত্রণা মার।

এই করে করে আরো ছ' মাস কেটে গেলো। তারপর একদিন শোনা গেলো, তোসিও বিয়ে করছে।

যেদিন খবরটা কানে পৌঁছলো, কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেললো মাসু।

মাসুর মা রেগে গিয়ে বললেন, 'আর যদি তুমি বাড়াবাড়ি করো, আমি কালই তোমার বাবাকে আসতে টেলিগ্রাম করবো, তিনি এসে তোমাকে টোকিয়োতে নিয়ে যাবেন। আমি কিছুতেই তোমাকে আর এখানে রাখবো না।'

মার মনে মা রাগারাগি করতে লাগলেন, মাসুর মনে মাসু কাঁদতে লাগলো। শেষে একদিন নির্জনে তোসিওকে ফোন করলো সে। 'হ্যালো। আমি মাসু।' বলতে গলা কাঁপলো তার।

'মা-সু!' ওপিঠের গলাও অকম্পিত শোনা গেলো না।

মাসু বললো, 'আমার অভিনন্দন।'

তোসিও বললো, 'আরিগাতো!'

'আশা করি, খুব সুখে আছো।'

'হয়তো।'

'ভাবী স্ত্রীটি নিশ্চয়ই মনোমতো হয়েছে।'

'তোমার কি আর কোনো জরুরী কথা আছে?'

'এগুলি কি যথেষ্ট জরুরী নয়?'

'না।'

'আজকাল তবে কি ধরনের কথা অথবা কার কথা তোমার বিশেষ জরুরী বলে বোধ হয়?'

'মাসু, নিজেকে কোনো কারণেই ছোটো ক'রো না।'

'এখন তো আমাকে তোমার ছোটোই মনে হবে!'

'কিছু মনে ক'রো না—আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।'

রেগে অস্থির হয়ে মাসু নিজেই ফোন রেখে দিলো।

কিন্তু সেই রাগ তাকে আরো উত্তপ্ত করলো, খানিকক্ষণ বিছানায় ছটফট করে আবার টেলিফোন তুললো সে। 'শোনো।'

'বলো।'

'এই তোমার মুখেই আমি অনেক বড়াই শুনেছিলাম।'

'আমাকে তুমি যতো অভদ্র ভাবো, হয়তো আমি ততোটা নই। বড়াই করা আমার স্বভাব নয়।'

'কেবল চুল-দাড়ি রেখে, ময়লা জামা-কাপড় পরে, পরীক্ষা না দিয়ে বিরহের বিজ্ঞাপন আঁটো, এই তো?'

তোসিও অভদ্র নয় সেটা তো নিশ্চয়ই। মাসুও যে অভদ্র এমন কথা মাসু কখনো ভাবেনি। কিন্তু কি যে তার মনের ভাব তোসিও সম্পর্কে, তা সে এখনো, এতো বছর পরেও, বুঝতে পারে না। সেই সময়ে তার যেন কোনো জ্ঞানগম্যি ছিলো না, ভদ্রতা-অভদ্রতার কোনো প্রশ্নই উঠলো না মনে। তোসিও তার, একান্ত তার; সেই দাবিতে যদি কেউ প্রতিবন্ধক হয়, যে কোনো উপায়ে উচ্ছেদ করতেই হবে তাকে।

কিন্তু সব বিষয়েই তোসিও সংযত, শান্ত। মাসু যখন তার চোখের সামনে অন্যের সঙ্গে নির্লজ্জের মতো প্রেম করে বেড়িয়েছে, কই, তখন তো তোসিও এমন করেনি! অথচ তোসিওর যতো কষ্ট হয়েছে, ততো কষ্ট কি মাসুর কখনোই হতে পারে? নিজের মনের দৈন্য দেখে লজ্জিত হওয়া উচিত ছিলো মাসুর, কিন্তু হলো না। তোসিওর জবাব শোনবার জন্যে শক্ত হাতে ফোন ধরে রইলো।

একটু দেরি করে যেন বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে তোসিওর গলা ভেসে এলো, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর।'

'আর তুমি?'

'হতে পারলে ভালো হতো।'

'তোমার নিজের ধারণায় তুমি যতো বড়ো, ততো বড়ো তুমি নও।'

'আমার ক্লান্ত লাগছে—আমাকে দয়া করো একটু, ফোনটা তুমি ছেড়ে দাও।'

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে শুধু একটা কথা জানিয়ে দিই—তোমার মতো বিশ্বাসঘাতক দুনিয়ায় দুটি নেই।'

ঘটাং করে ফোন রেখে বিছানায় শুয়ে চোখের তপ্ত জলে বালিশ ভেজাতে লাগলো মাসু। তেইশ বছরের মাসু তেরো বছরের বালিকার চেয়েও অবুঝ হয়ে গেলো।

খুব আশ্চর্য, পরের দিন ব্রেকফাস্ট করে মা যখন দোকানে বসতে গেলেন, আর তাকে যখন গৃহকর্মের জন্য উঠতেই হলো, মন খারাপ করে বাগানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলো, তোসিও তাদের লতা-ঘেরা বাঁশের গেটটি খুলে ভিতরে এলো। দেখিনি ভাব ধরে অন্য দিকে তাকিয়েছিলো মাসু, তোসিও বললো, 'আমাকে ডেকেছো?'

মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়েই মাসু চোখ সরিয়ে বললো, 'না।'

'তবে যে তোমার মা আমাকে আসতে বললেন!'

'ও, মা বলেছেন তাই এসেছো! নিজে থেকে আসোনি?'

হেসে ফেললো তোসিও।

মাসু বললো, 'খুব আনন্দ হয়েছে, না? হাসি আর চাপতে পারছো না!'

'আনন্দই বটে! কিন্তু কি হয়েছে তোমার? শুনলাম—কান্নাকাটি করছো, খাচ্ছো না। কেন? মিঃ কেলনার কি চিঠিপত্র লিখছেন না অনেকদিন?'

তোসিওর মুখে মিঃ কেলনারের নাম উচ্চারণ হতে শুনে চমকে উঠলো মাসু। তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। এরকম নাম-ধাম সবই যে তোসিওর জানা আছে, সে কথাটা জানতো না সে। মুখে তার কথা ফুটলো না।

তোসিও বললো, 'তোমার মার একটা ভুল ধারণা হয়েছে—এসব কান্নাকাটির মধ্যে আমার হয়তো একটা পার্ট আছে। সেটা যে কতো মিথ্যে, কিছুতেই বলতে পারলাম না তাঁকে সে কথা। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, কথা দিয়েছি বলেই এলাম। ভেবো না কোনো সুযোগ নেবার উদ্দেশ্য আছে আমার।'

মাসু একেবারে চুপ।

'কিন্তু দুঃখ-বেদনা কিছু-না-কিছু সকলেরই আছে,' ঈষৎ উত্তেজিত তোসিও অন্যমনস্কভাবে একটা চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়ি ছিঁড়ে ফেললো, 'যার-যারটা তার-তার কাছে সব সময়েই অন্যের চেয়ে বেশী মনে হয়; তবে সবচেয়ে আজ

এইটাই আমার কাছে বেশী মর্মান্তিক লাগছে যে, তোমার এই বেদনার জন্য তোমার মা শেষ পর্যন্ত আমাকেই দায়ী মনে করলেন।'

মাসু পাথরের মতো স্থির।

'কিন্তু যাক সে কথা।' তোসিওর দীর্ঘশ্বাসটা চাপা রইলো না। 'তুমি ভেবো না, সেই ভদ্রলোক ভালো আছেন। আমাদের স্কুলে আমার এক বিদেশিনী বন্ধু আছেন, তিনি জাতিতে আমেরিকান, জর্মান ভদ্রলোকটিকে তিনি খুব ভালো করেই চেনেন। ভদ্রলোকটির স্ত্রী এঁর মামাতো বোন। ভদ্রলোকটি নিজে জর্মান হলেও বিয়ে করেছেন একটি আমেরিকান মেয়েকে। ভদ্রলোক যখন এখানে বসে তোমাকে মনে রেখে স্ত্রীকে ভুলে থেকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, তিনি তখন আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, ব্যাপারটা কি। আমার বন্ধু শুধু লিখে দিলেন, ভাবনার কিছু নেই। আমার কাছে তিনি তোমার কথা শুনেছিলেন, মন খুলে শুধু এই বন্ধুটির কাছেই কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সব আমি বলে ফেলেছিলাম। হাজার হোক, আমিও তো মানুষের অতিরিক্ত কিছু নই!'

মাসু দুঃখে লজ্জায় মিশে রইলো মাটিতে। তার কোনো কথা শোনার জন্য অপেক্ষা না করে তোসিও বিদায় নিলো।

এর পরে তোসিওর সঙ্গে আর মাসুর দেখা হয়নি। তোসিও আবার ফিরে গিয়েছিলো নিউইয়র্কে। এই চার বছরের মধ্যে আর আসেনি সে। তার বাবা-মা মধ্যে মধ্যে উড়ে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসেন। ডক্টরেট হয়ে সে সেখানকার কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটিতে ছাত্র পড়াচ্ছে।

গল্প শেষ করে মাসু বিশীর্ণ রেখায় হাসলো। বললো, 'সুতরাং আমার কি আর বিয়ের প্রশ্ন আছে, না বয়স আছে?'

আমি বললাম, 'দুটোই আছে।'

'কি উপায়ে?' হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে কথায় ঠাট্টার সুর আনলো মাসু।

বললাম, 'সম্বন্ধ করে। পাত্র হবেন তোসিও হায়াসি, কন্যা আমাদের মাৎসুমোতো।'

'তারপর?' মাসু কৌতুকে চোখ নাচালো।

আমি তেমনি গম্ভীর থেকে বললাম, 'প্রস্তাবটা স্বয়ং কন্যাকেই পাঠাতে হবে পাত্রের কাছে, পাত্র গ্রহণ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে মা-বাবারা বিয়ে দেবেন, এবং সেই বিয়ের দিনই তারা পরস্পরকে দেখবে, তার আগে নয়।'

'আর পাত্র যদি রাজী না হয়?'

'মনে হচ্ছে, সেটা সম্ভাবনার পরপারে।'

'এতো বিশ্বাস?'

'নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখো না!'

মাৎসুমোতো অর্থপূর্ণভাবে হেসে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'গাড়ি এসে গেছে, চলো।'

পরের দিন সকাল দশটায় কিয়োটো শহর ছেড়েছিলাম। এয়ার পোর্টে বিদায় দিতে এসে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে মাসু বললো, 'তুমিই আমার আসল বন্ধু।' এই বলে চুমু খেলো।

আমি সজল চোখে প্লেনে উঠতে উঠতে ভাবলাম, আমার কথাটা কি তবে মাসুর মনে ধরেছে? কি জানি!

অ ভি সা রি ণী

সুশীল রায়

একটা চমৎকার রোমান্স যে জমে উঠেছে, এতে আর সন্দেহ নেই। রাস্তার ধারের রেস্তোরাঁয় ছেলেরা চায়ের বাটি মুখ থেকে নামিয়ে ঠিক এই সময়টা চেয়ে থাকে সামনের সরু গলিটার দিকে।

ঠিক। ঐ এসেছে সে। হাতে একটা ঝক্‌ঝকে বটুয়া, ছিমছাম করে শাড়িটা পেঁচিয়ে পরা, মাথায় কাপড় দেওয়ার ভঙ্গীতে শাড়ির চওড়া পাড়ের কিছুটা খোঁপার উপর আলগোছে রাখা। রুপোর ঝুমকো-কাঁটা দিয়ে বাঁধা ওই পরিচ্ছন্ন খোঁপা, তার উপর গ্যাসের আলো পড়ে ঝকমক করছে—মনে হচ্ছে, ওই সুন্দর চুলে পা জড়িয়ে গেছে বুঝি কয়েকটা জোনাকির, তারাই জ্বলছে দপদপ করে।

প্রবল আনন্দে টেবিল চাপড়ায় রেস্তোরাঁর ছেলেরা। শব্দটা কানে যায় অপর্ণা সোমের। এই সশব্দ উল্লাসের মানেও আঁচ করে সে, কিন্তু ফিরে তাকায় না।

গলিটা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই সদাশিব মেস-হাউস। অন্ধকার সিঁড়িতে সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে অপর্ণা সোম উঠে যায় উপরে।

হৃষীকেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করছিল। ঠাণ্ডা পাওয়ারের বাল্‌ব লাগানো টেবিল-ল্যাম্প চৌকির কিনারে রেখে বুকে বালিশ দিয়ে পড়ছিল হৃষীকেশ।

ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ। অনিমেষবাবু তাঁর বাল্যকালে—সম্ভবত তখন ক্লাস সেভেনে পড়েন—এই উপদেশটা শুনেছিলেন রজনী পণ্ডিতমশায়ের কাছে। সেই থেকে কথাটা তাঁর মর্মে গেঁথে আছে। ছাত্রদের তিনি এই এক উপদেশ ছাড়া অন্য কোনো উপদেশ দেন না। সদাশিব মেস-হাউসের তিনতলার এই নিরিবিলি ঘরে বসে হৃষীকেশ যেন অধ্যয়নের নামে তপস্যা করে চলেছে।

সেই তপস্যা ভঙ্গ করতে আসে অপর্ণা সোম।

এই কথা যদি অনিমেষবাবুর কানে কোনো রকমে যায়, তা হলে রক্ষে নেই হৃষীকেশের।

চোখ থেকে চশমা খুলে বইয়ের পাতার উপর রেখে বই বন্ধ করে হৃষীকেশ সোজা হয়ে বসল।

অপর্ণা দুই হাতে বালিশ থাবা দিয়ে দিয়ে সমান করতে করতে বলল, কি অবস্থা করেছ বালিশের।

হৃষীকেশ বলল, বেশ করেছি। রোজ এসে এসে এই যে আমাকে ডিসটার্ব করছ—

—তাই কি?

—পরীক্ষা এসে গেল না? বাবা যদি জানতে পারেন, তা হলে রক্ষে নেই।

অপর্ণা বলল, না থাকল। চল, খোলা হাওয়ায় চল। মুনিঋষিরা তপস্যা করতেন তপোবনে, সেখানে যেমন আলো তেমনি বাতাস। তোমার মত এরকম বন্ধ ঘরে অন্ধকারে দম বন্ধ করে নয়। এস, বাইরে এস।

সদাশিব মেস-হাউসে বাস করে চাকরে-রা। পড়ুয়ার মধ্যে একমাত্র হৃষীকেশ। একতলায় রান্নাঘর, দোতলায় দশটা ঘর, আর তেতলায় এই একটাই। ঠিক ঘর নয় এটা, বলা চলে চিলেকোঠা। একেবারে নিরিবিলি এই ঘরটা হৃষীকেশের পছন্দসই হয়েছে। আর, বলতে কি, অপর্ণারও।

ছায়া-ছায়া এই সন্ধ্যায় এই ঘরের সামনের প্রশস্ত ছাতটা যেন এইরকম একটা যুগলমূর্তির নীরব বিচরণের জন্যেই তৈরি করেছে এই বাড়ির আর্কিটেক্ট। লোকটার রুচি না থাকলেও রসবোধ ছিল। জবরজং প্যাটার্নের বাড়ি হলে হবে কি, তার উপর ছাতটা কিন্তু মনোরম।

চুলের বোঝা ঝুলে পড়েছিল চোখের উপর, অপর্ণা তার হাতের পাঁচটি আঙুল দিয়ে চিরুনির মত করে হৃষীকেশের মাথার চুল আঁচড়ে দিয়ে গেল, তপস্যা যদি মন দিয়ে করতে চাও, তবে জট রাখ। কেন, ঘরে কি চিরুনি নেই?

ঘাড়ের উপর দিয়ে অপর্ণার দিকে চেয়ে হৃষীকেশ বলল, যার ঘরে স্ত্রী নেই, তার আবার চুলের শোভা দিয়ে দরকার কি।

—হয়েছে রসিকতা! অপর্ণা হৃষীকেশের হাত ধরে টানল, বলল, এস, ছাতে চল।

ছাতে এল দুজনে। ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগল দুজনে। যেন অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু সব কথা একসঙ্গে বলা যাচ্ছে না। ঠিক কোন্ কথাটা দিয়ে কথা আরম্ভ করা যেতে পারে দুজনেই মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কথাটা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা বলল, আকাশটা যে এত প্রকাণ্ড, নীচের রাস্তা থেকে তা বোঝা যায় না। আর, অন্ধকারটাই বা কি সুন্দর!

হঠাৎ হৃষীকেশের হাত চেপে ধরে অপর্ণা বলল, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না তোমাকে ছেড়ে।

হৃষীকেশ অপর্ণার হাতে চাপ দিয়ে বলল, আমারই কি ইচ্ছে করছে তোমাকে ছেড়ে দিতে?

—আচ্ছা, যখন তুমি একা-একা পড়াশুনা কর, তখন মনে হয় না আমার কথা?

পাল্‌টা প্রশ্ন করল হৃষীকেশ, তোমার মনে হয় আমার কথা?

অপর্ণা বলল, জানিনে। আমার পড়াশুনা তো আর তপ নয়, ওর নাম মনরক্ষা। গুরুজনের ইচ্ছেকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে কলেজ করছি আর কলেজের বই বয়ে বেড়াচ্ছি। পড়াশুনা যা হচ্ছে, তা আমিই জানি। তোমার পরীক্ষা শেষ হবে কবে বলো।

—পরীক্ষার কি আর শেষ আছে? হৃষীকেশ দার্শনিকতার ভান করে বলল, সারাটা জীবনই তো পরীক্ষা দিয়ে ভরা! এই মুহূর্তে এইখানে দাঁড়িয়ে কি আমরা দুজনে জীবনের দুরূহ পরীক্ষা দিচ্ছিনে?

অপর্ণা হৃষীকেশের কাঁধে আলগোছে হাত দিয়ে ঘা দিয়ে বলল, যাও! তোমার ফাজলামো ভালো লাগছে না আমার।

হেসে উঠল হৃষীকেশ। বলল, ওই দেখ, ওই বাড়িগুলোর জানলায়-জানলায় দরজায়-দরজায় আলো জ্বলছে। কি সুখের জীবন ওদের! ওরা আমাদের মত ভীরুও নয়, ভিতুও নয়। ওরা নিজেদের এভাবে লুকিয়ে রাখেনি আমাদের মত এই অন্ধকারের আড়ালে।

অপর্ণা তেতে ওঠার মত করে বলল, লম্বা বক্তৃতা তো শুনছি মশায়! কিন্তু ওই অন্ধকার থেকে আলোয় আসা হচ্ছে কবে?

—হবে, হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।

অপর্ণা হেসে উঠল, বলল, কিন্তু বেশী সবুর করলে মেওয়া যে শুকিয়ে যায়! সে হুঁশ আছে?

অপর্ণার কথা শুনে হৃষীকেশও হেসে উঠল, বলল, আব তো মাত্র তিনটে মাস। তারপর এই মেস-এর বেশ ছেড়ে নতুন বেশ পবব। এই নির্বাসন থেকে রেহাই পেয়ে যাব। তখন আর পরোয়া কি! বাবা তখন তুলে নেবেন এই রেস্‌ট্রিক্‌শন।

—কিন্তু এই তিনটে মাস কম কথা নয়, মশায়। এই রাস্তা দিয়ে আসা এক সংকট। রেস্তোরাঁর ছেলেরা টেবিলে তবলা বাজাতে আরম্ভ করেছে।

হৃষীকেশ বলল, তাই নাকি! ফাজিল ছেলের দল! এর পর আমরা দুজনে ওই তবলার সঙ্গে ডুয়েট গাইতে আরম্ভ করব। কি বল?

অপর্ণা কিছু বলল না।

দুনিয়ার কাকপক্ষীকে না জানিয়ে রোজ এই সময়ে সদাশিব মেস-হাউসে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যায় অপর্ণা। কিছুক্ষণ ছাতে পায়চারি করে, হৃষীকেশের বই গুছিয়ে দেয়, কাপড় কুঁচিয়ে রাখে। এবং হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রণয়পিপাসাও একটু মিটিয়ে নেয়।

হৃষীকেশ বলে, আমি তপস্বী। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। সে খেয়াল আছে?

অপর্ণা বলে, আছে। মুনিঋষিদেরও ধ্যান ভঙ্গ করে অপ্সরা। আমি অপ্সরা না হতে পারি, অপর্ণা তো নিশ্চয়!

—নিশ্চয়! হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে ওঠে হৃষীকেশ, বলে, সত্যিই তুমি অপ্সরা!

অপলক চোখে হৃষীকেশ অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, সত্যি, কি রূপ তোমার!

অপর্ণা বলে, হয়েছে। ঠাট্টা করতে হবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজ চলি।

—বাড়িতে গিয়ে কি বলবে?

—বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। মিথ্যে কথা বলা হবে না—তুমি কি আমার বন্ধু নও?

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় হৃষীকেশ। ফিরে আসতে গিয়ে আবার সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে বলে, কাল আসছ তো?

—হ্যাঁ।

অপর্ণা নেমে যায়।

দোতলার চাকরে-বাবুদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ ফিরে আসেন। বুড়ো বিহারীবাবু এদের কথা শুনে মজা পান, গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠেন দোতলার বারান্দা থেকে। তাঁর রুম-মেট দিগিন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন, ওহে দিগিন ভায়া, মেস-বাড়ি যে তীর্থ হয়ে গেল, আমরা যে পুণ্যাত্মা হয়ে গেলাম সবাই!

নীচে অপর্ণার কানে, উপরে হৃষীকেশের কানে এই কথা পোঁছয়। ব্যঙ্গটা তারা বোঝে। কিন্তু জবাব দিয়ে হবে কি। তিন মাসের মধ্যে আরো অনেকগুলো দিন তো কেটে গেছে ইতিমধ্যে। বাকি ক'টা দিন কেটে গেলেই এসব তামাশার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে তারা। সেই শুভ-দিনের জন্যেই এখন তাদের তপস্যা, সেইদিন তাদের জীবনে এসে যাবে সুপ্রভাত, এবং ঘটবে নতুন গৃহপ্রবেশ।

রেস্তোরাঁর ছেলেদের চায়ের কাপে তুফান ওঠে। ওদের মধ্যে অতি উৎসাহী দুজন ফলো করেছে অপর্ণাকে। ব্যাপারটা ভালো করে জানার জন্যে তাদের কৌতূহলের শেষ নেই।

দিগ্বিজয় করে এসে যেন মনোরঞ্জন ঢুকল চা-খানায়, বলল, পরকীয়া হে, পরকীয়া। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। স্পষ্ট দেখে ফেললাম আজ।

জমে উঠেছে রস, মনোরঞ্জন তাই কড়া করে চা দেবার ফরমাশ করে নিজের কাপড়ের কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল, বলল, আজব শহর কলকাতা, কত কাণ্ডই না হচ্ছে, কতটুকু আর জানি হে আমরা।

ওর সঙ্গী ছিল বীরেন, সেও মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। বলল, মডার্ন রাধা। অভিসারে আসা হয় রোজ। সেজে-গুজে সিঁদুরের টিপটি পরে। বেহায়াপনার আর শেষ নেই।

পরের দিনও অপর্ণা দুরু-দুরু বুকে সদাশিব মেস-হাউসের গলি দিয়ে ঢুকে পড়ল। পিছনে চায়ের দোকানে প্রচণ্ড হল্লা বেজে উঠল। পা দুটো একটু কেঁপেই গেল অপর্ণার।

এর পরদিন থেকে সদাশিব মেস-হাউসে আর পদার্পণ করেনি অপর্ণা সোম।

কিন্তু দেখা হওয়া চাই তাদের, দেখা না হলে চলে না। এটা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে, একদিন দেখা হবে না ভাবলেই যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শুধু অপর্ণার নয়, হৃষীকেশেরও।

চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টাণ্টশিপ পরীক্ষা হৃষীকেশের। অনিমেষবাবু সারাজীবন ইস্কুল-মাস্টারি করে পরিশ্রান্ত ও জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। লেখা-পড়ার উপর তাঁর শ্রদ্ধা অকৃত্রিম, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ না করলে জীবনে কোনো মহৎ কাজে সাফল্যলাভ হয় না—এ কথা তাঁর অন্তরেরই কথা, কিন্তু হৃষীকেশ পর-পর প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করার পর অনিমেষবাবুর মনের মধ্যে আর একটা উপসর্গ দেখা দিল। টাকা। টাকার উপর আকর্ষণ।

কয়েকটা বিয়ের প্রস্তাব আসার পর থেকেই অনিমেষবাবুর মনের পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রথম দিকে তিনি চুপচাপ থাকতেন, তারপর যখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন তখন প্রথম কথাই বললেন, কিরকম খরচ করবেন? যৌতুক চাইনে, কিন্তু বিয়ের খরচ তো আছে!

চাঁদ ধরতে অনেক বামন এসেছিলেন গোড়ার দিকে—অনেক গরিব কনের বাপ। অনিমেষবাবুর দাবির কথা শুনে তাঁরা আর আসেন না।

চাঁদপুরে সামান্য জমি-জমা ছিল। ইস্কুল-মাস্টারি করে সংসার চালিয়ে যেটুকু জমি-জমা হতে পারে, তার পরিমাণ এর চেয়ে বেশী না। তারপর সেসব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। কলকাতার উপকণ্ঠে নাকতলায় একটু জমি পেয়েছেন, সেখানে টিনের শেড তোলা হয়েছে একটা। ঘর একটাই—একটু বড়, সামনে লম্বা ফালি বারান্দা।

এই বারান্দার টুলে বসেই অনিমেষবাবু তাঁর ছেলের বিয়ের প্রস্তাব

নিয়ে কথাবার্তা বলেন। ভিতরের ঘরে বসে পড়াশুনা করে হৃষীকেশ। এইসব কথা শুনতে শুনতে তার মন এক-এক সময় উদাস হয়ে যায়।

যাদবেন্দ্র ঘোষ যুদ্ধের মধ্যে বিস্তর টাকা কামিয়েছেন। কয়েক লাখ নাকি। তাঁর মেয়ে দেখতেও সুন্দর না, পড়াশুনাও করেনি। টাকার চাপ দিয়ে এই মেয়ে পার করার জন্যে তিনি এলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর চালিয়াত পুত্রবধূ অম্বা।

মেয়ের বিবরণ শুনে, ছবি দেখে অনিমেষবাবু বললেন, খরচপত্র করবেন কেমন?

—যা আপনি চাইবেন, তাই দেব।

খুব তেজী টাইপের লোক অনিমেষ, খুব রাগীও। বাড়ির লোক সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু তাঁর মেজাজ সম্বন্ধে সকলে ওয়াকিবহাল নয়, যাদব ঘোষ বললেন, আপনার দাবি কি?

—মেয়ে লেখাপড়ায় কতদূর?

—ক্লাস ফাইভ।

টাকার দিকে যেমন, লেখাপড়ার দিকেও তেমনি ঝোঁক অনিমেষের। শিক্ষিত ছেলের উপযুক্ত শিক্ষিত মেয়ে চান তিনি। অনিমেষবাবু হেসে বললেন, তবে তো কথা বলে লাভ নেই।

চালিয়াত পুত্রবধূ অম্বা মাঝখান থেকে কথা বলল। বলল, লেখাপড়ার ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়া যাবে। বাড়ি বদলান—যা ফার্নিচার দেওয়া হবে তা রাখবেন কোথায়?

তপ্ত হয়ে উঠলেন অনিমেষ সোম। বললেন, ইডিয়ট'

টুল ছেড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে উচ্চকণ্ঠে হৃষীকেশকে বললেন, ওদের চলে যেতে বল শিগ্‌গির। ননসেন্স।

কথাটা হৃষীকেশকেই যেন বলা হল, কিন্তু আসলে বলা হল ওদের। ওরা আর দেরি করল না, চলে গেল।

বাব্বা! কি দাবি! মেয়ে কলেজে-পড়াও চাই, এক আণ্ডিল টাকাও চাই। —এই ধরনের আলোচনা হয় আশপাশের বাড়িতে।—একটা ছেলে নিয়েই এত অহংকার—ঘরে মেয়ে নেই, লোকটা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

অনিমেষবাবু একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তাঁর কানে এ কথা গেলে তিনি লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেন, এ ভয়ও আছে প্রতিবেশীদের। তাই তারা যা আলোচনা করে তা নেহাতই চাপা গলায়।

অপর্ণা হৃষীকেশের কাছে যাওয়া বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু দেখা হয় তাদের রোজই। রোজ কথা হয়ে থাকে পরের দিন দেখা হবে কখন ও

কোথায়, অপর্ণা তার কলেজের রুটিন দেখে দেখার সময় ঠিক করে দেয়। সেই অনুসারে হৃষীকেশ এসে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট জায়গায়—ল্যান্সডাউন রোড আর যতীন দাস রোডের মোড়ে। সেখান থেকে তারা গুটিগুটি হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় দুপুর বেলায় ফাঁকা লেকে। জলের কিনারে ঘাসের উপর বসে তারা। সুস্পষ্ট আলোয় জলের মধ্যে নিজেদের যুগল ছায়া দেখে পুলকিত হয়।

এদিকে পুলকিত হয় তারা, আর গাছের আড়াল থেকে এই মনোহর দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পাশের রাস্তার রেস্তোরাঁয় ছেলের দল। গ্রে হাউন্ডকেও হার মানিয়েছে তারা। তারা এই রোমান্সের গন্ধে ঠিক শিকার খুঁজে বের করেছে।

অপর্ণা বলল, কত উপদ্রব যে সহ্য করছি তোমার জন্যে' এর পরিণাম কি কে জানে।

হৃষীকেশ বলল, পরিণাম তো রমণীয়ই মনে হচ্ছে। বিনা ঝুঁকিতে এই দ্বিপ্রহর-প্রণয় করা যাচ্ছে, সান্ধ্য-প্রণয় করা গিয়েছে; এর পর নববধূটির মত প্রবেশ করবে আমাদের নাকতলার নতুন ঘরে। শুনছি, বাবা নাকি নতুন ঘর তুলছেন একটা।

অপর্ণা বলল, বাবার কাছে বুঝি আর যাওয়া হয়নি এর মধ্যে?

—সময় কই? হৃষীকেশ হেসে উঠে বলল, ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ, এ কথা কি বাবা জানেন না? আমি তপস্যায় মশগুল না? আমি ছাত্র নই?

অপর্ণা বলল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—ওখানে স্থানাভাব। আমার পড়াশুনায় বিঘ্ন হবে বলে বাবা নিজে দেখে মেস বাছাই করে, ঘর ঠিক করে আমাকে সেখানে নির্বাসন দিয়ে গেছেন। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করি কি করে।

অপর্ণা বলল, থাক। অত কঠিন বাংলায় আর কথা বলতে হবে না। কিন্তু, কিরকম অপবাদ রটছে জান? ওদিকে গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কারা যেন। উঁহু, তাকিয়ো না পিছনে। আমরা যেন দেখিইনি ওদের।

হৃষীকেশ এক টুকরো ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, বয়ে গেছে অপবাদে। আর ক'টা দিন তো, চুকে যাক পরীক্ষা, দেখে নেব।

মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে সিটি বাজাচ্ছে ছেলেরা। চেঁচিয়ে বলছে, সব দেখেছি। বাড়ি চিনি। সব বলে দেব।

অপর্ণা ফিসফিস করে বলল, শুনছ?

—হুঁ। চুপ করে থাকো।

বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক না। পরীক্ষার আর বিশেষ দেরিও নেই। তার

উপর, এই পরীক্ষার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ বাঁধা। আর, অনেকে নির্ভর করে আছে তারই উপর।

তারা উঠল, ছোট লেকের কাছে এসে দু দিকে যাত্রা করল তারা।

পিছন থেকে কারা যেন বলছে, শুনতে পেল অপর্ণা, বলছে, সুন্দর পরকীয়া। বলে দেব বউদি, সব কথা বলে দেব দাদাকে।

আচ্ছা ফাজিল তো! দ্রুত পায়ে হাঁটতে গিয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল অপর্ণার।

পরদিন যথাসময়ে যথাস্থানে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। সামনের ডিসপেন্সারির কম্পাউন্ডার, পানবিড়ির দোকানের খদ্দেররা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। অনেক সময় কেটে গেল, কিন্তু দেখা নেই হৃষীকেশের।

ঘণ্টাখানেকের উপর বই বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও হৃষীকেশের দেখা না পেয়ে একটু বিরক্ত হয়েই অপর্ণা বাসায় চলে গেল—বিপিন পাল রোডে।

মা বললেন, এত ক্লান্ত দেখছি কেন রে?

—মাথা ধরেছে।

—তবে শুয়ে থাক। বিশ্রাম কর।

অপর্ণা বলল, কিন্তু একবার বেরোতে হবে আমাকে।

—এক্ষুনি?

—না। দেরি আছে।

—তা হলে সন্ধ্যের পর যাস। ট্রামবাসে না গিয়ে উনি ফিরলে গাড়িটা নিয়ে যাস।

অপর্ণা বলল, গাড়ির কোনো দরকার হবে না।

কপালে ও সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্যার একটু পরে অপর্ণা পদব্রজেই বেরিয়ে পড়ল। চায়ের দোকানের দিকে না চেয়ে সে সোজা ঢুকে পড়ল গলির মধ্যে। উদ্বেগে ও আতঙ্কে সে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ঘরে উঁকি দিল; দেখল, নাকে রুমাল দিয়ে বালিশে পিঠ দিয়ে হৃষীকেশ বসে আছে বইয়ে চোখ দিয়ে।

অপর্ণা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বলল, ব্যাপার কি?

সোজা হয়ে বসে হৃষীকেশ বলল, ঠিক জানতাম, আসবে। বেজায় সর্দি হয়েছে।

অপর্ণা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, বড় সস্তা হয়ে গিয়েছি আমি, তাই না? দুপুরে দেড় ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলে, এতে তোমার সম্মান বাড়ল? আমি কি তোমার কেউ না?

—কি আশ্চর্য! চটে গেলে কেন? বেজায় সর্দি হয়েছে। সারাটা দিন হাঁচছি।

অপর্ণা বলল, তোমার দায়িত্ব-জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। থাক, আমি আর আসব না।

হৃষীকেশ বাধা দেবার বা পথ রুখে দাঁড়াবার আগেই অপর্ণা তরতর করে নেমে চলে গেল।

নিজের মনেই হৃষীকেশ বলল, বেজায় চটেছে।

দোতলা থেকে বিহারীবাবুর প্রবল কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। বুড়ো হলে হবে কি, জীবনে উৎসাহ আর আমেজ তাঁর আছে।

হৃষীকেশ তার ঘরে ঢুকে হাঁচতে লাগল। হাঁচতে গিয়ে ভুলেই গেল সে তার কর্তব্যের কথা। ছুটে গিয়ে অপর্ণাকে যদি পৌঁছে দিয়ে আসত তা হলে মেয়েটির মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হত হয়তো। কিন্তু সে খেয়ালই হল না হৃষীকেশের। নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে সে মনে মনে বলতে লাগল, বড় সেন্টিমেন্টাল আর বড় সেন্সিটিভ ওই মেয়েরা।

আর যে যাই বলুক, অপর্ণার এই অভিমানকে অসংগত বলবে না কোনো মেয়ে। এটুকু সে জানে। এটা তার কেবল অভিমান নয়, এটা তার অপমানও। এত বাধা, এত বিঘ্ন এত ব্যঙ্গ, এত পরিহাস উপেক্ষা করে সে যার জন্যে সব লজ্জা আর সংকোচ জলাঞ্জলি দিয়েছে, তার কাছ থেকেই অপর্ণা পেল এই উপেক্ষা। এটা কম আঘাত নয় অপর্ণার। সে পণ করল, না ডাকলে সে আর যাবে না।

অরবিন্দ বসু উপরে উঠে এসে বললেন, শুনছ?

অপর্ণার মা আলমারি থেকে কি যেন বের করছিলেন, তালা থেকে চাবিটা বের করে কাঁধে চাবির তোড়া ফেলতে ফেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলতে লাগলেন, কি ব্যাপার বলো তো! দুটো লোক এসেছিল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি কোথায়, ঠিকানা কি ইত্যাদি বেশ অমায়িকভাবে জিজ্ঞাসা করল। সব বললাম। তারপর ভিন্ন মূর্তি ধরে অপর্ণার নামে যা-তা বলে গেল।

—কি বলল? ব্যগ্রভাবে বললেন মা।

—ও নাকি কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। লেকে বসে, গল্প করে—এইসব আর কি।

মা বললেন, মিথ্যে কথা। বাজে কথা। কলেজে যায়, কলেজ থেকে আসে।

বাবা বললেন, কি জানি! ওসব ওরা বলতেই বা এল কেন!

—উকিলি ব্যবসা করছ। কত শত্রু তোমার, কতজনকে মামলায় হারিয়েছ। তাদেরই চক্রান্ত হবে।

অরবিন্দ বসু একটু চিন্তান্বিত হলেন, কিন্তু আর কিছু বললেন না।

এত টাকা ঢেলে, ছেলের বাবার সব দাবি এবং সমস্ত রকমের আব্দার পূরণ করে মেয়ের বিয়ে দিলেন তিনি। ছেলেটা খুব ভালো—এই একমাত্র আকর্ষণ। সেই ছেলের পড়াশুনার এবং ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে দেবার দায়িত্বও নিয়েছেন তিনি। এত ঝক্কি আর ঝামেলা পুইয়ে যদি এইরকম দুঃসংবাদ শুনতে হয় তা হলে সহ্য করা সত্যিই মুশকিল।

অরবিন্দবাবু কয়েকদিন ধরে ভাবলেন, মেয়েকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক কি না। কিন্তু কিছু স্থির করে উঠতে পারলেন না। এমন সময় একদিন নতুন করে খবর এল তাঁর কাছে।

অরবিন্দ বসু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উপরে উঠে এসে বললেন, শুনছ?

মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, কি? কেন?

—অপুর শ্বশুর এসেছেন।

—তাই নাকি? খাবার-দাবার যোগাড় করি তা হলে—বেয়াই এসেছেন।

—দাঁড়াও। অরবিন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন, উনিও আবার ওই খবর নিয়ে এসেছেন।

—কি খবর?

—কেন খোঁচাচ্ছ বলো তো? চিঠি দেখালেন আমাকে। উড়ো চিঠি পেয়েছেন।

—মিথ্যে কথা। বানানো কথা।

মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল এদের। কি করা কর্তব্য, কি বলা উচিত—কিছুই ঠিক করতে পারল না কেউ।

অরবিন্দবাবু নীচে নেমে গিয়ে দেখেন, বেয়াই চলে গেছেন। এমন রাগী আর এমন তেজী লোক সচরাচর দেখা যায় না। তার উপর ভদ্রতারও লেশ নেই।

এর পর দুই পরিবারের মধ্যে অনেক দেখাদেখি ও অনেক চিঠি লেখালেখি হল, কিন্তু রফা হল না কিছু।

অপর্ণা শুনেছে সব কথা, তবু সে অটল আছে। তার মা কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন, অপর্ণা বলেছে, ঠিক আছে।

এত অপবাদ, এত অশান্তি, তবু বলে, ঠিক আছে? এতটুকু পরিতাপ নেই, এতটুকু আক্ষেপ নেই?

—না, কিছু নেই। আমি বুঝে নেব। অপর্ণার ওই এক কথা।

মেয়ের পেট থেকে কোনো কথা বের করতে পারলেন না মা। তাই, লজ্জার কথা হলেও, অপর্ণার বউদিকে লাগালেন ওর পিছনে। বউদির জেরার উত্তর দিতে দিতে সব স্বীকার করে ফেলল অপর্ণা। অন্যায় সে কিছু করেনি, সে যেত হৃষীকেশের কাছে, সে ঘুরেছে হৃষীকেশের সঙ্গে। মেস থেকে হৃষীকেশ অনেক চিঠি লিখেছে, বার বার যেতে বলেছে। তারপর যাওয়া শুরু করেছে সে।

—ও, এই কাণ্ড! ডুবে ডুবে জল খাওয়া? বউদি অপর্ণার চিবুক আঙুল দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন।

বিপিন পাল রোডের বাড়ির হাওয়া পাতলা হয়ে গেল। কিন্তু নাকতলার বাড়ির হাওয়া এখনো ভারী।

হৃষীকেশের পরীক্ষা হয়ে গেছে। নির্বাসন তার শেষ। তার কানে এই কথা যখন প্রথম গেল তখন দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল তার, আর গরম হয়ে উঠল দুই কান। কোনো কথা বলতে পারল না সে।

নাকতলার আবহাওয়া স্বাভাবিক না হলেও বিপিন পাল রোড এখন একেবারে শান্ত।

মা বললেন, যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড, আর অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। পরীক্ষা যেন দুনিয়ায় আর কেউ দেয় না। বিয়ে হবে, কিন্তু ছেলে-বউয়ের দেখা হবে না। মুনিঋষিরা যেন তপস্যা করে না, আর তাদের ঘরে যেন বউ থাকে না। মহাভারত খুঁজে দেখ না, এন্তার বউ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঋষিরা। তাদের তপ তাই বুঝি পণ্ড হয়ে গেছে! যা চাইল ওরা, তাতেই রাজী হয়ে গেলে তুমি। আর, রাজীই যদি হলে ক' মাস দেরি করে পরীক্ষার পর বিয়ে দিলেই হত।

অরবিন্দবাবু মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, বললেন, হত না। বেজায় টাকার খাঁই। আরো ভালো অফার পেলেই অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিতেন। ছেলেটা যে জুয়েল, এটা তো দেখতে হবে!

—দেখ গিয়ে তুমি। এবার তো ঋষির পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এস। ওরা সুখে থাক, তবেই হল।

পরদিনই অরবিন্দবাবু যাবেন ঠিক করলেন। রবিবার আছে। আদালত নেই।

ছেলের বউ শোভাকে আর অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। নাকতলার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন অনিমেষ সোম।

—কি সমাচার?

অরবিন্দবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, এলাম। অপর্ণাকে নিয়ে এসেছি। ঋষি নেই?

—আছে।

অভ্যর্থনা বড় ঠান্ডা রকমের হল। কিন্তু তাতে ক্ষুণ্ণ হলেও কিছু প্রকাশ করলেন না অরবিন্দ বসু। হাসতে হাসতে তিনি বেয়াইকে মজার গল্পটা বললেন।

অনিমেষ হাসিতে যোগ দিলেন না, ডাকলেন, ঋষি! হৃষীকেশ!

শোভা অপর্ণাকে নিয়ে নেমে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, ডেকে আনি ওকে?

অপর্ণা বলল, দাঁড়াও।

অনিমেষবাবু হৃষীকেশকে কি সব কথা যেন বললেন, বললেন, এসব সত্যি নাকি হে?

হৃষীকেশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল, আমি জানিনে।

শোভা এগিয়ে গেল, হৃষীকেশকে ডাকল, সঙ্গে করে নিয়ে এসে নতুন তৈরি করা ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। এইখানে অপর্ণাদের জীবনের নতুন সুপ্রভাতের ও নতুন গৃহপ্রবেশের স্বপ্ন তারা দেখেছিল একদিন।

অপর্ণা সলজ্জভাবে বলল, সব শুনেছ?

—কি?

—অপবাদের কথা?

দুই চোখ লাল ও দুই কান গরম হয়ে উঠল হৃষীকেশের। বলল, শুনেছি।

—কার জন্যে এ অপবাদ?

—আমি জানিনে।

শোভার কাঁধের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অপর্ণা। তার পায়ের নীচে থেকে মাটি যেন সরে যেতে লাগল।

শ্বেত ময়ূর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নীল রঙের একটি দোতলা বাস পশ্চিম থেকে পূবে ছুটে যেতে না যেতেই নতুন ঘন নীলের আর একটি বাস পূব থেকে পশ্চিমে ছুটে এল। আর শীলাদের বাড়ির সামনের স্টপটাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। পোস্টের গায়ে আঁটা গোল চাকতিতে স্টপ বলে লেখা থাকলেও সব বাস এই স্টপে দাঁড়ায় না। যাত্রী থাকলেও নয়। 'বাঁধো, বাঁধো' করতে করতে ড্রাইভার ভারী বাসটাকে আরও দূরে স্কুলের সামনে যে স্টপটা, সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের বাড়ির সামনে বাস না থামলে মাঝে মাঝে শীলার রাগ হয়। আবার কোন কোনদিন সহানুভূতি হয় ড্রাইভারের ওপর। বাস চালাতে শুরু করলে তা বোধ হয় আর থামাতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, কেবলই চালাই, কেবলই চালাই। বাসের দোতলায় একবার উঠে বসলে শীলার যেমন আর নামতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, কেবলই চলি, কেবলই চলি।

কিন্তু চলা তো আর সব সময় যায় না! আজকাল শীলা খুব কমই বাড়ি থেকে বেরোতে পারে। সংসারে অনেক কাজ। তা ছাড়া সে ঢের বড় হয়ে গেছে। এখন কি আর যখন-তখন বাইরে বেরোলে চলে? কিন্তু বাড়ির বাইরে না গেলেও সিঁড়ি পর্যন্ত আসতে দোষ কি! বসবার ঘরের জানলা দিয়ে, কি সদর দরজার আধখানা পাট মেলে লোকজনের চলাচল, ট্যাক্সি, কার, আর বাস চলাচল দেখতে তো দোষের কিছু নেই! চলন্ত বাসের ফাঁক দিয়ে মানুষকে দেখতে বড় ভালো লাগে শীলার। এই পাড়ার লোককেই মনে হয় অচিন দেশের মানুষ। মা অবশ্য তার সদরে এসে দাঁড়ানো বেশী পছন্দ করেন না। প্রায়ই ধমক দেন, 'কি যখন-তখন হাঁ করে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকিস? লজ্জা করে না? ষোল উৎরে সতরয় পড়লি, এখনও কি সেই ছোটটি আছিস?' কিন্তু পড়লই বা সতরয়! তাই বলে কি আর শীলার দেখতে ইচ্ছা করে না? এই গাছ-পালা, লোকজন, রোদবৃষ্টি—পৃথিবীর সবই যে কত সুন্দর, মা তো তা জানে না!

'কি শীলারানী, একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ যে! আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে নাকি?' বাস স্টপে নেমে রাস্তা পার হয়ে দুজন ভদ্র-লোক যে একেবারে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা শীলা লক্ষই করেনি। নীল মেঘের মত চলন্ত বাসটাই তার দুটি কৌতূহলী চোখকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছিল।

একটু জিভ কেটে লজ্জিত ভঙ্গিতে শীলা পিছিয়ে এল।

আগন্তুক হেসে বলল, 'ও কি, পালাচ্ছ কেন?'

পালাবার কিছু নেই। ছোড়দির বর অনিন্দ্যদা। আত্মীয়! আপনজন। কিন্তু ওঁর পাশে উনি কে? অনিন্দ্যদার চেয়ে মাথায় আধ হাতখানেক লম্বা। দুধের মত ফর্সা চেহারা। সবুজ রঙের একটা জামা গায়ে আর চোখ দুটিও নীল নীল। কে উনি?

শীলা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'অনিন্দ্যদা, কে উনি? উনি কি সাহেব?'

অনিন্দ্য সরবে সগৌরবে হেসে বলল, 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ট্যাংলো-ইন্ডিয়ান নয়, একেবারে খোদ সাহেব! দ্বীপবাসী ইংরেজ-তনয় নয়, কন্টিনেন্টের জাত জার্মান।'

তারপর অতিথির দিকে ফিরে অনিন্দ্য বলল, 'Man, she is my sweet sister-in-law—the youngest, the sweetest and the best.'

শীলা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'অনিন্দ্যদা, ও কি হচ্ছে! আমি ছোড়দিকে ঠিক বলে দেব।'

কিন্তু ততক্ষণে সাহেব হাত এগিয়ে দিয়েছে, উদ্দেশ্য—করকম্পন। পরমুহূর্তেই তার কি মনে পড়ে গেল। জোড়হাত কপালে তুলে বলল—'নো-মস্কার।'

তার উচ্চারণ আর নমস্কার জানাবার ভঙ্গি দেখে হাসি চেপে রাখা শীলার পক্ষে কঠিন হল। উচ্ছ্বসিত হাসি সংবরণের চেষ্টায় প্রতিনমস্কারের কথা তার মনে রইল না। অনিন্দ্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ওঁকে নিয়ে ভিতরে আসুন।'

নীলাদ্রি মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে ছোট তক্তপোশখানার ওপর সবে সেতারটির ঢাকনি খুলেছে, শীলা তার ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ফুলদা, দেখ কে এসেছেন।'

নীলাদ্রি স্মিতমুখে বলল, 'কে রে?'

'অনিন্দ্যদা, আরও যেন কে। বেরিয়ে এসে দেখই না! বাইরের ঘরে আছেন।'

কোন রকমে তাকে খবরটা দিয়ে শীলা পাশের ঘরে এসে ঢুকল। এ ঘরেও একখানা তক্তপোশে বিছানা গুটানো রয়েছে। তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কোমল সুন্দর মুখখানাকে শক্ত করে চেপে ধরল শীলা। ডুবেশাড়ি-পরা তার তনুদেহ বিপুল আবেগে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

আলমারি থেকে বাজারের টাকা বের করে দেওয়ার জন্যে সরোজিনী এসে

ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু আঁচলের চাবি আলমারির তালায় লাগাবার আগে মেয়েকে দেখে হঠাৎ থমকে গেলেন।

মৃদু কিন্তু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কি ব্যাপার! কি হল তোর!'

তারপর নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে মেয়ের মুখখানা একটু দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'ও, হাসছিস! তাই বল। আমি ভাবলাম, কি আবার হল রে বাপু। এই সাত-সকালে কে আবার তোকে বকুনি লাগাল।'

শীলা এবার মুখ তুলে বলল, 'বাঃ রে, বকুনি আবার কে দেবে! মা জান. অনিন্দ্যদা কোত্থেকে এক জার্মান সাহেবকে নিয়ে এসেছে। কি তার বাংলা বলবার কায়দা আর নমস্কার জানাবার বহর! যাও, দেখ গিয়ে। বাইরের ঘরে সব বসে আছে।'

'অনিন্দ্য এসেছে নাকি? কোথায়?' আলমারি খুলে পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করলেন সরোজিনী, তারপর মাথার আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হাসির কয়েকটি উচ্ছল তরঙ্গকে বিছানার মধ্যে ঢেলে দিয়ে শীলাও চলল মার পিছনে পিছনে। যখন-তখন খিলখিল করে হাসলে ফুলদা বড় বিরক্ত হয়। যার-তার সামনে কড়া ধমক লাগায়। কিন্তু হাসি পেলে কেউ না হেসে পারে! তবু তো আগের চেয়ে আজকাল অনেক কম হাসে শীলা। আগে তেমন সাংঘাতিক রকমের হাসি পেলে মেঝেয় লুটোপুটি খেত। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে তক্তপোশের তলায় চলে যেত। চোখে জল না আসা পর্যন্ত হাসি তাকে ছেড়ে যেত না।

ফুলদা বলে, 'হাসিটা ওর এক রোগ। শীলা একটা আস্ত পাগল।' আহা, পাগল এ সংসারে কেই বা না! তোমাকেও তো লোকে পাগল বলে। গান-পাগল, সুর-পাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ধারের বসবার ঘরখানা একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে। ফুলদা গিয়েছে, মা গিয়েছে, দোতলা থেকে খবরের কাগজ হাতে বাবাও নেমে এসেছেন। সাহেব এসেছে খবর পেয়ে বাজারের থলি হাতে কয়েকটি কৌতূহলী ছেলে এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে।

শীলা আর ভিতরে ঢুকল না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। আর দেখতে লাগল। দেখবার মতই রূপ। কি সুন্দর! কি অদ্ভুত সুন্দর! ফর্সা আর লম্বা। লালচে চুল, সিঁদুরে ঠোঁট আর নীল রঙের চোখ। শীলা এ পর্যন্ত যত পুরুষ দেখেছে, জামাইবাবুদের আর দাদার যত বন্ধুদের দেখেছে, তাদের কারও সঙ্গেই এঁর মিল নেই। কি করে থাকবে? উনি তো এ-দেশের মানুষ নন! অনেক দূরের ইউরোপের মধ্যে সেই জার্মানী। কোথায় যেন দেশটা! ইউরোপের পুরো ম্যাপটা শীলার ঠিক মনে

পড়ল না। উত্তর-পশ্চিমে নীল সমুদ্রের মধ্যে লাল রঙের গ্রেট ব্রিটেন আর তার কোলে ছোট আয়র্ল্যাণ্ড দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মূল ভূভাগে ফ্রান্স-জার্মানীর অবস্থানটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। থার্ড ক্লাসে ইউরোপ তাদের পাঠ্য ছিল বটে কিন্তু শীলা ভালো করে পড়েনি আর ভূগোল তার মোটেই ভালো লাগত না। ভূগোলের দিদিমণির চোখা চোখা পরিহাস তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। কিন্তু কি হবে ইউরোপের ম্যাপ দিয়ে! সবুজ জার্মানী একেবারে তাদের বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। টিয়াপাখির মত দুটি লাল ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। এত কাছে দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের কোন সাহেবকে শীলা চোখে দেখেনি। ফুলদার সঙ্গে সিনেমায় দু-একখানা বিলিতী বইতে সাহেবদের ছুটোছুটি লাফালাফি দেখেছে, কিন্তু জীবন্ত সাহেব এই প্রথম। তাও যে-সে সাহেব না, রূপকথার রাজপুত্রের মত পরম সুন্দর সাহেব।

সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন, 'আয়। আর ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে চা আর খাবার-টাবার করবি আয়। অনিন্দ্য নাকি এক্ষুনি চলে যাবে।'

শীলা চমকে উঠে বলল, 'এক্ষুনি চলে যাবেন? ওঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নাকি?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'না রে, তা নিতে পারবে না। নীলু ওকে কেড়ে রেখেছে। এ বেলা আমাদের এখানে খাবে। আমার নীলুর তো ও গুণ খুব আছে! অল্প সময়ের মধ্যে অচেনা মানুষের সঙ্গে খুব ভাব করে নিতে পারে। যেন কত কালের বন্ধুত্ব।'

বাড়ির কর্তা আর চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সরোজিনী মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে লুচি বেলতে বসলেন। বাইরের ঘর থেকে কথাবার্তা আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। সরোজিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর মন বুঝি ও ঘরেই পড়ে রয়েছে? আচ্ছা, তুই যা। আমি একাই সব করে নিতে পারব।'

শীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুঁ, ও ঘরে পড়ে রয়েছে, তোমাকে বলেছে! আমাকে ছাড়া তোমার কোন্ কাজটা হয়, শুনি?'

সরোজিনী বললেন, 'তা ঠিক। আজকাল তোর হাতের চা ছাড়া বাবুদের অন্য চা পছন্দ হয় না। তুই পান সেজে না দিলে—'

কথা শেষ না হতেই বাইরের ঘর থেকে অনিন্দ্য নতুন জুতোর মচমচ শব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ম্যাক্স্‌কে তো ফুলদা এ বেলার জন্যে রেখে দিল। আমি তা হলে এখন যাই মা। হস্টেলে আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

সরোজিনী বললেন, 'তাই কি হয় বাবা! চা-টা কিছু মুখে না দিয়েই কি যেতে হয়! শীলা, তোর জামাইবাবুকে—অনিন্দ্যদাকে—একটা মোড়া এনে দে তো—বসুক এখানে। আমরা আমাদের বড় ভগ্নীপতিকে জামাইবাবু বলে ডাকি। আরও আগে ছিল দাদাবাবু। এখন আবার সেই পুরোনো চলন ফিরে এসেছে। কিন্তু যাই বল, জামাইবাবুর মত মিষ্টি ডাক আর হয় না।'

অনিন্দ্য শ্যালিকার এনে দেওয়া মোড়াটায় বসে হাসিমুখে চুপ করে রইল। কাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কান বদলায়, ভাষা বদলায়, মাধুর্যের আধারেরও বদল হয়। এই দু বছরের মধ্যে সে এ বাড়ির প্রায় ছেলের মত হয়েছে। জামাতার সেই দূরত্ব আর নেই। সম্বোধনটা আর কি করে থাকবে।

সরোজিনী তাঁর মেয়ে ইলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আদরের বউ হয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর। কৃষ্ণনগরে তাঁদের কাছেই আছে। এই প্রথম পোয়াতী। আর কয়েক মাস পরেই সরোজিনী তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন।

শীলা আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠছিল। এসব পুরোনো ঘরোয়া আলোচনায় তার আর মন নেই।

একটু ফাঁক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীলা জিজ্ঞাসা কবল, 'আচ্ছা অনিন্দ্যদা, আপনি ওঁকে কোথায় পেলেন?'

'কাকে?'

শীলা একটু হেসে বলল, 'আপনার ওই নতুন বন্ধুকে?'

অনিন্দ্যও হাসল, 'ও, ম্যাক্‌সের কথা বলছ? বন্ধুই বটে। দু দিনেই ও আমার পরম বন্ধু হয়েছে। জার্মান কন্‌সালেট অফিসে আমার একজন জানা-শোনা ভদ্রলোক আছেন।' তিনিই ওকে আমাদের হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ-দেশের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চায়, আলাপ-পরিচয় করতে চায়। টুরিস্ট হয়ে এসেছে। ইন্ডিয়া দেখবে। আপাতত বঙ্গ দর্শন। আমি ওকে বলেছি—দেশকে যদি দেখতে চাও, বড় বড় হোটেলে থেকে তার পরিচয় পাবে না। কলেজ-হস্টেলে থেকেও নয়। চল, তোমাকে আমি কলকাতা শহরের একটি আইডিয়াল ফ্যামিলিতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দিন কয়েক বাস কর। একটি পরিবারের ভিতর দিয়ে গোটা দেশের পুরো পরিচয় তুমি পেয়ে যাবে। যে-সে পবিবাব নয়। যেমন বনেদী, তেমনি—'

সরোজিনী লুচি ভাজবার জন্যে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

শীলা অনিন্দ্যকে একা পেয়ে হেসে বলল, 'আহা, আমাদের সামনে শ্বশুরবাড়ির খুব সুখ্যাতি করা হচ্ছে। আড়ালে গিয়েই তো নিন্দা করবেন! খোঁটা দেবেন দিদিকে। আমরা সব জানি।'

অনিন্দ্যকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা গেল না। ব্যস্ত প্রফেসর। দুটো

শিফ্‌টে পড়ায়। তারপর আবার হস্টেলের ছেলেদের খবরদারি করে। শ্বশুর-বাড়িতে বেশীক্ষণ বাস করবার তার সময় কই! ষোড়শী শ্যালিকার অনুরোধও তাকে ঠেলতে হয়। কাজের এমনি চাপ।

জামাইবাবুদের মধ্যে অনিন্দ্যকেই সবচেয়ে পছন্দ শীলার। ভারি আমুদে আর শৌখিন মানুষ। সেবার কোত্থেকে একটা হরিণ নিয়ে এসে উপস্থিত। আর একবার এনেছিলেন বিচিত্র বর্ণের এক জোড়া চীনা মোরগ। তার একটা মোরগ আর একটা মুরগী। কিন্তু এবার যা এনেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর এই সাদা রঙের নীল-চোখো প্রাণীটি সবচেয়ে সেরা। আচ্ছা, ম্যাক্‌স্‌ কথাটার মানে কি? কে জানে, কি মানে! শীলা লক্ষ করে দেখেছে, অনেক নামের মানেই অভিধানে মেলে না। সে মানুষের নামই হোক আর জায়গার নামই হোক। নামের মানে তুমি যা ভাববে তাই। নামের মানে তুমি যা মনে করবে তাই। ম্যাক্‌স্‌ কথাটার কোন মানে আছে কিনা, শীলা জানে না। কিন্তু ওকে দেখবার পর থেকেই ফুলদার সেই সাদা ময়ূরের গল্পের কথা মনে পড়ছে শীলার। ফুলদার ছেলেবেলার এক মেয়ে-বন্ধু নাকি ময়ূরভঞ্জের মহারাজার কাছ থেকে চমৎকার এক সাদা ধবধবে ময়ূর উপহার পেয়েছিল। কি বা তার পাখা, আর কি বা তার পেখম! আকাশে কালো মেঘ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পেখম ছড়িয়ে দিত। তাকে নিয়ে দাদার সেই সখীর সোহাগের অন্ত ছিল না। সাদা ময়ূর শীলা চোখে দেখেনি। কিন্তু পর পর দু দিন স্বপ্নে দেখেছে। আর আশ্চর্য, সেই সুখস্বপ্নের পর এক অপরূপ দিবাস্বপ্নের মত ম্যাক্‌স্‌ এসে উপস্থিত। ময়ূর কি সুখের বাহন?

অন্তত ফুলদার ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে। সকালে অন্তত তিন-চার ঘণ্টা ঝাড়া রেওয়াজ করে ফুলদা। কিন্তু আজ কোথায় গেল তার রেওয়াজ, কোথায় গেল কি। বসবার ঘর থেকে ম্যাক্‌স্‌কে একেবারে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসেছে ফুলদা। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে ফুলের টব। যে টবগুলিতে শীলা রোজ জল দেয়, গাছের শুকনো পাতা বেছে ফেলে। বড় বড় গাঁদা ফুল দেখে ম্যাক্‌সের কি আনন্দ! গাঁদা ফুল তো আর ওদের দেশে নেই! ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে এ ঘর, ও ঘর, একতলা, দোতলা, ছাদ। দেখিয়েছে ঠাকুরদার আমলের পুরোনো লাইব্রেরি। টুংটুং করে সেতারের একটু বাজনাও শুনিয়ে দিয়েছে এক ফাঁকে। ম্যাক্‌স্‌ দেখছে, শুনছে, হাসছে, আর শীলা যখন নানান কাজে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠছে-নামছে—দুটি নীল চোখ মেলে ম্যাক্‌স্‌ তাকাচ্ছে তার দিকে। কিন্তু শীলাকে অত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবার কিই বা আছে! সে তো আর দিদিদের মত অত সুন্দরী নয়! সে তো মেঘের মতই কালো! তার দিদিরা যদি এখানে কেউ থাকত, ও হয়তো তার দিকে ফিরেই তাকাত না! কিন্তু এখনই বা কি দেখছে এত? ও কি সারা

বাড়িটাকেই আকাশ ভেবেছে নাকি? আর সেই আকাশ-ভরা মেঘ দেখছে? মেঘ দেখলে কি ময়ূর খুশী হয়? ফুলদা তো তাই বলে।

বেলা প্রায় এগারটার সময় নীলাদ্রির সময় হল। সে রান্নাঘরের সামনে এসে বলল, 'শীলা, আমাদের আরও দু কাপ চা দে।'

সরোজিনী মাছের কালিয়া রাঁধছিলেন।

শুনতে পেয়ে ছেলেকে ধমকে উঠলেন, 'না, এত বেলায় আর চা নয় বাপু। আমার রান্না হয়ে গেছে। এবার তোমরা চান-টান করে খেয়ে নাও।'

নীলাদ্রি বলল, 'তাই নেব—আজ যখন বাজনা-টাজনা কিছু হলই না।'

শীলা সুযোগ পেয়ে বলল, 'কি করে হবে ফুলদা! আজ তো তুমি সেই সকাল থেকে নাচছ। বাজাবে আর কখন!'

নীলাদ্রি এগিয়ে এসে বোনের বিনুনি টেনে ধরল, 'কি, কি বললি? কে যে নাচছে তা আমিও দেখতে পাচ্ছি।'

শীলা দাদার হাত থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

সরোজিনী বললেন, 'কি এত গল্প করছিস রে ওর সঙ্গে? কোন্ ভাষায় কথা বলছিলি তোরা?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ভাষা নয় মা, ভঙ্গি। বেশীর ভাগ ভঙ্গি দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে। যৎসামান্য ইংরেজী জানে। যেটুকুও জানে, উচ্চারণ অপূর্ব! অবশ্য আমার উচ্চারণও ওর কানে অভূতপূর্ব শোনাচ্ছে। কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। তবু ওর কত কথাই না শুনে নিলাম! জান মা, কি সাহস! ইংরেজী জানে না, হিন্দী জানে না, উর্দু জানে না, এদিকে সঙ্গী নেই, সাথী নেই, টাকার জোরও তেমন নেই; শুধু মনের জোরে ফার ইস্ট টুর করে এসেছে এই ইন্ডিয়ায়। ওর ইচ্ছে, পৃথিবীর কোন জায়গা বাকি রাখবে না।'

সরোজিনী উনুনের ওপর থেকে কড়াটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ভালোই তো! হয়তো তুমিও একদিন যাবে।'

নীলাদ্রি একটু হাসল, 'আমি? ওকে দেখে অবশ্য আমার সেই ঘুমন্ত সাধ জেগে উঠছে। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়?'

শীলা বলল, 'এবার তোমরা নাইতে যাও ফুলদা। আমি বাথরুমে ঢুকলে শেষে যে মিনিটে মিনিটে তাড়া লাগাবে, তা চলবে না।'

স্নান তো করবে, কিন্তু সমস্যা হল ম্যাক্স্ পরবে কি। ওর ব্যাগ আর বিছানা সবই তো সেই হস্টেলে ফেলে এসেছে। নীলাদ্রি বলল, 'তাতে কি হয়েছে! ও আমার লুঙ্গি পরে চান করুক। নেয়ে উঠে আর ট্রাউজার্স নয়, আমার একখানা ধুতিই পরবে। শীলা আমার সেই নক্শী চুলপেড়ে ধুতিখানা বের করে রাখ তো। আর একটা ফর্সা পাঞ্জাবি।'

শীলা হেসে বললে, 'দাদা, তোমার পাঞ্জাবি কিন্তু ওঁর গায়ে ছোট হবে।'

নীলাদ্রি বলল, 'তা হোক। খানিকটা তো ঢাকবে। ধুতি-পাঞ্জাবিতে সাহেব বেশ আরাম পাবে। এখানে এসে ওর খুব গরম লাগছে মনে হচ্ছে।'

ফাল্গুনের মাঝামাঝিতেই এবার বেশ গরম পড়ে গেছে। বাড়ির দু-দুটো ফ্যান অচল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আর দেখা নেই।

শুধু সেতারে নয়, ফুলদার হাত সব ব্যাপারেই খোলে। সত্যিই ম্যাক্স্‌কে একেবারে বাঙালীবাবু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ওকে ধুতি পরা শিখিয়েছে, পাঞ্জাবির বোতামগুলি নিজের হাতে এঁটে দিয়েছে। মেয়েদেরই পুতুল খেলার শখ থাকে। কিন্তু ফুলদাকেও যেন হঠাৎ পুতুল খেলার শখে পেয়ে বসেছে। যে মানুষের স্বভাব অত গুরুগম্ভীর, যে মানুষ রাতদিন সেতার নিয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যেও যে এমন একটি ছেলেমানুষ লুকিয়ে আছে, তা কে জানত।

বড় ঘরের মেঝেয় আসন পেতে নীলাদ্রি ম্যাক্স্‌কে পাশে নিয়ে খেতে বসল।

সরোজিনী বলেছিলেন, 'টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করে দে। ও কি ওভাবে খেতে পাববে? ওর কষ্ট হবে। খাওয়াও হবে না।'

কিন্তু নীলাদ্রি নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'খুব পারবে মা। কতক্ষণ বা আছে! এলই যখন, বাঙালীজীবনের সব স্বাদ ওকে পাইয়ে দি। আমাদের কথা ওর চিরদিন মনে থাকবে।'

দেখা গেল, ম্যাক্সেরও তাতে আপত্তি নেই। এরই মধ্যে সে একেবারে নীলাদ্রির মন্ত্রশিষ্য হয়ে গেছে। সে যা করছে, ম্যাক্স্ তারই অনুসরণ করছে। চলা-ফেবা ওঠা-বসা সব লক্ষ করে করে দেখছে, আর প্রাণপণে তা নকল করবার চেষ্টা করছে।

শীলা ভেবেছিল, এত সব কাণ্ডকারখানা দেখে সে বুঝি হাসতে হাসতে মরেই যাবে। কিন্তু সামলানো যায় না এমন বেয়াড়া হাসি এই মুহূর্তে তাকে আর জব্দ করতে পারল না। পরিবেশিকার কাজ সে বেশ গম্ভীরভাবেই করে যেতে লাগল। ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি—সবই সাহেবের জন্যে বসে বসে রেঁধেছেন মা। সেই সঙ্গে রুটি-মাংসও করে রেখেছেন। কি জানি, যদি ওসব কিছু না খেতে পারে! খেতে পারুক আর না পারুক, সাহেবের উৎসাহের অভাব নেই। চামচে তুলে তুলে সব একটু একটু চেখে চেখে দেখছে। ভালো না লাগলে মুখ বিকৃত করছে।

বাবা এই সঙ্গে খেতে বসেননি। অফিস থেকে রিটায়ার করলে কি হবে, সেই দশটা-পাঁচটার অভ্যাসটি ঠিক আছে। ঠিক আগের সময়ের হিসেবে নেয়ে

খেয়ে এখন আর ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাস ধরেন না, কাগজ কি বই-টই কিছু একখানা নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তারপর দু-চার পাতা ওলটাতে না ওলটাতেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শীলার মনে আছে, খুব ছেলেবেলায় মাঝরাত্রে কি শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে বাবার এই নাকের শব্দ কানে গেলে কি ভয়ই না সে পেত! মার কাছে সরে এসে তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত।

খেতে খেতে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, ধুতি-পাঞ্জাবিতে ম্যাক্স্‌কে কেমন মানিয়েছে বল তো?'

সরোজিনী একটু হেসে বললেন, 'বেশ মানিয়েছে।'

নীলাদ্রি গম্ভীরভাবে বললে, 'অনিন্দ্য দত্তের ছোট ভায়রা বলে মনে হচ্ছে না?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার! তোর না আপন বোন? অনিন্দ্যের ভায়রা হলে তোর কি হয়?'

নীলাদ্রি বলল, 'তার চেয়ে তোমার সঙ্গে সম্পর্কটাই ভালো। একেবারে জার্মান জামাতা। চমৎকার অনুপ্রাস।'

বলতে বলতে নীলাদ্রি হো হো করে হেসে উঠল।

ম্যাক্স্‌ নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বলল, 'What's the fun?'

নীলাদ্রি বলল, 'Nothing, nothing. In our national dress you are looking like a typical জামাইবাবু।'

জামাইবাবু কথাটার মানে বুঝতে না পেরেও ম্যাক্স্‌ হাসতে লাগল। কিন্তু হাসির বদলে প্রচণ্ড রাগ হল শীলার। ছি, ছি, ছি—এ কি অসভ্যতা! সে কি সেই ছোট্ট খুকু আছে? কিচ্ছু বোঝে না? ফুলদার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। জীবনেও শীলা আর তার সঙ্গে কথা বলবে না।

বিকালবেলায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা জার্মান সাহেবকে দেখতে এল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শীলার বন্ধুও আছে। রীনা, দীপ্তি, বরুণা। স্কুলে একসঙ্গে পড়ত। রীনা আর দীপ্তি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। একজন আর্টস নিয়েছে, আর একজন সায়ান্স। আর বরুণা পেয়েছে দাম্পত্যজীবন। আর্টস আর সায়ান্সের মিক্স্‌ড্‌ কোর্স।

দীপ্তি বলল, 'ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন না ফুলদা?'

নীলাদ্রি বলল, 'আমি কিছু জানিনে দীপ্তি। ম্যাক্স্‌ বাওয়ার এখন ষোল আনা শীলার সম্পত্তি।'

শীলার আর সহ্য হল না। তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসবের মানে কি হচ্ছে ফুলদা? তুমি ওঁকে এক মিনিট কাছ-ছাড়া করছ না, আর বলছ আমার সম্পত্তি?'

নীলাদ্রি বলল, 'আহা, আমি তো তোর সামান্য প্রাইভেট সেক্রেটারি মাত্র! কি, তোর personal circus-এর ম্যানেজারও বলতে পারিস। জান বরুণা, প্রোপ্রাইট্রেস শীলা রয়ের কাছে দু রকমের টিকিট আছে। শুধু দেখলে দু আনা, আর কথা বলতে গেলে চার আনা।'

টিকিটের কথা শুনে তিন সখী খিলখিল করে হেসে উঠল।

রীনা বলল, 'আমরা কিছু কন্‌সেসন পাব না ফুলদা?'

শীলা মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে ফুলদার আর মুখ-দর্শন করবে না।

দীপ্তিরা ম্যাক্‌স্‌কে আড়াল থেকে দেখে-টেখে বিদায় নিল। কিন্তু নতুন বন্ধুকে নীলাদ্রি অত সহজে ছেড়ে দিল না।

সে বলল, 'অনিন্দ্যের হস্টেল থেকে তোমার বাক্স-বিছানা এক্ষুনি আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি এখানেই আরও ক'টা দিন থেকে যাও। যদি চাও তো আমরা দুজনে তোমার গাইডের কাজ করে দিতে পারি। পয়সা লাগবে না।'

ম্যাক্‌স্‌ আপত্তি তো করলই না, বরং খুশী হয়েই নীলাদ্রির আতিথ্য নিল। ফুলদার পাশের ঘরে ওর বিছানা পেতে দিল শীলা। জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখল। সুগন্ধি ধূপকাঠি জেবলে দিল। শুকনো শূন্য ফুলদানিটা জলে আর ফুলে ভরে উঠল।

নিজের বিছানা দোতলায় তুলে নিয়ে গেল শীলা। বাবা-মার পাশের ঘরে সে থাকবে। বড়দা ছোড়দা সপরিবারে একজন দিল্লিতে আর একজন চণ্ডীগড়ে। বাড়িতে এখন আর ঘরের অভাব নেই। কিন্তু একতলার ঘরগুলি খালিও বড় একটা থাকে না। ফুলদার গানবাজনার গুণী বন্ধুদের কেউ না কেউ এসে হাজির হন। ফুলদা সহজে কাউকে ছাড়তে চায় না।

ম্যাক্‌স্‌ যদিও গানবাজনা জানে না, কিন্তু দূর দেশের মানুষ তো! আর কত দূর দেশের খবর সে নিয়ে এসেছে! তাই বোধ হয় ফুলদার কাছে ওর এত আদর। গানবাজনা নিয়ে বেশী সময় কাটালেও ফুলদা যে শুধু গানবাজনাই ভালোবাসে, তা নয়। সে মানুষজন ভালোবাসে, ঘরদোর সাজাতে-গুছোতে ভালোবাসে, পাড়ার বউদিদের, বন্ধুর বউদের শাড়ির রঙ আর পাড় পছন্দ করে দিতে ভালোবাসে। সেই সঙ্গে ম্যাক্‌স্‌কেও ভালোবেসেছে দেখে শীলা খুব খুশী হল।

তাদের এই বাড়ি, তাদের এই পাড়া ম্যাক্‌সের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগে গেছে। যে মানুষের সকালে এসে বিকালে চলে যাবার কথা, সেই মানুষ পরদিন গেল না, তার পরদিনও গেল না, তার পরদিনও নয়। নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ও এখানে থেকে যাবে। যা আদরযত্ন পাচ্ছে, ওর বিশ্বপরিক্রমা এখানেই শেষ!' শীলার দিকে চেয়ে চেয়ে নীলাদ্রি হাসতে লাগল।

শীলা রাগ করে বলল, 'ফুলদা, ভালো হবে না কিন্তু! ফের যদি অমন কর, তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি হয়ে যাবে।'

আর কোন ভাইবোন তো এখন আর বাড়িতে থাকে না, ফুলদাই একমাত্র। সে একই সঙ্গে দাদা আর দিদি, সখা আর সখী।

সপ্তাহে দু-তিন দিন বাইরে টিউশনি করে ফুলদা। সেতারের টিউশনি। দু-চারজন ছাত্রছাত্রী বাড়িতে এসেও শেখে। বাকি সময়টা ফুলদা বাজায়। এখন তার আরও কাজ বেড়েছে। কাজ নয়, খেলা। ম্যাক্‌সের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। কোনদিন ক্যারম খেলে। কখনও বা খেলাচ্ছলে তাকে বাজনা শোনায়।

ম্যাক্‌স্ কি ফুলদার বাজনা বোঝে? এইসব বিদেশী সুর তার ভালো লাগে? ম্যাক্‌সের মুখের হাসি, চোখের উল্লাস দেখে মনে হয়, সত্যিই ও খুব উপভোগ করছে।

মাঝে মাঝে আবার রাগরাগিণীর নামও জিজ্ঞাসা করে ম্যাক্‌স্। 'What is this tune?'

ফুলদা জবাব দেয়, 'দেশ।'

ম্যাক্‌স্ তার বিদেশী জিহ্বা দিয়ে চেখে চেখে উচ্চারণ করে, 'ডেস।'

'What is this one?' সেতারের আলাপ শুনে ম্যাক্‌স্ আর একটি রাগের নাম জিজ্ঞাসা করে।

ফুলদা বলে, 'খাম্বাজ।'

ম্যাক্‌স্ অদ্ভুতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে নিজেই হেসে ওঠে।

শীলা একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ফুলদা, ওঁকে যে অমন করে রাগরাগিণীর নাম মুখস্থ করাচ্ছ, উনি কি তোমার বাজনা কিছু বুঝতে পারেন?'

নীলাদ্রি জবাব দিল, 'একটু একটু পারে বইকি! তোর চেয়ে ভালোই পারে। ম্যাক্‌স্ কত বড় বাজিয়ের দেশের লোক তা জানিস! কত বড় বড় কম্পোজার ওর দেশে জন্মেছেন। বিটোফেনের নাম শুনেছিস?'

নামটা যেন শোনা শোনা। শীলা ঘাড় কাত করে। আস্তে আস্তে বলে, 'উনি কি এখনও বাজান নাকি ফুলদা?'

নীলাদ্রি হেসে ওঠে, 'গ্যেটের সমসাময়িক ছিলেন, তিনি এখন আর নেই। কিন্তু তাঁর অমর সিম্ফনিগুলি রয়ে গেছে। আচ্ছা, তোকে একদিন রেকর্ড শোনাব। মোৎসার্ট, ভাগনার, শুবার্ট, শুম্যান সুরে সুরে সারা ইউরোপকে ছেয়ে দিয়েছেন।'

তাঁদের সেই সুর যেন এই মুহূর্তেও ফুলদা শুনতে পাচ্ছে। তার কথার সুরেলা আবেশ, মুখ-চোখের ভঙ্গির মুগ্ধতা দেখে শীলার সেই রকমই

মনে হল। তারপর ওইসব সুরকারের কথা নিয়ে ম্যাক্‌সের সঙ্গে ফুলদা আলোচনা আরম্ভ করল।

শীলা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল। তার তো অত বিদ্যা নেই যে, সব বুঝতে পারবে! ইংরেজী ম্যাক্‌স্ যে তার চেয়ে বেশী ভালো জানে, তা নয়। অমন দু-চারটে কথা, ভাঙা ভাঙা শব্দ শীলাও বলতে পারে। কিন্তু বলতে এত লজ্জা করে! একটা কথাও মুখ থেকে বেরোয় না। কি জানি, যদি উনি হাসেন! ফুলদা ওঁর সঙ্গে এত কথা বলে, কিন্তু ওঁকে বাংলা শিখতে বলে না কেন? বাংলা শেখায় না কেন? উনি যদি বাংলা জানতেন, কি চমৎকারই না হত! শীলা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারত গল্প বলতে পারত।

এর মধ্যে অনিন্দ্য এল আর একদিন খোঁজ নিতে। শীলাকে ডেকে বলল, 'কি ব্যাপার শীলাবতী? তুমি নাকি ম্যাক্‌স্ সাহেবকে একেবারে বন্দী করে রেখেছ! এক জোড়া নীল নেত্রকে কিছুতেই কালো চোখের আড়াল করতে চাইছ না! নীলাদ্রি ফোনে বলছিল।'

শীলা রাগ করে বলল, 'কি বাজে বাজে কথা বলছেন অনিন্দ্যদা! ফুলদাই তো ওকে নিয়ে রাতদিন মশগুল হয়ে আছে। রোজ বেড়াতে বেরোচ্ছে। আজ জু, কাল মিউজিয়াম, পরশু আর্ট এক্‌জিবিশন। আমাকে কি সঙ্গে নেয়?'

অনিন্দ্য চুকচুক শব্দ করে বলল, 'ভারি আফসোসের কথা! সত্যিই ভারি অন্যায়! তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নেওয়া উচিত। আর এই জার্মান টুরিস্টটিই বা কি' মনে কি কোন রস-কস নেই? আমি হলে তোমাকে ছাড়া বেড়াতে বেরোতামই না! ওই রাঙাবরন শিমুলফুলকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকলির হাতে হাত রেখে বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে পড়তাম।'

শীলা বলল, 'থাক, থাক। আপনার ওই মুখেই সব। বেরোবার কত সময় হয় আপনার!'

অনিন্দ্যদা মৃদু হেসে ফুলদার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ম্যাক্‌সকে সামনে রেখে ওঁদের মধ্যে ইংরেজীতে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হল। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংগীতে জার্মানী পৃথিবীকে অনেক দিয়েছে। কাণ্ট-হেগেলের দেশ জার্মানী, গ্যেটে-শিলারের দেশ জার্মানী, মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সের দেশ জার্মানী। আইনস্টাইনের দেশ জার্মানী। ম্যাক্‌স্ যেন তার নিজের দেশের প্রতিনিধি। তাকে লক্ষ্য করে দুজনের প্রীতি আর প্রশস্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সব কথা শীলা বুঝতে পারল না। কোন কোন নাম সে এর আগে দু-একবার শুনেছে। কিন্তু শুধু নামমাত্রই। আর কিছু সে জানে না। শীলা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, সে যেমন বুঝতে পারছে না,

ম্যাক্‌সেরও তেমনি সব কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। একখানা ছোট ডিক্‌শনারি আছে ম্যাক্‌সের পকেটে। ইংরেজী কথার জার্মান মানে আর জার্মান কথার ইংরেজী মানে তাতে আছে। ম্যাক্‌স্‌ বার বার পকেট থেকে সেই ডিক্‌শনারিখানা বার করছে। পাতা উলটে উলটে শব্দগুলি খুঁজে নিচ্ছে। তারপর তারিফ করার ধরনে বলছে, 'Oh, I see!' কখনও বা শব্দের অর্থে মজার সন্ধান পেয়ে হো হো করে হেসে উঠছে। কিন্তু সে হাসি অনেক বিলম্বিত। অনিন্দ্যদা আর ফুলদা তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

মুখে আঁচল চেপে শীলা সেখান থেকে সরে এল। কিন্তু আজ আর তেমন জোর হাসি তার পেল না। বেচারা ম্যাক্‌সের ওপর তার সহানুভূতিই হল। সে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছে, কিন্তু ভাষার দেয়াল টপকাতে পারছে না। শীলার মতই সে অসহায়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শীলা ভাবতে লাগল। কিন্তু ইংরেজী ভাষা না জানলেও ম্যাক্‌স্‌ অনেক কিছু জানে। কত দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসেছে। কত বিদ্যা শিখেছে। আর শীলা? সে তো কিছুই জানল না, শিখল না! থার্ড ক্লাসে দু-দুবার ফেল করে সে অভিমানে পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রইল। ভেবেছিল, প্রাইভেট পড়বে। পড়ে পড়ে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তাও আর হয়ে উঠল না। এদিকে তার সঙ্গে যারা পড়ত তারা কত এগিয়ে গেল। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তূ শীলার আর এগোনোও হল না, পৌঁছনোও হল না। সে কেবল পিছুতেই লাগল। দু-চার দিন গান নিয়ে চেষ্টা করল, ছেড়ে দিল। বাজনাও তেমনি।

ফুলদা বলল, 'তোর মন নেই।'

শীলা বলল, 'বেশ, নেই তো নেই।'

সে সরে এল মায়ের কাছে, মায়ের পাশে। চা করে, পান সাজে, বিছানা পাতে, রান্নাবান্নার যোগান দেয়। বেশ ছিল। সব আফসোস আর আক্ষেপ সংসারের কাজের মধ্যে চাপা পড়ে ছিল। হঠাৎ সব আজ দ্বিগুণ বেগে ফেটে বেরোল। শীলার মনে হতে লাগল, ছি, ছি, ছি—এ কি করেছে সে! নিজের হাতে নিজের সব পথ বন্ধ করেছে। কিছুই জানেনি, কিছু শেখেনি, কোন যোগ্যতা অর্জন করেনি।

হঠাৎ কেন যেন কান্না পেতে লাগল শীলার।

সরোজিনী এসে পিছনে দাঁড়ালেন, 'ও কি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিস? চুল বাঁধবিনে?'

শীলা পিছনে না তাকিয়েই বলল, 'বাঁধব। তুমি যাও মা।'

সরোজিনী বললেন, 'ওরা যে ডাকছে তোকে! আজ নাকি তোকে সঙ্গে

নিয়ে প্রিন্সেপ্‌স্‌ ঘাটে যাবে। যা না। জাহাজ-টাহাজ দেখে আসবি। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে তা হলে।'

শীলা মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি যাব না।'

অনিন্দ্যও এসে খানিকক্ষণ সাধাসাধি করল।

'ফ্রয়েলাইন রায়, হের বাওয়ার ডাকছে তোমাকে। তাকে নিরাশ ক'রো না, চল। ফ্রয়েলাইন মানে জান? কুমারী। আর ফ্রাউ তার পরের অবস্থা। আমাদের এইটুকু জানলেই হল। এখন চল যাই।'

কিন্তু শীলাকে কিছুতেই কেউ নড়াতে পারল না।

সেই রাত্রে শীলা স্বপ্ন দেখল, সত্যিই সে বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রিন্সেপ্‌স্‌ ঘাট থেকে প্রকাণ্ড এক জার্মান জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছে। সে জাহাজে আর কেউ নেই। শীলা আর প্রকাণ্ড এক ময়ূর। সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। কি সুন্দর আর কি সুন্দর! কিন্তু অত মানুষ-প্রমাণ ময়ূর কখনও হয়! শীলা আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল— ও মা, এ তো ময়ূর নয়, এ যে—। না, না, না—আমি বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব। ছি, ছি, ছি—সবাই কি ভাববে! কিন্তু যে যাই ভাবুক, জাহাজ আর ফিরল না। ভাসতে ভাসতে একেবারে মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে আরও দূরে, আরও দূরে। আর কি নীল সেই সমুদ্রের জল! এই নীলের আভাস দুটি চোখ আগেই নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই নীল সমুদ্র হঠাৎ ফেনিল হয়ে উঠল। আকাশে ঝড়ের আভাস। 'উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই ফেনায় ফেনা আর কিছু নাই।' তাদের জাহাজ সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে টলতে লাগল, দুলতে লাগল। শীলা তো ভয়েই অস্থির। সবসুদ্ধ ডুবে মরবে নাকি! কিন্তু নীল দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। সে চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কেন থাকবে? তার তো ঝড়ের সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজে করে যাতায়াতের অভ্যাসই আছে! সে কাছে এগিয়ে এসে শীলার হাত ধরল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমি তো আছি!' ছি, ছি, ছি—কি লজ্জা, কি লজ্জা! যদিও দেখবার মত কেউ নেই, তবু দুজনকে তো দুজনে দেখতে পাচ্ছে!

মায়ের ডাকাডাকিতে শীলার ঘুম ভেঙে গেল। সরোজিনী বললেন, 'সেই সন্ধ্যা থেকে কি ঘুমই না ঘুমোচ্ছিস!'

শীলা বলল, 'লম্বা একটা সিনেমার গল্প স্বপ্নে দেখছিলাম মা।'

সিনেমার গল্পই তো! ফুলদার সঙ্গে মাস কয়েক আগে যে ইংরেজী ছবিটা দেখতে গিয়েছিল শীলা, তাতেও এই রকম জাহাজ ছিল, সমুদ্র ছিল, ঝড় ছিল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় নায়িকা নায়কের—। ছি, ছি, ছি।

সারা সকালের মধ্যে ম্যাক্‌সের মুখের দিকে তাকাতে পারল না শীলা।

অন্য দিনের মতই সে ওকে চা দিল, খাবার দিল, কিন্তু চোখে চোখে তাকাতে পারল না। ম্যাক্‌স্‌ কিন্তু আগের মতই তার দিকে তাকাচ্ছে, হাসছে, এ কথা সে কথা বলছে ও। কি সুবিধে! একজনের স্বপ্ন আর একজন দেখতে পারে না, একজনের স্বপ্নের কথা আর একজন ভাবতেও পারে না।

শীলা কিন্তু বেশীক্ষণ ম্যাক্‌স্‌কে এড়িয়ে থাকতে পারল না। ফুলদাই সব মাটি করে দিল। শীলাকে ডেকে বলল, 'আজ কিন্তু ম্যাক্‌সের সঙ্গে তোর খেলতে হবে।'

শীলা বলল, 'আমি পারব না ফুলদা। কেন, তুমি কি করবে?'

নীলাদ্রি বলল, 'আমার পরশু রেডিও প্রোগ্রাম। দু দিন আমাকে দারুণ রেওয়াজ করতে হবে। কেন, ম্যাক্‌সের সঙ্গে কথা বলতে তোর অত ভয় কিসের রে? ছড়বেছড় ইংরেজী বলবি। ইংরেজী ম্যাক্‌সের কাছেও বিদেশী ভাষা, আমাদের কাছেও তাই। গ্রামার-ট্রামারের অত ধার না ধারলেই হল।'

শীলা মৃদু হেসে বলল, 'আমি পারব না ফুলদা। তোমরা পার। গ্রামার শুদ্ধ করেও বলতে পার, আবার ভুল করেও বলতে পার। আমার সবই আটকে যায়।'

নীলাদ্রি বলল, 'তা হলে বাংলাতেই বলবি। তোর কথা ও শুনতে খুব ভালোবাসে।'

শীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ!'

নীলাদ্রি বলল, 'সত্যি বলছি। তুই যখন কথা বলিস, ও কান পেতে থাকে। অর্থ দিয়ে কি হবে। ধ্বনিই ওর ভালো লাগে। সেদিন বলছিল, তোর গলার স্বব নাকি আমার এই ইন্‌স্ট্রুমেণ্টের মতই মিষ্টি। একেই বলে ভাগ্য। আমি বারো বছর ওস্তাদের বাড়িতে ধরনা দিয়ে, দু বেলা রেওয়াজ করেও যা করতে পারিনি আর তুই অশিক্ষিত পটুতায়—'

শীলা তাকে বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কি যে বল ফুলদা! শুধু আমার কথা কেন হবে—তোমার কথা, মার কথা, সবাইয়ের কথাই উনি অবাক হয়ে শোনেন। বিদেশী কিনা! বাংলা ভাষাটাই ওঁর কানে মিষ্টি লাগে।'

নীলাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে সেতারে একটু বাজিয়ে নিল, 'আ মরি বাংলা ভাষা! মোদের গরব, মোদের আশা!'

শীলা একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল।

নীলাদ্রি সেতার বাঁধতে শুরু করেছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'কি রে?'

শীলা তার বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল চাঁপার কলির রঙের না হোক সেই গড়নের আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'ফুলদা, একটা কথা বলব—রাখবে?'

'বল্ না! বেড়াতে যাবি? সিনেমায় যাবি?'

শীলা বলল, 'না। ওসব কিছু না। আমাকে ফের শেখাবে ফুলদা?'

'কি শেখাব?'

'তোমার ওই সেতার।'

নীলাদ্রি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, 'হঠাৎ যে এই সুমতি? আচ্ছা. আচ্ছা—শেখাব।'

শীলা এবার সামনে থেকে নীলাদ্রির পিছনে চলে আসে। তারপর দাদার পিঠে গাল ঠেকিয়ে বলে, 'আর একটা কথা। আমি আবার পড়ব। আমাকে কয়েকখানা বই কিনে দেবে ফুলদা? তিন-চারখানা কিনে দিলেই হবে।'

নীলাদ্রি আঙুলে মেরজাপটা পরতে পরতে বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা! তুই যদি সত্যিই ফের পড়তে শুরু করিস, তা হলে তিন-চারখানা বই তো ভালো, গোটা কলেজ স্ট্রীটটাই এখানে তুলে নিয়ে আসব।'

শীলা বেরিয়ে এলে নীলাদ্রি দোরে খিল দিয়ে বাজাতে শুরু করল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিঃসঙ্গ ম্যাক্স্ এসে আজ নিজেই শীলাকে ডেকে নিল। 'Come, no harm, no shame. Play and be happy.'

ক্যারম বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে মুখের ভঙ্গিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন টানল ম্যাক্স্।

শীলা হেসে সায় দিল। তারপর বোর্ডখানা নামিয়ে নিয়ে এল।

প্রথমে সরোজিনী খানিকক্ষণ বসে বসে দেখলেন। ম্যাক্স্ তাঁকেও ইশারায় খেলতে ডাকল।

সরোজিনী হেসে বললেন, 'না বাপু, ও খেলা আমি জানিনে। তাস-টাস হলে না-হয় দেখা যেত। তোমরা খেল. আমি একটু গড়িয়ে নিই।'

সরোজিনী চলে গেলেন।

ম্যাক্স্ হাঁ করে সেই বাংলা কথাগুলি শুনল। হাসল। তারপর শেষ দুটি শব্দ নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল. 'গড়িয়ে নি।' শেষে হেসে বলল, 'Well Sheela, will you be my interpreter ?'

ইনটারপ্রেটার কথাটার অন্য কোন অর্থ আশঙ্কা করে শীলা বলে উঠল, 'No, no, no.'

ম্যাক্স্ তার ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'You have learnt

only "no, no, no". And I have learnt "yes, yes, yes". Very good. Let us begin.'

খেলা চলতে থাকে। বোর্ডের ওপর টকাটক টকাটক গুটির শব্দ হয়। ও ঘরে সেতারে 'দেশ' রাগের রেওয়াজ চলে। এ ঘরে শীলা বিদেশীর সঙ্গে ক্যারম খেলে। এও আর এক ধরনের বাজনা। সেতারের চেয়ে কম মধুর নয়।

খেলায় ম্যাক্সেরই জিত হয় বেশী। আঘাতে আঘাতে গুটিগুলি ঠিক গিয়ে পকেটে পড়ে। শীলা খেলবে কি, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর চেয়ে বড় বিস্ময়, বড় রহস্য যেন আর নেই। কোথায় কোন্ দেশের মানুষ। শীলা সে দেশের ভাষা জানে না, ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, কিছুই জানে না। সেই অচিন দেশের অপরূপ এক মানুষের সঙ্গে শীলা নিজের ঘরে বসে ক্যাবম খেলছে। দু দিন বাদে এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এই মানুষটিরই বা সে কি জানে, কতটুকু জানে! ফুলদার কাছে শুনেছে, পশ্চিম জার্মানীর কোন্ এক শহবে থাকে। সে শহরের নাম ফুলদাই উচ্চারণ করতে পারে না তো শীলা! সেখানে বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে। না, স্ত্রী নেই। এত অল্প বযসে ওরা বিয়ে করে না। বাবার ছোটখাটো ব্যবসা আছে। ও নাকি একটা টেক্নিক্যাল স্কুলে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনোয তেমন মন নেই। এদিক থেকে শীলার সঙ্গে ওর খুব মিল আছে। পৃথিবীটাকে ও নিজের চোখে দেখতে চায়। শীলার যদি সাধ্য থাকত, সেও তাই চাইত। সেও অমনি কবে ঘুরে বেডাত। ম্যাক্স্ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু শীলা জানে না। কিন্তু এটুকু জানাও যেন বাহুল্য। এটুকু না জানলেও ম্যাক্স্কে যেমন আপন মনে হচ্ছে, তেমনি আপন মনে হত শীলার। বন্ধুত্বে কোন বাধা হত না।

বন্ধু! কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও যেন লজ্জা হয। সে কি ওর বন্ধু হবার যোগ্য! শীলা যে থার্ড ক্লাসের ওপরে আর উঠতে পারেনি! কোন গুণ-যোগ্যতাই যে আয়ত্ত করতে পারেনি সে! কিন্তু ম্যাক্সের তাকাবার ভঙ্গি, শীলার সঙ্গে তার মেলামেশার ইচ্ছা দেখে তো মনে হয় না, গুণ-যোগ্যতা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা আছে। শীলাকে দেখেই ও খুশী, তার কথা শুনেই ওর আনন্দ। শুধু দেখবার মত হওয়া আর শোনবার মত কথা কওয়া। যে বলে, 'তোমাকে এর চেয়ে বেশী কিছু আর হতে হবে না,' তার চেয়ে বড় আপন আর কে আছে!

কিন্তু না। আর একজন না চাইলে কি হবে, শীলার কি যা আছে তাই থাকলেই চলে? তার কি আরও জানবার, শোনবার, শিখবার, আরও যোগ্য হবার ইচ্ছা হয় না? যেমন ইচ্ছা করে সাজতে, ভালো শাড়ি পরতে, গয়না পরতে, সুন্দর করে চুল বাঁধতে, কাজল পরতে—তেমনি ইচ্ছা করে আরও

যোগ্য হতে। যোগ্যতার মানে তো পড়াশুনো? সবাই তাই বলে। গুণ মানে তো গাইতে জানা, বাজাতে জানা? যদি এমন কোন বর পাওয়া যেত, যাতে পৃথিবীর সমস্ত বই এক রাত্রের মধ্যে মুখস্থ হয়ে যায়—এমন বর যদি পাওয়া যেত, সমস্ত রাগরাগিণী তার গলায় এসে বাসা বাঁধে, আর ফুলদার মত তারও আঙুলের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সেতারের তারগুলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে! যদি এমন হত!

শীলাকে খেলায় হারিয়ে দিয়ে ম্যাক্স্ হো হো করে হেসে উঠল : 'You know nothing, you know nothing.'

হঠাৎ কি যেন মনে হল ম্যাক্সের। কি একটা কথা বলতে গিয়ে শব্দ-সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল ম্যাক্স্। তারপর লাইফ-বেল্টের মত বেরোল সেই ডিক্শনারি। হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল ম্যাক্স্ : 'Yes, joke, just the word. Joke, only joking, don't be sorry. Are you?'

দুঃখিত হবে কি শীলা, ম্যাক্সের সেই শব্দ হাতড়ানোর ভঙ্গি দেখে ওর ভিতরের হাসির সিন্ধু আবার উথলে উঠেছে। মেঝের ওপর প্রায় লুটোপুটি খেতে লাগল শীলা। খিল খিল খিল। কুল কুল কুল। জলপ্রপাতের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

ম্যাক্স্ও মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, 'I see! No sign of sorrow. The world is full of happiness.'

বেরিয়ে এসে শীলা গুনগুন করতে লাগল—জার্মানী, জার্মানী। ম্যাক্স্ ভারতের কথা অনেক জানে। কিন্তু শীলা কিচ্ছু জানে না। যদি জানত, তা হলে শীলা সেসব বিষয় নিয়ে ম্যাক্সের সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। এখন আর তার ভয় নেই। ওইরকম yes, no, very good করে সেও কথা চালিয়ে যেতে পারে।

একটা দেশকে চোখে দেখেও জানা যায়, আবার বই পড়েও জানা যায়। এই মুহূর্তে ম্যাক্সেব দেশকে তো আর চোখে দেখবার উপায় নেই শীলার, বইয়েরই শরণ নিতে হবে!

কোণের ঘরটায় ঠাকুরদার আমলের স্তূপাকার বই জমে আছে। শীলা চুপিচুপি এসে সেগুলি ঘাঁটতে লাগল। অনেক বইয়েরই খানিকটা খানিকটা উই আর ইঁদুরের পেটে গেছে। আরও অনেকগুলি ধূলিধূসর। আইনের বই, রোমের ইতিহাস, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, দামোদর গ্রন্থাবলী সব জাতি-বর্ণ-মর্যাদার শ্রেণিভেদ ভুলে একসঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু শীলা যা চায়, তা কোথায়?

মা এসে ধমক দিলেন, 'এই অবেলায় তুই আবার ওগুলো ঘাঁটতে গেলি কেন? কি চাস, বল্ তো?'

শীলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু না মা।'

'তা হলে চলে আয়, কিছুতে কামড়ে-টামড়ে দেবে। সেদিন একটা বিছে দেখেছিলাম।'

ফিরে এসে শীলা অগত্যা সেই পুরোনো স্কুল-পাঠ্য আদর্শ ভূপরিচয়খানাই খুঁজে খুঁজে বার করল। অনাবশ্যক বলে এসব বই তাকের ওপর তুলে রেখেছিল। ধূলি আর মাকড়সার জালের আড়ালে অনাদরে পড়ে ছিল বছরের পর বছর। শীলার কোমল হাতের স্পর্শে আজ সেই নীরস ভূগোল নতুন গৌরবে, নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠল, সিঞ্চিত হল কাব্যরসের ধারায়।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পাতা উলটে উলটে ইউরোপের মানচিত্র বার করল শীলা। সতৃষ্ণ চোখে তাকাল একটি বিশেষ দেশের ওপর। তার উত্তরে সমুদ্র। এই নীল সমুদ্রেই কি সেই স্বপ্নের জাহাজ ভেসেছিল?

সরোজিনী এসে ফের তাড়া দিলেন, 'গা-টা ধুবিনে? কি আবার পড়ছিস বসে বসে?'

'কিছু না মা।'

শীলা তাড়াতাড়ি ভূগোলখানাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল। যেন পরম নিষিদ্ধ এক নভেল। সমস্ত জার্মানী দেশটাকে সে যেন এমনি করে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে।

দিন দুই বাদে অনিন্দ্য এল খবর নিতে। 'কি, তোমাদের সেই জার্মান অতিথি কি পালিয়েছে, না আছে?'

নীলাদ্রি বলল, 'পালাবে কেন? পালালে জামিনদার তোমাকে গিয়ে ধরতাম না?'

অনিন্দ্য হাসতে লাগল। একটু বাদে বলল, 'তুমি তো কলকাতা শহরের কিছুই আর বাকি রাখনি, সবই ওকে দেখিয়েছ। কিন্তু শহরটাই তো আর দেশ নয়! একটা গ্রাম ওকে দেখিয়ে নিয়ে এসো। এখনও দেশ বলতে গ্রামকেই বোঝায়।'

নীলাদ্রি বলল, 'কিন্তু গ্রাম নিয়ে কি আমরা আর সত্যিই গর্ব করতে পারি? সেই 'স্নেহসুনিবিড় শান্তির নীড়ের' অস্তিত্ব কি আর আছে? স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এখন শুধুই স্মৃতি।'

চা-টোস্ট পরিবেশনের পর শীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের আলোচনা শুনতে লাগল।

অনিন্দ্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'যা হোক, তুমি তো আর কন্ডাক্‌টেড টুরের ভার নাওনি যে, বেছে বেছে শুধু ভালো জিনিসই

দেখাবে! ওকে সবই দেখতে দাও। তা হলেই এই দেশ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ইম্প্রেসন নিয়ে যেতে পারবে।'

গ্রাম দেখবার প্রস্তাব শুনে ম্যাক্স্ লাফিয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই যাবে। ইণ্ডিয়ায় এসে গ্রাম না দেখলে সে আর কি দেখল! এখানকার সভ্যতাই তো গ্রাম-সভ্যতা।

গ্রামের সঙ্গে তিন পুরুষের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই নীলাদ্রিদের। কিন্তু বাবার এক খুড়তুতো বোন আছেন বর্ধমান জেলার মদনপুরে। সেই পিসিমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়নি।

গেলে সেখানেই যেতে হয়।

নীলাদ্রি অনিন্দ্যকে বলল, 'তুমি যখন হুজুগটা তুললে, তুমিও চল।'

কিন্তু অনিন্দ্যের সময় নেই। তার অনেক কাজ। সে যেতে পারবে না।

যার কাজ নেই, যে যেতে পারে, তাকে কেউ বলে না। শেষ পর্যন্ত শীলা নিজেই এসে নীলাদ্রির কাঁধে গাল ঘষল। যেন এক কৃষ্ণসার হরিণী দেবদারু গাছকে আদর করছে।

'আমাকে নিয়ে যাও না ফুলদা!'

নীলাদ্রি বলল, 'তুই যাবি? বড় কষ্ট হবে যে! পারবি সহ্য করতে?'

'তোমরা যা পারবে আমিও তাই পারব।'

উপেনবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বাধা দিলেন। 'না, না—কোথায় আবার যাবি! যত সব বাজে হুজুগ!'

তিনি বাড়ি ছেড়ে নিজেও বেরোবেন না, ছেলেমেয়েরা কেউ বেরোতে চাইলেও তার পথ আগলে ধরবেন। এই পাড়াটুকুর বাইরে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা তাঁর কাছে অগম্য, বাসের অযোগ্য। সাপ-বাঘ-বিপদ-আপদে ভরা।

কিন্তু সরোজিনী শীলার সহায় হলেন। স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'অমন করছ কেন? এক দিনের জন্যে যেতে চাইছে, যাক না! সেখানে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিনয়বাবু আছেন, ঠাকুরঝি আছেন—অত ভয় কিসের তোমার?'

অনুমতি পেয়ে শীলা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যেন বর্ধমানের এক গ্রামে যাচ্ছে না, বিশ্বপরিব্রাজকের সঙ্গে সেও পৃথিবী-পরিক্রমায় বেরোচ্ছে।

ছোট স্টেশন। লোকজনের ভিড় নেই। প্লাটফর্মের বাইরে এসে নীলাদ্রি দেখল, মদনপুরে যাওয়ার বাস আছে, সাইকেল-রিকশা আছে। স্টেশন থেকে পিসিমার বাড়ি মাইল তিনেক দূরে। এগিয়ে নেওয়ার জন্যে পিসতুতো ভাই সুরেশ্বরও এসেছে।

কিন্তু ঝাপটানো বটগাছটার নীচে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। একটু আগে সনের আঁটিগুলি নামিয়ে রেখে গাড়োয়ান বিড়ি টানছে।

ম্যাক্‌স্‌ সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল—'What's that ?'

নীলাদ্রি তাকে বুঝিয়ে বলল, 'এ আমাদের দেশীয় যান, আদি আর অকৃত্রিম।'

ম্যাক্‌স্‌ এগিয়ে গিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসল। যেতেই যদি হয়, এই গাড়িতেই সে যাবে। বাসের ব্যবসা তাদের নিজেদেরই আছে। বাস সম্বন্ধে তার আর কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু গরুর গাড়ি জীবনে সে এই প্রথম দেখল। তাতে না চড়ে সে ছাড়বে না।

দেরি হবার আশঙ্কা, কষ্টের ভয় দেখিয়েও নীলাদ্রি তাকে নামাতে পারল না। ম্যাক্‌স্‌ বলতে লাগল, আর কেউ যদি নাও যায়, সে একাই যাবে।

গাড়োয়ান সবিনয়ে বলল, 'কোন কষ্ট হবে না বাবু, আসুন। ওপরে ছাপ্পড় আছে। নীচে আমি মোলায়েম বিছানা পেতে দেব। আপনাদের কোন কষ্ট হবে না।'

ম্যাক্‌স্‌কে তো আর একা ছেড়ে দেওয়া যায় না! বাধ্য হয়ে নীলাদ্রি আর শীলাও তার পাশে উঠে বসল।

কৌতূহলী চাষী-কামলারা চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তারা যুদ্ধের সময় সাহেব যে দু-একজন না দেখেছে তা নয়, কিন্তু গরুর গাড়ির ওপর সাহেবকে এই প্রথম দেখল।

সাহেবও তাদের দিকে উল্লাস আর ঔৎসুক্য-ভরা দুটি নীল চোখ মেলে রাখল।

ধুলো-ভরা কাঁচা রাস্তায় ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। রাস্তার দু দিকে দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ। মাঠ-ভরা রোদ। নীল আকাশের নীচে মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া।

নীলাদ্রি একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলাল। তারপর হেসে বলল, 'ইস, কি স্পীডেই যাচ্ছি আমরা! আমাদের দেশের অগ্রগতির সিম্বল।'

কিন্তু শীলা সে কথা ভাবছিল না। তার সেই স্বপ্নের জাহাজের কথা মনে পড়ছিল। সেই স্বপ্নের জাহাজ এই গরুর গাড়িতে এসে ঠেকেছে, সেই উত্তাল নীল সমুদ্র রূপ নিয়েছে এসে শূন্য শুকনো মাঠে। আশ্চর্য, তবু স্বপ্ন সফল। এমন পুরোপুরিভাবে কোন স্বপ্নই বোধ হয় আর ফলে না।

অনেকদিন আগে পাঠ্যবই থেকে মুখস্থ করা কবিতার একটি অংশ শীলা মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল,

> 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
> শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগরবিহঙ্গেরা
> নারিকেলের শাখে শাখে
> ঝড়ো বাতাস কেবল ডাকে—'

ম্যাক্‌স্‌ কান পেতে শুনছিল। হেসে বলল, 'Very sweet. Don't stop, go on.'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'এই দুপুর রোদে মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তোর মনে সমুদ্রের দ্বীপ ভেসে উঠল যে!'

শীলা মুখ নিচু করে বলল, 'এমনিই।'

নীলাদ্রি ম্যাক্‌সের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'This is from our Tagore's.' তারপর লাইন কয়েকটির অনুবাদ করে শোনাল।

ফেরার পথে শীলারা অবশ্য আর গরুর গাড়িতে ফিরল না; বাসে করেই স্টেশনে এল। কিন্তু যে গ্রামে মাত্র এক দিন তারা থাকবে ভেবেছিল, সেখানে তিন দিন কাটিয়ে দিয়ে গেল। বাড়িঘর আর বিশ্ব-ভ্রমণের কথা—সব ভুলে গিয়েছিল ম্যাক্‌স্‌। তিন দিন সে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে হইহই করে কাটিয়েছে। পুকুরে সাঁতার কেটেছে। পেয়ারা গাছে উঠে ডাল ভেঙে পড়তে পড়তে কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে। পুরোনো শিবমন্দির দেখেছে। দশ মাইল দূরে পাঁচ শ' বছর আগের মসজিদ দেখতে ছুটেছে সাইকেলে করে।

মাঝখানে এক দিন ছিল হোলি উৎসব। পিসিমার ছেলেমেয়েরা প্রথমে ভয়ে ভয়ে কাছে এগোয়নি। কিন্তু পরে একটু ইশারা পেয়ে সবাই এসে ম্যাক্‌স্‌কে রঙ দিয়েছে। আবীরে আবীরে প্রবালগিরির আকার নিয়েছিল ধবলগিরি। পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে শীলাই ছিল দলনেত্রী। ঘোমটা একটু তুলে সাহেবের এই রঙ খেলা দেখে নিয়েছে গাঁয়ের বউরা। ছেলেরাও বিদেশী অতিথির অভ্যর্থনার জন্যে সব সম্পদ এনে জড়ো করেছে। এক দিন দেখিয়েছে সাঁওতালদের নাচ, এক দিন কীর্তন, আর এক দিন যাত্রা-ভিনয়। পালার নাম সুভদ্রাহরণ। আসবার সময় ম্যাক্‌স্‌ বলে এসেছে, এমন গ্রাম আর এমন চমৎকার মানুষ সে আর দেখেনি। গ্রামবাসীরা বলেছে, সাহেবের স্বভাবও যে এমন মধুর হয়, তা তাদের ধারণা ছিল না। ভাষার মিল নেই, চালচলনের মিল নেই, তবু ম্যাক্‌সের মিশবার কোন বাধা ছিল না। তার তুলনায় ফুলদাকেই বরং ওদের কাছে দূরের মানুষ, কলকাতার ফুলবাবু মনে হচ্ছিল শীলার।

আসবার পথে বাসে আর ট্রেনে ওরা অনর্গল কথা বলতে বলতে এল। মাঝখানে ফুলদা। ডান দিকে ম্যাক্‌স্‌, বাঁ দিকে শীলা।

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাক্‌স্‌ কিছুরই নিন্দা করছে না। বলছে, এ দেশের সব ভালো।'

শীলা বলল, 'তা হলে এ কথা ওঁর নিশ্চয়ই মনের কথা নয়। সব দেশেরই সুখ্যাতি করবার জিনিসও থাকে, নিন্দা করবার জিনিসও থাকে।

ওঁকে জিজ্ঞেস কর না ফ্লুদা, সত্যিই আমাদের দেশের কোন্ কোন্ জিনিস ওঁর খারাপ লেগেছে!'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'তুই জিজ্ঞেস কর্ না! আচ্ছা, আমি তোর দোভাষীর কাজ করে দিচ্ছি। আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু।'

শীলা বলল, 'বেশ, দেব।'

নীলাদ্রি ম্যাক্সের সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরেজীতে আলাপ করে শীলাকে তার বঙ্গানুবাদ শোনাল।

'আমি বললাম, হে বিদেশী, শীলা দেবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, এ দেশের কোন দোষত্রুটিই কি তোমার চোখে পড়েনি? এ দেশের মেয়েদের গায়ের কালো রঙ, কালো চোখ, কালো চুল নতুন বলে তুমি না হয় পছন্দ করতে পার, কিন্তু এর কালোবাজার, আঁধারের মত কালো কুসংস্কার, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্তরে স্তরে অব্যবস্থা তুমি তো ভালো করে দেখনি! তবে শহরের নোংরা রাস্তা, বস্তির নোংরা জীবন তো কিছু কিছু দেখেছ! গাঁয়ের খানা-ডোবা-এঁদোপুকুরের সঙ্গে দীনদরিদ্রের জীবনযাত্রাও কিছু কিছু দেখে গেলে। আমরা চাই, তুমি মন খুলেই আমাদের সামনে চাঁদের উলটো পিঠের সমালোচনা করে যাও।'

শীলা বলল, 'উনি কি জবাব দিলেন?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বেশী জবাব আর কি দেবে? ইংরেজী ভাষাটা ওকে বেকায়দায় ফেলেছে। ম্যাক্স্ হিটলারের মত দেশের পর দেশ জয় করতে পারে, কিন্তু বিদেশিনী ভাষার পাণিগ্রহণ ওর পক্ষে সহজ নয়। তবু আমাদের বিদেশী বন্ধু মোটামুটি একটা জবাব দিয়েছে। ও বলতে চায়, দু-দিনের জন্যে এসে ও তো আর আমাদের দেশকে তেমন খুঁটে খুঁটে ক্রিটিকের চোখ নিয়ে দেখতে পারেনি! ও রিফর্মারও নয়, পলিটিসিয়ানও নয়। ও সাধারণ টুরিস্ট। ও আমাদের দেশকে দেখেছে পাখির চোখে। আর হয়তো কিছুটা আর্টিস্টের চোখে। জানিস শীলা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের এই টুরিস্ট ম্যাক্স্ও এক ধরনের আর্টিস্ট। সারা পৃথিবীটা ওর সেতার। আর দুটি মুগ্ধ চোখ ওর বাজাবার আঙুল।'

ম্যাক্স্ আরও গল্প করতে করতে চলল। ওর নানা দেশভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। পূর্ব জার্মানী ছাড়া আশেপাশে সব দেশ ও সাইকেলে ঘুরেছে। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে। পূর্ব জার্মানী ওর এক গোপন দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো। এদিক থেকে বাংলা দেশের সঙ্গে ওদের দুর্ভাগা দেশের মিল আছে। দুটি দেশই পূবে-পশ্চিমে দ্বিধাবিভক্ত। ম্যাক্স্ ধনীর ছেলে নয়, আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের। তাই এ দেশে সে প্লেনে চড়ে আসতে পারেনি; স্টীমারে আর ট্রেনে সব দেশের জল-মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে

এসেছে। পথে বিপদ-আপদ কম হয়নি। কিন্তু ওসব ভয় করলে কি আর পথে বেরোনো চলে? একবার ফার ইস্টের এক হোটেলওয়ালার মেয়ে তাকে বড় বিপদে ফেলেছিল।

ম্যাক্সের মুখে আর এক দেশের মেয়ের নাম শুনে শীলার মনে ঈর্ষার সূচা বিঁধল। 'কিরকম বিপদে ফেলেছিল ফুলদা?'

নীলাদ্রি ম্যাক্সের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে নিয়ে হেসে বলল, 'টাকা চুরি করেছিল।'

শীলা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ছি, ছি, ছি! মেয়েরা আবার চোর হয়!'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাক্স্ বলছে, হয় বইকি!'

ফুলদা বড় অসভ্য। শীলা জানলার দিকে মুখ করে বসে সবুজ গাছ-পালার মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিল।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই উপেনবাবু খুব একচোট ধমকে নিলেন। এ কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড! এক দিনের কথা বলে তিন দিন গিয়ে বাইরে কাটিয়ে আসা! তাদের জন্যে কি ভাববার কেউ নেই? দুশ্চিন্তায় ক'দিন ধরে তাঁর ঘুম হয়নি।

নীলাদ্রি ফিসফিস করে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিনে, না রাত্রে?'

কিন্তু আরও খবর আছে। সরোজিনী একখানা এয়ার মেলের চিঠি ম্যাক্সের হাতে দিলেন। কনসুলেট অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দু দিন ধরে পড়ে আছে চিঠিটা।

চিঠি পড়ে ম্যাক্সের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ম্যাক্স্? খবর কি?'

খবর সুবিধা নয়। ব্যবসায়ে দারুণ লোকসান যাচ্ছে। ম্যাক্সের বাবা টাকা আর পাঠাতে পারবেন না। সে যেন অবিলম্বে দেশে চলে যায়। ম্যাক্স্ শুধু বাপের টাকার ভরসায় আসেনি। তবু বাবার বিপদে তারও বিপদ।

ম্যাক্স্ কালই এখান থেকে চলে যাবে। সকালে যদি নাও হয়, কাল সন্ধ্যায় বোম্বে মেল তার ধরা চাইই।

শীলা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কি? এত হঠাৎ? এমন তাড়াতাড়ি? এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল, ম্যাক্স্ এসেছিলও এমনি আকস্মিকভাবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রের ওপর দারুণ রাগ হতে লাগল শীলার। অবুঝ অভিমানের সঙ্গে সে মনে মনে বলতে লাগল, 'এমন হবে জানলে আমি কিছুতেই বেড়াতে যেতাম না।'

ম্যাক্স্ তার জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে পরদিন সবাইকে বলল, সে গোড়ায় ভেবে এসেছিল, তিন দিনে কলকাতা সফর শেষ করে সে বিদায়

নেবে। কিন্তু তিন দিনের জায়গায় তিন সপ্তাহেরও বেশী কেটে গেছে, সে যেতে পারেনি। কি করে যে কেটেছে, তা সে টের পায়নি। যদি সময় থাকত, আরও তিন মাস সে এই শহরে বাস করে যেত। কিন্তু আরও তিন বছর থাকলেও সাধ মিটত না।

বেলা পড়ে এল। ম্যাক্‌সের গলা আরও করুণ শোনাতে লাগল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে নীলাদ্রি আর সরোজিনীকে বলতে লাগল, তার পথযাত্রীর জীবনে সে এখানে এসে যা পেয়েছে, তা আর কোথাও পায়নি। এমন ভদ্রতা, সৌজন্য—শুধু সৌজন্য নয়, এমন আত্মীয়ের মত ব্যবহার—কোথাও তার ভাগ্যে জোটেনি। এখানে এসে সে নিজের বাড়িকে ভুলে ছিল। এখানে এসে সে নিজের ঘরকেই ফিরে পেয়েছিল। এমন আদর, এমন যত্ন, এমন সেবা, এমন স্নেহ সে আর কোথাও পায়নি।

ম্যাক্‌সের কথাগুলি নীলাদ্রি তার মাকে অনুবাদ করে করে শোনাতে লাগল।

সরোজিনীর চোখ দুটি ছলছল করে উঠল।

নীলাদ্রি বলল, 'মা, তুমি কিছু বল।'

সরোজিনী বললেন, 'আমি আর কি বলব বাবা! তুই ওকে বল্, আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারিনি। আমার কতটুকুই বা সাধ্যি! ও যে ওর মার কাছে ফিরে যাচ্ছে, সেই আমার আনন্দ। ওকে বল্, আমি ওর এখানকার মা হয়ে চোখের জল ফেলছি আর সেখানকার মা হয়ে ওর জন্যে দিন গুনছি।'

এ কথার উত্তরে ম্যাক্‌স্ নিচু হয়ে সরোজিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। শ্রদ্ধা জানাবার এই ভারতীয় পদ্ধতি ম্যাক্‌স্ এরই মধ্যে লক্ষ করেছিল।

নীলাদ্রির সঙ্গে ঠিকানা-বিনিময়ের পর হঠাৎ তার খেয়াল হল, শীলা এখানে নেই। কখন উঠে নিজের ঘরে চলে গেছে। ম্যাক্‌স্ তার কাছে বিদায় নিতে গেল। এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শীলা জানলার শিক ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশের বাড়ির পুরোনো প্রকাণ্ড এক দেয়াল ছাড়া যদিও বাইরে আর কিছুই দেখবার নেই। ম্যাক্‌স্ তার দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দোভাষী নীলাদ্রি আজ আর তার সঙ্গে গেল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটু হেসে ম্যাক্‌স্ মৃদু কোমল সুরে ডাকল : 'Now, Miss No No No!'

শীলা চমকে উঠে ফিরে তাকাল। ওর মুখে হাসি নেই। কিন্তু ম্যাক্‌সের মুখে হাসি দেখে তার মনে হল, কি নিষ্ঠুর, ওরা কি নিষ্ঠুর! জার্মান জাত তো এই সেদিনও ফ্যাসিস্ট ছিল! চিরকালের যোদ্ধার জাত তো! নিষ্ঠুর তো হবেই!

ম্যাক্‌স্‌ তেমনি হাসিমুখেই বলতে লাগল : 'Miss No No No, what will you say today ? Please say something. I hope today you will say—yes. If not thrice, once at least.'

শীলা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। আজও ঠাট্টা! এখনও ঠাট্টা! সে না হয় ইংরেজী নাই বলতে পারে, কিন্তু ঠাট্টা বোঝবার শক্তি তো তার আছে! কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর!

ম্যাক্‌স্‌ চুপ করে আরও কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। 'Sheela !'

শীলা ফিরে দাঁড়াল। বিদেশীর কণ্ঠে ভিন্নরকমের উচ্চারণে নিজের নাম এই প্রথম শুনতে পেল শীলা। কিন্তু এই আহ্বানে সে কোন সাড়া দিল না। শুধু দুটি সজল কালো চোখ আর দুটি নীল ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদে ম্যাক্‌স্‌ আবার বলল, 'Sheela, I—I—I can't express me in foreign language. It has become my foe. Please allow me my mother-tongue.'

তারপর ম্যাক্‌স্‌ তার নিজের জার্মান ভাষায় একটানা বলে যেতে লাগল। সে কি গদ্য, না ওদের ভাষার কবিতা—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি ওর নিজের কথা, নাকি কোন মহাকবির কাব্যের আবৃত্তি—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি সাধারণ সৌজন্য, নাকি তীব্রতর অন্তর্ভেদী আগুনের মত, বিদ্যুতের মত প্রণয়ভাষণ—শীলা বুঝতে পারল না।

শীলার মনে হল, অনেক দিন বাদে অনেক চেষ্টা-যত্নের পর যদি জার্মান ভাষা সে কোনদিন শিখতেও পারে, তা হলেও কি একবার মাত্র শোনা এই অপূর্ব মধুর শব্দগুলি সে ফের খুঁজে বার করতে পারবে? পারবে না, পারবে না, পারবে না। দুর্বোধ্য ভাষার আড়ালে যে প্রেম-সম্ভাষণ আজ রচিত হল, বিস্মৃতির গভীর অতলে তা চিরকালের মত তলিয়ে থাকবে।

একটু বাদে ম্যাক্‌স্‌ বেরিয়ে এল। করকম্পনের আর চেষ্টা করল না। সে ওকে বাক্য দিয়ে ছুঁয়েছে, কাব্য দিয়ে ছুঁয়েছে, অন্তর দিয়ে ছুঁয়েছে। হাত দিয়ে ছোঁয়ার তার আর দরকার নেই।

দোরের সামনে ট্যাক্সি এসে হর্ন দিতে লাগল। শীলাকে ডাকতে এসে সরোজিনী থমকে দাঁড়ালেন। মেয়ে তার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছে। আর সেই প্রথম দিনের মত তার সর্বাঙ্গ দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এ কম্পন যে কিসের, তা তিনি আর পরখ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ম্যাক্‌স্‌কে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলাদ্রি তার নিজের ঘরে গিয়ে সেতার নিয়ে বসল।

সরোজিনী এসে তার কাছে দাঁড়ালেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মেয়ে তো উঠলও না, খেলও না! সেইভাবেই পড়ে আছে।'

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে স্মিতমুখে সেতারে আঙুল রাখল।

সরোজিনী ভ্রূ কুঁচকে উদ্বেগের সুরে বলতে লাগলেন, 'তুমি হাসছ! কিন্তু তুমিই বাপু সব নষ্টের গোড়া। তুমিই শুরু থেকে ঠাট্টা করে করে এই কাণ্ড বাধিয়েছ। এখন এই মেয়ে নিয়ে আমি কি করি!'

নীলাদ্রি মার দিকে তার প্রশান্ত দুটি চোখ মেলে ধরল। তারপর মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর আশ্বাসের সুরে বলল, 'কিছু ভেবো না মা। দু-দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে এর চেয়েও কত বড় বড় কথা তো আমরা ভুলি।'

গোপনে নিশ্বাস চেপে মনে মনে বলল, 'জীবনে কত বড় বড় ব্যথাও তো আমাদের ভুলে থাকতে হয়!'

সরোজিনী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজার পাট দুখানি নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে এলেন আসার সময়।

একটু বাদে ফের ধ্বনির তরঙ্গ উঠল। ও ঘরের একটি হৃদয়যন্ত্রের তালে তালে এ ঘরের একটি তার-যন্ত্র সারা বাড়ির আকাশে-বাতাসে গৌড়মল্লারে সুরটমল্লারে এক অন্তহীন কূলহীন বিষাদসিন্ধুর ঢেউ সারা রাত ধরে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

অদূরবর্তিনী

প্রভাত দেবসরকার

ঠিক ওভাবে পড়ন্ত রোদের আলোটুকু মুখের উপর এসে না পড়লে নিখিলেশ হয়তো খেয়ালই করত না। এমন কিছু বিশেষত্ব নেই ও মুখে। চেনা হলেও স্মৃতিকে আলোড়িত করবার মত এমন কিছু আকর্ষণীয়ও নয়। তবু মাথার উপর মাকড়সার জাল ট্রাম-তারের ভিড় ঠেলে ছুটে আসা আলোর স্পর্শটুকু অপূর্ব মনে হয়েছিল—পাশ থেকে চেনা মুখকে সহজেই চেনা গিয়েছিল। সুষমা!

সাহস করে নিখিলেশ নামটা উচ্চারণ করতে পারলে না। যদি সে না হয়, যদি পূর্ব-স্মৃতি ওর প্রবল না হয়? তা ছাড়া বেশ কয়েকটা বছরের কথাও। মনে থাকা সম্ভব না-ও হতে পারে।

সুষমাও মুখ ফিরিয়েছিল। যে ট্রামে সে উঠবে তার দেরি দেখে বুঝি বিরক্ত হয়েছিল। চোখাচোখি হতে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, পড়ন্ত রোদের আলোটা গা-ময় ছড়িয়ে পড়ল।

নিখিলেশ এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালে। বললে, "এখানে দাঁড়িয়ে?"

সুষমা আড়চোখে চারপাশ দেখে বললে, "তা হলে চিনতে পেরেছ? আমি মনে করি—"

"গায়ে-পড়া কোন অভদ্রসন্তান!" বুঝি একটু চিমটি-কাটা নিখিলেশের গলার স্বরটা।

"না, অনেক দিনের কথা তো! কবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে!" কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখায় সুষমাকে।

"কি জানি, আমার তো মনে হয় এই সেদিন। তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে গেল!" নিখিলেশ হাসলে।

"আবার যুদ্ধ চাও?" বেশ গম্ভীরভাবে সুষমা জিজ্ঞেস করলে।

"হলে ভালই হয়। আর ভাল লাগে না। বেশ ছিলুম কিন্তু সে সময়!" নিখিলেশ বললে।

"কেন, এখন কি কিছু খারাপ আছ? দেখে বোঝা যায় না।" সুষমা মৃদুস্বরে বললে।

"দেখে যদি বোঝাই যাবে তা হলে মধ্যবিত্তের ঘরে জন্মালুম কেন?

আর এত শিক্ষাই বা পেলুম তবে কি করতে?” কণ্ঠটা নিখিলেশ উচ্চ করলে। সুরটা ব্যঙ্গের।

সুষমা জিজ্ঞেস করলে, “কি করছ? যুদ্ধের চাকরিটা আছে এখনও?”

“থাকলে কেউ যুদ্ধ চায় আবার!” নিখিলেশ বললে।

“তা হলে? তোমার তো অ্যাব্‌সর্ব্‌ড্‌ হবার কথা হয়েছিল শুনেছিলাম!” সুষমা বললে।

“যুদ্ধের বাজারে অমন অনেক গুজব রটেছিল—গুজবে বিশ্বাস ক'রো না।” নিখিলেশ হেসে বললে।

“তা হলে আমরা চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও চলে এসেছ?” কি ভেবে যেন সুষমা হাসলে।

“একটু তফাত আছে; তোমরা ছেড়ে দিয়েছিলে, আমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল। ইউ রিজাইন্‌ড্‌, আই ওয়াজ রিট্রেঞ্চ্‌ড্‌!”

“তারপর কি করলে? ইন্‌কিলাব দাওনি? শুনেছিলুম, একটা কি যেন হাঙ্গামা হয়েছিল তখন—কেরানী ধর্মঘট!” স্পষ্ট ব্যঙ্গের সুর সুষমার কণ্ঠে।

নিখিলেশের কণ্ঠ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, “দিলে ভাল হত! চাকরিটা আবার পেতুম। মিছে মানের দায়ে ঘরের ভাত বেশী করে খেতে হল! কেঁচোরও ফণা গজায় সময় সময়!”

সুষমা হাসলে, “যাক, এখনও ঘরের ভাতই খাচ্ছ নাকি?”

“অত ভাত ঘরে ছিল না যে, আজও চলবে! সুশীলের মত তো নই, তুমি জান!” নিখিলেশের কথার মধ্যে খোঁচা ছিল।

সুষমা একেবারে চুপ করে গেল। মুখের কাঠিন্যে নিখিলেশ ভয় পেল। বাণ-বিদ্ধ পক্ষীর মত বেদনা-কাতর মুখটা।

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলে, “সুশীলের খবর কি? বহুকাল দেখা হয়নি।”

সুষমা উত্তর দিলে না, তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিখিলেশ একটু অবাক হল। সুশীল তার বন্ধু, ওর স্বামী। এককালে তিনজনে একসঙ্গে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পাশাপাশি বসে চাকরি করত। আজ সাত-আট বছর পরে হঠাৎ দেখা হতে যদি পুরোনো বন্ধুতার উল্লেখ করে কুশল প্রশ্ন করে, তা হলে অপরাধের কি করেছে নিখিলেশ? তা ছাড়া, অপ্রাসঙ্গিক নয় প্রশ্নটা।

নিখিলেশ চুপ করে রইল। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে রোদের আলোটা অনেক আগেই সরে গিয়েছিল। ওরা চুপ করতে মনে হল, আশপাশের রাস্তাঘাটের যানবাহনের সব শব্দ-কোলাহল হঠাৎ থেমে গেছে। পরস্পরবিরোধী আলাপের এমন ঐকান্তিক নৈঃশব্দ্য বুঝি বারবার ঘটে না।

সুষমার যেন ধ্যান ভাঙল। বললে, "চল কোথাও গিয়ে বসা যাক। গল্প করা যাবে।"

নিখিলেশ বললে, "না, আর বসব না—কাজ আছে।"

সহজ সুরে হেসে সুষমা বললে, "কাজ আমারও আছে, মিথ্যে গর্ব কর কেন! চল একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক।"

"বাড়ি ফিরবে না?" নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলে।

"বাড়ি ছাড়া আর কোথায় ফিরব, বল? কিন্তু তুমি ফিরলে তো আর কখনও দেখাই হবে না! নেহাত যখন দেখা হয়েছে—"

নিখিলেশ আপত্তি করলে না। সুষমার পিছনে পিছনে ভাল ছেলের মত চায়ের দোকানের সন্ধানে এগিয়ে চলল।

সদর রাস্তাটা থেকে একটা আধা-গলির এক প্রান্তে রেস্টুরেণ্টটা। মনে হয় না চা-পিপাসায় কাতর হয়ে কেউ কষ্ট করে এত দূর ছুটে আসে। শ্রীহীন ঘরের মধ্যে ততোধিক শ্রীহীন আসবাবপত্র, হীনতার চার দেওয়াল, তেল-কালি আর ধোঁয়ার রঙে বিবর্ণ।

চা-টা কিন্তু স্বাদহীন নয়। ঠোঁট ঠেকিয়ে সুষমা বললে, "বেশ করেছে কিন্তু চা-টা!"

অন্যমনস্ক নিখিলেশ চমকে উঠল। প্রথম যেদিন সুশীলের সঙ্গে একটা রেস্টুরেণ্টে চা খেতে ঢুকেছিল—মনে পড়ল সুষমার আপত্তির কথা। অনেক কষ্টে সেদিন সুষমাকে রাজী করানো গিয়েছিল। সুশীল মাঝখানে ছিল, তাই। তবু চায়ে মুখ দিয়েই সুষমা বলে উঠেছিল, "মা গো, কি স্বাদে লোকে খায়! চা, না সরবত! ভিড় দেখ!"

সুশীল বলেছিল, "আপত্তি তোমার চায়ে নয়, ভিড়ে—তাই বল! কিন্তু এর চেয়ে নিরিবিলি এ পাড়ায় আর একটিও নেই! বিশ্বাস না হয়, নিখিলকে জিজ্ঞেস কর।"

সেদিন নিখিলেশ ভারি অপ্রস্তুত বোধ করেছিল। ওদের মাঝখানে বিসর্গের মত অবস্থানটা কেমন অস্বস্তির ছিল। কেবল সুশীলের পীড়াপীড়িতে ওদের সঙ্গে ঘুরতে-ফিরতে হত।

আপত্তির সুরে নিখিলেশ বললে, "আমাকে আর এর মধ্যে টান কেন ভাই! এ পাড়ার কোন খবরই রাখি না!"

সুষমা চোখ ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে কি যেন বলেছিল। সুশীল আর কোন কথা বলেনি। সেদিন নিখিলেশের চা-টা বড় বিস্বাদ লেগেছিল।

সুষমার মুখের দিকে চেয়ে নিখিলেশ চায়ে মুখ ডুবিয়ে বললে, "সত্যি ভাল করেছে!"

"সস্তাও। ছ' পয়সা কাপ।" এ রেস্টুরেন্টের সঙ্গে যেন অনেক দিনের পরিচয় সুষমার।

"বেশ তো!" নিখিলেশ চায়ে চুমুকটা গভীর করে দিলে।

"আজকালকার বাজারে—" সুষমা কথাটা সম্পূর্ণ করলে না, দৃষ্টিটা বাইরে প্রসারিত করলে। হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

"আস্তে বল, মালিক শুনতে পাবে! পরের বারে এমন চা আর পাবে না!" নিখিলেশ বললে।

সুষমা চুপ করে থাকে খানিক।

নিখিলেশের মনে পড়ল, সেদিন চার আনা কাপ চায়ে সুষমার মন ওঠেনি। আজ সামান্য ছ' পয়সার চা-কে অমৃত জ্ঞান করছে! মানুষের কত পরিবর্তন হয়, সহজ মেলামেশায় ধরতে পারা যায় না।

নিখিলেশ বললে, "চায়ের তো তুমি বড় ভক্ত ছিলে না! আজকাল বুঝি চায়ের নেশা হয়েছে খুব?"

সুষমা হাসলে।

খানিকটা নিঃশব্দে কাটলে নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলে, "তারপব খবর কি বল তোমার, মানে তোমাদেব! সুশীল কি করছে? চাকরি তো?"

হঠাৎ বিবর্ণ চায়ের দোকানটা যেন ভেংচে উঠল। সুষমার কণ্ঠস্বর কখনও এত বিশ্রী শোনাবে, নিখিলেশ ভাবতে পারেনি।

অভিযোগের সুরে সুষমা বললে, "বার বার তোমার বন্ধুর কথা কেন যে জিজ্ঞেস করছ, বুঝতে পারছি না! তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই আর নেই—"

অবিশ্বাসের কিছু নেই, তবু মুখের দিকে চেয়ে নিখিলেশ খানিক থমকে গেল। সত্যি, অনেক আগেই তার খেয়াল হওয়া উচিত ছিল। বিয়ের পরও সুষমার সিঁথিতে সিঁদুর-রেখা নিখিলেশ দেখেছিল কয়েকবার। হয়তো নিয়মিত নয়, কিন্তু নিয়মমত নিখিলেশের নজরে পড়েছে। সহকর্মিণী হলেও ঐ একটি রাঙা রেখার টানে নিজেকে সুষমা অনেকখানি দূরবর্তী করতে সক্ষম হয়েছিল। পূর্বের অনেক চটুলতা সম্ভ্রমে স্তব্ধ হয়েছিল।

কাপের চা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু শূন্য পেয়ালাটা মুখের সামনে ধরে নিখিলেশ মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে বললে, "দুঃখিত! আমারই ভুল হয়েছে!"

সুষমা হেসে উঠল ছেলেমানুষের মত। মনে হল, অকারণ হাসি দিয়ে একটা গভীর বেদনাকে ঢাকতে চাইছে সে।

"ভুল! এরকম ভুল অনেকে আজকাল করে! তোমার দুঃখ করবার

কিছু নেই!" মাথার উপর হাত বুলিয়ে চুলটা ঠিক করতে করতে সুষমা বললে।

নিখিলেশ চুপ করে রইল। সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি, এমনটা কোনদিন ঘটবে। বহুদিনের অনেক জল্পনা-কল্পনায় একটি বিশেষ দিনের স্বপ্নকে ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ করেছিল। এ বিয়ে ওরা অনেক ভেবে-চিন্তে করেছিল। যত দূর শুনেছিল নিখিলেশ, অনেক হাঁ-নার পর সুষমা মত দিয়েছিল। সম্বন্ধ নেই মানে কি ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে? না, ওরা পরস্পরকে কেবল এড়িয়ে চলছে? হয়তো কিছু না, সাময়িক মতদ্বৈধ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে! আবার মিটে যাবে, অনুরাগে প্রীতিতে আবার উভয়ে উভয়ের আকর্ষণীয় হবে!

লক্ষ করে সুষমা বললে, "কি ভাবছ যেন!"

"কিছু না।" নিখিলেশ বললে, "আমার ভাববার কি আছে! জানতুম না—"

"জানলেও ভাবতে। নিশ্চয়ই দোষারোপ করতে, বন্ধুর হয়ে বলতে।" হঠাৎ সুষমা জিজ্ঞেস করলে, "আর কিছু খাবে? না-হয় চা দিক আর এক পেয়ালা।"

"না। বন্ধু আমার চেয়ে সে তোমার ছিল বেশী। আমার জানাজানিতে ভারি বয়ে যেত!"

"কিন্তু তোমার বন্ধুত্বের বোধ হয় বেশী জোর! স্বার্থ তো ছিল না কিছু—নেবারও কিছু না!" সুষমা দীর্ঘশ্বাসটা লুকোতে পারল না।

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি বললে, "যাক গে। বাদ দাও ও কথা। বিশ্বাস কর, এতটুকু কৌতূহল নেই আমার!"

"সত্যি নেই?" কেমন যেন খেদোক্তি করলে সুষমা, "তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও না?"

নিখিলেশ উত্তর দিলে না। ভারি বেকায়দায় সে পড়ে গেছে। কি দরকার তাদের স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের মধ্যে আসার! একসময় ওদের মনের মিলের জন্যে সে অনেক করেছে—অজান্তে নেহাত নির্বোধ বন্ধু-প্রীতিতে; তা বলে আজও সেই সরলতায় ওদের মনের মালিন্য মুছে ফেলতে এগিয়ে আসবে! কি ভেবেছে তাকে সুষমা? এতই সহজ!

"না থাকাই উচিত। না-ই বা তোমার কানে গেল সে নোংরামির খবর! সত্যি তোমার লাভ কি?" সুষমা মাথার চুলটা ঠিক করতে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নিখিলেশ আস্তে আস্তে বললে, "যাক। সত্যি বলছি, এতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যে খুশী হয়েছি, তাকে নষ্ট করতে চাই না। তুমি

তো জান, তার সঙ্গে আমার তোমাদের বিয়ের ক'টা মাস পরে আর দেখা হয়নি।”

সহসা সুষমা উত্তেজিত হয়ে উঠল, “দেখা করবে কি, মুখ থাকলে তো! জানি, জানাশোনা সবার কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়! যদি সাহস থাকে, লোক-সমাজে মুখ দেখাক না আবার!”

নিখিলেশ বাধা দিয়ে বললে, “জানি না, সে কি অমার্জনীয় ঘৃণ্য কাজ করেছে; তবু তোমাকে বলব এই মুহূর্তে তার কথা ভুলে যেতে, অন্তত তোমার সঙ্গে যতক্ষণ একসঙ্গে বসে এমনি একটা অপরিচিত জায়গায় চা খাচ্ছি।”

সত্যি বুঝি ভুলে যেতে চায় সুষমা স্বামীকে। সত্যি বুঝি ও প্রসঙ্গের অপ্রিয়তার কথা এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে। বললে, “যাক তবে। তারপর তোমার খবর বল। কোথায় চাকরি করছ? বিয়ে করেছ নিশ্চয়ই! ছেলেপুলে হয়েছে?”

নিখিলেশ বললে, “একসঙ্গে অতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। একটা একটা বল।”

সুষমা মুখ ঘুরিয়ে বললে, “ঐ তো বললুম! একটা একটা না-হয় জবাব দাও!”

নিখিলেশ বললে, “প্রথম, একটা মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করছি; দ্বিতীয়, বিয়ে করিনি। সুতরাং তৃতীয়টার কোন উত্তর নেই।”

“সে কি! এখনও বিয়ে করনি! তোমার বন্ধু তো তিনবার বিয়ে করেছে! নাঃ, তুমি সেই রকমই আছ!”

বলেই সুষমা যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কথাটা বলা তার উচিত হয়নি। আবার বন্ধুর কথা!

“খুব অন্যায় করেছি কি!” নিখিলেশ হেসে বললে, “করলে আর একজন হয়তো এমনিভাবেই রাস্তাঘাটে আমার গুণগান করে বেড়াত! বেশ আছি নির্জন হয়ে!”

সুষমা গুম হয়ে গেল। খানিক চুপ করে থেকে বললে, “আমরাই গুণগান করে বেড়াই তো!”

সান্ত্বনার স্বরে নিখিলেশ বললে, “কি মুশকিল, কথাটা অমন করে নিচ্ছ কেন? জিজ্ঞেস করলে, তাই বললুম।”

উঠে দাঁড়িয়ে সুষমা বললে, “নেওয়া-নিয়ির কিছু নেই। সত্যি কথাই বলেছ! বন্ধু বলে যা—কেউই হয়তো বিশ্বাস করবে না স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদে স্ত্রীর কথাটা! সুতরাং আমার পক্ষের কথাটা যে গুণগান হবে, এতে আর বিচিত্র কি!”

কি করে সুষমাকে পরিহাসের হাসিটুকু কেবল গ্রহণ করতে অনুরোধ করবে, নিখিলেশ ভেবে পায় না। হঠাৎ সামনে ছোট্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে সুষমার হাতটা ধরে ফেলে নিখিলেশ বললে, "রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি! বিশ্বাস কর, আমি কিছু ভেবে বলিনি।"

চোখের কোলটা বুঝি সুষমার ভারি হয়ে আসে। নিখিলেশের ধরা হাতটা ছাড়িয়ে নেয় না সুষমা—না-বসা, না-দাঁড়ানো অবস্থায় চুপ করে থাকে।

খানিক বুঝি নিজের কাজের জন্যে নিজেই বিমূঢ় হয়ে যায় নিখিলেশ, স্পর্শ করে এ আবার কি আত্মীয়তা প্রকাশ করলে! ছি, ছি।

ততক্ষণে হাতটা আপনি ছেড়ে গেছে। সুষমা বললে, "চল, বাইরে যাওয়া যাক।"

উঠতে উঠতে নিখিলেশ বললে, "সত্যি রাগ করনি? আমার অন্যায় হয়ে গেছে।"

সুষমা হাসলে, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে পয়সা বার করতে লাগল।

নিখিলেশ আপত্তি করলে, "আমি দিচ্ছি। থাক...."

সেই আগের মত লাগে কণ্ঠস্বরটা, "বা রে, তুমি দেবে কেন? রাস্তা থেকে নেমন্তন্ন তো করলুম আমি!"

যুদ্ধের বাজারে চাকরি করবার সময় কোন রেস্টুরেণ্টে গিয়ে তিনজনের মধ্যে কে আগে পে করবে, এই নিয়ে এমনি আবদারই করত সুষমা। শেষ পর্যন্ত পয়সাটা সুশীলই দিত। বড় অপ্রস্তুত বোধ করত নিখিলেশ। এমন দিন কখনও হয়নি, যেদিন তিনজনের হয়ে নিখিলেশ পে করেছে।

সুষমা হতে দেয়নি। যাতে নিখিলেশ না দেয় তার জন্যেই যেন আগে থেকে অমন উল্টো সুর তুলত সুষমা।

আজ কিন্তু নিখিলেশ কিছুতেই সুষমাকে পয়সা দিতে দিলে না। হোক সামান্য, তবু নিজে থেকে পয়সা খরচ করে নিরালায় বান্ধবীকে চা খাওয়ানোর মধ্যে বহুদিনের একটা কামনা যেন চরিতার্থ হচ্ছে। নিখিলেশ জোর দিয়ে বললে, "না, তুমি দিতে পারবে না। পয়সাটা আমিই দেব।"

ব্যাগের খোলা মুখটা টেনে বন্ধ করতে করতে সুষমা হেসে মৃদুকণ্ঠে বললে, "দাও!"

বড় রাস্তায় এসে সুষমা জিজ্ঞেস করলে, "কোন দিকে যাবে? আমি উত্তরে।"

নিখিলেশ বললে, "আমি দক্ষিণে। তুমি উত্তরে কোথায়?"

"পাকপাড়া। তোমরা তা হলে সেইখানেই আছ?" সুষমা বললে।

"কোথায় বল দিকি? আমার বাসায় তুমি কি কোনদিন গেছ?" নিখিলেশের প্রশ্নটা বড় অহেতুক মনে হয়।

"না চিনলে কি আর বলছি! সেই তো জগ্‌বাবুর বাজারের পিছন দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সোজা পূব দিকে!" সুষমা মিটিমিটি হাসলে। "ঠিক না?"

নিখিলেশ অবাক হয়ে বললে, "হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো মনেই পড়ে না সেখানে তোমার পায়ের ধুলো কোনদিন পড়েছে!"

"আমি কি এমন যে, আমার কথা তোমার মনে থাকবে!" সুষমা কৌতুক করতে চায়। কপট অভিমানও বুঝি সেই সঙ্গে।

"না, না—সত্যি তুমি কোনদিন গেছ আমার বাসায়?" নিখিলেশ উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করলে।

সুষমা তেমনি হেসে বললে, "না গেলে বলছি কি করে! আরও বলব—তোমার বাসাটা কেমন? একতলা, না দোতলা—ঘর কখানা?"

এতক্ষণে যেন রহস্যটা নিখিলেশ ধরতে পেরেছে। হো হো করে হেসে বললে, "তাই বল! আমি মনে করি—"

"কি মনে কর?" মুখটা কেমন বাড়িয়ে ধরে সুষমা বললে।

"সুশীলের মুখ থেকে শোনা! কি?" নিখিলেশ সগর্বে বললে।

আর কোন সাড়া করলে না সুষমা। শুধু ধরা পড়ার জন্যে নয়, অহেতুক কেমন যেন চপলতা প্রকাশ করে ফেলেছে, দেব না দেব না করে সেই আগুনেই হাত দিয়ে ফেলেছে।

"আমার বাসায় তুমি আসবে এমন ভাগ্য কি আমি করেছিলুম! সাহস করে কোনদিন বলতেই পারিনি!" নিখিলেশ নিজের মনে বলতে লাগল।

"সত্যি সাহস করে দেখলে এমন কিছু দুর্লভ ছিলুম না! মানুষের বাড়ি মানুষই যায়!" গম্ভীর কণ্ঠে সুষমা বললে।

"মানুষের মধ্যে হয়তো গণ্য ছিলুম না!" যেন একটা বহুদিনের আক্রোশের ঝাল মেটাচ্ছে এমনি বেঁকিয়ে নিখিলেশ বললে।

বাসে উঠতে উঠতে সুষমা বললে, "মানুষ হলে কি হবে, সাহস তোমার আজও নেই!"

থামা বাস আবার ছাড়তে যতখানি শব্দ করা উচিত ছিল তার চতুর্গুণ শব্দ করলে বাসটা। সুষমা আরও কি যেন বললে, নিখিলেশ শুনতে পেলে না। খানিক পরে উল্টো মুখে দক্ষিণ কলকাতাগামী বাসে উঠতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে সিঁড়ির উপর থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিখিলেশ—পিছন থেকে সুষমার শেষ কথাগুলো যেন আবার কানে বেজে উঠল, "মানুষ হলে কি হবে, সাহস তোমার আজও নেই নিখিল!"

কে জানে, কি সাহসের কথা বলে গেল! আর এতদিন পরে তার সাহস নিয়ে দরকারই বা কি সুষমার!

কয়েকদিন ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নিখিলেশ ভারি আলোড়ন করেছিল, তারপর রোজই অফিস ছুটির পর সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আশা করত, সুষমা বুঝি কখন এক ফাঁকে পাশে এসে দাঁড়াবে। পড়ন্ত রোদের গোলাকৃতি সেই রশ্মিটুকু এখনও তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। অনেকক্ষণ নিখিলেশ দাঁড়িয়ে থাকত; চেনা-জানা অনেকেই প্রশ্ন করত, কই, যাবেন না?

শেষ পর্যন্ত নিখিলেশ বাড়ি ফিরত, কিন্তু সুষমা আর কোনদিন বাড়ি ফিরবার জন্যে হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল না। অনেক সূর্যের আলো নিবে উদ্ভাসিত অনেক রশ্মি মুছে যেত। ভয়ে ভয়ে সেই চায়ের দোকানে গিয়ে নিখিলেশ কোনদিন সন্ধান করেনি। সত্যি বুঝি নিখিলেশের কোন সাহস নেই।

একদিন এমনি দাঁড়িয়ে আছে, মনে হল, কে যেন পরিচিত সুরে তার নাম ধরে ডাকছে, "নিখিল! নিখিল! এই নিখিল!"

নিখিলেশ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, কিছু দেখতে পেলে না। ডাকা-ডাকিটা তেমনি হতে লাগল। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মত নিখিলেশ কি করবে না-করবে ভেবে না পেয়েই যেন চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক পরে হাতটা সামনে থেকে কাঁধের উপর পড়তে নিখিলেশ চমকে উঠল। ভূত দেখা ভয়ে তার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। উচ্চকণ্ঠে সুশীল বললে, "কি রে, অমন করে তাকিয়ে কি দেখছিস? চিনতে পারছিস না?"

বিহ্বলতা কাটিয়ে নিখিলেশ বললে, "না চেনবার মত! ধরাচুড়ো সব পালটে গেছে!"

সুশীল হাসলে, "মানুষটা তো আর পালটায়নি!"

"বলা যায় না!" নিখিলেশ বললে।

সুশীল বন্ধুর কাঁধের উপর থেকে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বললে, "না রে, পালটাইনি। কোট-প্যান্টে সুশীল বোস খাঁটি এবং অকৃত্রিম। তারপর এখানে দাঁড়িয়ে? বাস, না ট্রাম?"

হঠাৎ নিখিলেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "এমনি।"

"কবিত্ব! জনসমুদ্র দেখছিস!" নতুন আনকোরা সিগারেটের টিনটা ঢাকনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখ কাটতে কাটতে সুশীল বললে।

নিখিলেশ উত্তর দিলে না। সামনে সিগারেট বাড়িয়ে ধরে সুশীল বললে, "নে! কোন দিকে যাবি?"

"কেন?" নিখিলেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে।

"তোকে নামিয়ে দিতুম।" ঠোঁটে সিগারেট চেপে সুশীল বললে।

এতক্ষণে যেন নিখিলেশের খেয়াল হল। চেয়ে দেখলে, অদূরে রাস্তার কিনারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।. গাড়ির মধ্যে একজন মহিলাকে যেন

দেখা যাচ্ছে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিখিলেশের হঠাৎ ঘৃণায় কেমন যেন জ্বালা করে ওঠে। সুষমার সেদিনকার ব্যবহারে, কথাবার্তায় বন্ধুটির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে তা তা হলে অসংগত নয়! সুশীল স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, সহধর্মিণীর মর্যাদা তাকে দেয়নি।

মুখে নিখিলেশ বললে, "তার দরকার হবে না।"

বন্ধুর সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে সুশীল বললে, "কেন? তোর আজও দেখি তেমনি লজ্জা আছে! উনি বাঘ-ভাল্লুক নন!"

তারপর একরকম জোর করে সুশীল নিখিলেশকে টেনে এনে নিজের গাড়ির মধ্যের সিটে বসিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সুশীল বললে, "কি রে, সেখানেই তো?"

ধরা গলায় নিখিল বললে, "হ্যাঁ।"

চেঁচিয়ে সুশীল বললে, "জাস্ট লাইক ইউ! ভদ্রলোকের এক কথা! বাসা বদলাসনি?"

"না।" উত্তরটা না দিলেই বোধ হয় নিখিলেশ ভাল করত। সুশীলের পাশে যে ভদ্রমহিলাটি বসে আছেন তিনি কি মনে করছেন! পথ থেকে আচ্ছা আপদ-বালাই কুড়িয়ে নিয়েছে!

গাড়ি গড়ের মাঠের নির্জন রাস্তায় পড়তে সুশীল বললে, "সেবা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। নিখিলেশ রায়, আমার বন্ধু, এককালে যুদ্ধের সময় আমরা সব পাশাপাশি বসে কাজ করেছি। আমাদের মধ্যে কাজের জন্য ওর খুব সুনাম ছিল অফিসে। এক্সেলেণ্ট কন্‌ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট পেত বরাবর।"

ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে সেবা নাম্নী ভদ্রমহিলা অগত্যা পিছন ফিবে হাত তুলে নমস্কার করলেন। নিখিলেশও হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল।

গড়ের মাঠের রাত্রির নির্জন প্রহরী কোন আলোক-বর্তিকা থেকে সহসা একটা আলোর রেখা ছুটে এসে ভদ্রমহিলার মুখে যেন আটকে গেল। তুলনা হয় না কোন, তবু যেন নিখিলেশের মনে হল, সে দেখতে ভুল করেছে। সুষমা তার চোখে ধোঁকা দেয়নি তো!

যেন কৌতুক করছেন ভদ্রমহিলা, বললেন, "আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

ভিতরে প্রায় তিনজনের জায়গা একলা দখল করে সিটের মধ্যে নিখিলেশ জড়সড় হয়ে রইল, মুখ তুলে কোন জবাব দিতে পারলে না।

সেণ্ট পল্‌স গির্জার কাছে এসে গাড়িটা কিছুক্ষণ থেমে রইল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে মুখ ফিরিয়ে সুশীল বললে, "চাকরি করছিস তো এখনও?"

অপ্রস্তুত কণ্ঠে নিখিলেশ বললে, "কি আর করব!"

"বেশ! ভালই আছিস, সরকারী চাকরি! আমাদের মত তবু ছোটাছুটি করতে হয় না!"

সামনের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। গাড়িটা নড়ে উঠল।

গলার স্বরটা যেন করুণ শোনাল, নিখিলেশ বললে, "না, বেসরকারী।"

সুশীল কি বললে, শোনা গেল না। সেবা দেবী বললেন, "দেখে গাড়ি চালাও। আর একটু হলে—"

সুশীল হেসে উঠল, "দেখেছ কোনদিন বিপদ ঘটতে? তোমাদের মিথ্যে ভয় কেবল!"

জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে গাড়িটা ঘুরতে যেতে নিখিলেশ বলে উঠল, "থাক, আমি এখানেই নেমে যাচ্ছি।"

সুশীল বললে, "কেন, বাড়িতে পৌঁছে দিই না?"

"না, এখান থেকেই যেতে পারব।" নিখিলেশ গাড়ি থেকে নেমে এল। সুশীলের পার্শ্বোপবিষ্টা মহিলাটির সামনে এসে হাত তুলে নমস্কার করলে। ভদ্রমহিলা হাসলেন।

প্রত্যাশা করলেও, কেন জানি না, হাসিটি নিখিলেশের খুব ভাল লাগল না। এখনও সে ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি, সুশীলের সঙ্গে ওঁর সত্যিকারের সম্বন্ধ কি? সেদিন সুষমার সঙ্গে দেখা হতে অত কথার পর বিশেষ একটি চিহ্নকে লক্ষ না করার জন্যে যেমন অপ্রস্তুত হয়েছিল, আজ তেমনি এই অপরিচিতাকে দেখা মাত্রই সেই চিহ্নের বৃথা সন্ধান করে মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল নিখিলেশ। দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অর্থ তবু বোঝা যায়, কিন্তু এমনি করে স্ত্রী-সম্পর্কবিবর্জিত কোন মহিলাকে নিয়ে অবাধে আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের চোখের উপর ঘুরে বেড়ানোর বাহাদুরি বোঝা যায় না। সুষমার কথাই ঠিক—অতি অধঃপাতে গেছে সুশীল, সমাজ-সংসার কিছুরই আজকাল ও ধার ধারে না। অবস্থা ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সুশীল বললে, "আসিস না একদিন উনিশ নম্বর কুইন্‌স পার্ক, বালীগঞ্জ!"

"যাব।" কেমন একটা ঈর্ষা যেন কণ্ঠতালু পর্যন্ত ঠেলে আসে নিখিলেশের।

তারপর বাড়িমুখো চলতে চলতে নিখিলেশ আবোল-তাবোল ভেবে অবাক হয়ে যায়। কোথায় ছিল সুষমা, কোথায় ছিল সুশীল, আর কোথায় ছিটকে পড়েছিল সে—কোন ঠিকই ছিল না পুরনো সম্বন্ধে তারা আবার কোনদিন পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে! ওদের বিয়ের পর অনেকটা ইচ্ছে করেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল নিখিলেশ। কোথায় যেন একটা

অব্যক্ত বেদনার ঘায়ে বড় সঙ্কুচিত হয়েছিল সে, বড় যেন ঠকে গিয়েছিল ওদের দুজনের মিলন ঘটিয়ে দিয়ে। সুষমার উপরই একদা অভিমানটা তার বেশী হয়েছিল, দুজনের মধ্যে সুশীলকেই কেন সে অধিক পছন্দ করলে! একদিন যে কথাটা মনে মনে রেখে তুষানলে দগ্ধ হয়েছিল, আজ তার জন্যে যেন কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করতে হয়। ভাগ্যিস সে এর মধ্যে আসেনি, ভাগ্যে কোন মিলনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েনি! এতদিন পরে ওদের কান্ড দেখে যেন মনে মনে নিখিলেশ খুশী হয়েছে। নিজেদের বড্ড চালাক মনে করত ওরা। ভাবত, বোকা নিখিলেশ। এইবার—

তবু ওদের ব্যাপারে নিজেকে না জড়িয়ে পারে না নিখিলেশ। ওদের সেদিনের পূর্বরাগের কথা মনে পড়ছে। মাঝখানে থেকে মিলনের সেতুর কাজ করেছে সে। সুশীলের চেয়ে সুষমারই যেন বেশী প্রয়োজন ছিল তার দূতালি। আশ্চর্য, এই ত্রয়ীর ব্যাপারে মনে কোন ক্ষোভ বা গ্লানি ছিল না নিখিলেশের সেদিন, বরং ওদের দুটিকে এক করে দেখার জন্যে তার চেষ্টা বা অধ্যবসায়ের ত্রুটি ছিল না। ওদের কানে কানে কথা কওয়ার এক পাশে চুপটি করে বসে থাকত সে। ওদের হাতে হাত রাখার মাঝখানে কোন বাধার সৃষ্টি করত না, পরন্তু নিজের খালি হাতটা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে খেলা করবার চেষ্টা করত। তারপর ওরা উঠলে ওদের সঙ্গে হাসি-রঙ্গে যোগ দিত অকাতরে। প্রিয়ংবদ নিখিলেশকে ওরা দুজনেই বড় পছন্দ করত।

বোকা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! মধ্যবর্তিনী যুবতী নারীকে নিয়ে যার মনে এতটুকু রাগ-বিরাগের, হিংসা-দ্বেষের সৃষ্টি হয় না, সে বোকা ছাড়া আর কি! হাঁদা গঙ্গারাম! সুষমা হাসলে গলে যেত, কিন্তু সেই হাসিতে নিজের মূল্যকে সে কোনদিন প্রত্যক্ষ করলে না! সুশীলের মুখ ভার দেখলে বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখত—এমনি সদাশয় মহৎ বন্ধু ছিল সে! হায় রে বন্ধুত্ব! কিছু সে প্রত্যাশা করেনি বিনিময়ে!

ভাগ্যের এমনি পরিহাস, সেই তারা আবার তার জীবনের কক্ষপরিক্রমায় দেখা দিয়েছে। দুঃখ করবে, না রাগ করবে? হাত দিয়ে ঠেলে দেবে, না হাত বাড়িয়ে কাছে টানবে? ওদের মনোমালিন্য ঘোচাবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠবে?

না, না—আর ওসবের মধ্যে নয়! ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক, যা পারে করুক! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি ওদের বিষিয়ে যায়, কি অধিকারে সে তাতে মধু ঢালবে! যা পারে, যেমনি পারে, ওরা বোঝাপড়া করুক! তার ভাবনার কি আছে—আর কেনই বা সে ভাববে!

শিথিল পদক্ষেপ সহসা কঠিন হয়ে ওঠে। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনকে নিখিলেশ দূর করে। বলে তার নিজের ভাবনা কে ভাবে তার নেই ঠিক!

সুশীলকে দেখে বোঝা যায়, বেশ একজন হোমরা-চোমরা হয়ে উঠেছে।

গাড়ি চড়বার ক্ষমতা যখন হয়েছে তখন খুশিমত বউ নিয়ে ঘর করবার অধিকারও আছে। একটা কেন, সাতটা বিয়ে করলেও কিছু বলবার নেই কারও। সুষমা যদি মানিয়ে ঘর করতে না পারে, সে দোষ সুষমার!

বন্ধুর জন্যে নিখিলেশের গর্ব অনুভব করা উচিত। দেখতে গেলে এমন কৃতী তার ক'টা বন্ধু আছে! সুষমারই দোষ স্বামীকে যদি বশে না রাখতে পারে। লেখাপড়া শিখে স্বাধীন জেনানা হয়েছিল তা হলে কি করতে!

মনে মনে কেমন একটা বাসনা জাগে। স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে সুষমার বোধ হয় খুব কষ্টে, হীন অবস্থায় দিন কাটছে। স্বাধীনতার সব অহঙ্কার ঘুচে গেছে। তাই যেন মনে হল কথাবার্তায়। চেহারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মুখের সে ডৌল, দেহের সে কমনীয়তা নেই। শিরার স্পষ্ট দাগ যেন দেখা গিয়েছিল উন্মুক্ত হাতের পিঠে। রঙটাও অনেক ম্লান মনে হয়েছিল।

সে তুলনায় দিব্যি আছে সুশীল। একটু কেন, বেশ মোটা হয়েছে সে; মাথায় টাক পুরন্ত মুখাবয়ব পুরিয়ে দিয়েছে। আরও যেন চটপটে হয়েছে। তার বয়েই গেছে সুষমা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অমন অনেক সুষমাকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা হয়েছে তার আজ।

কে জানে, মনে মনে নিখিলেশ এই পরিণতি আশা করেছিল কিনা। নিজে থেকে দূরে সরে গিয়েছিল বলেই যেন ওদের মধ্যে এমনটা ঘটেছে। বেশী মাখামাখির এই ফল হয়! বেশ হয়েছে!

তবু সুশীলকে দেখা থেকে আজ সুষমার কথাই যেন বার বার মনে পড়ছে নিখিলেশের। বার বার দুঃখে, বেদনায়, আঘাতে পা দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে। সেই কবে সুষমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সুশীলের কথা উঠতে নিজে থেকে থামিয়ে দিয়েছিল। স্পষ্ট কিছু না বললেও স্বামীর বিরুদ্ধে তার অনেক কিছু বলবার ছিল। সুশীলকে দেখে অন্তত তাই নিখিলেশের মনে হয়েছে।

নিজের মনে নিখিলেশ হেসে উঠল। আন্দাজে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিভেদের কতটুকু সে ধরতে পারে! মরুক গে, চুলোয় যাক! তার কি! কে সে!

প্রথমটা অত খেয়াল করেনি, নিজের চিন্তায় একরকম তন্ময় হয়েই ছিল নিখিলেশ। গলির মোড়ের আলোটা চিনিয়ে দিলে—সুষমাই তো! কিন্তু এখানে এই ভরসন্ধ্যেবেলায় কি করতে? তার কাছে নয় তো?

নিখিলেশকে কোন প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়ে সুষমা বললে, "এ পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়ি এসেছিলুম। তোমার বাসা তো এখানে, নয়?"

কি ভেবে নিখিলেশ বেশ গাম্ভীর্য সহকারে বললে, "শুধু এখানেই নয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখান থেকে তিনখানা বাড়ি দক্ষিণে। মানে সাত পা।"

"ও মা, তাই নাকি!" বুঝি খুব বিস্ময় প্রকাশ পায় না সুষমার কণ্ঠস্বরে। বললে, "এত কাছে!"

আশ্চর্য, এর পর আর কি জিজ্ঞেস করা উচিত হবে দুজনেই যেন ভেবে পায় না খানিকক্ষণ। বুঝতে পারলেও বক্তব্যটা উচ্চারণ করা যায় না। একটু যেন ঠোঁট চেপে নিখিলেশ বললে, "বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

সুষমা মাথা নাড়লে, "হ্যাঁ।"

এত কাছে পেয়েও নিখিলেশ মুখ ফুটে বন্ধুপত্নীকে অভ্যর্থনা করতে পারলে না। কেন যে সঙ্কোচ, নিখিলেশ বুঝতে পারে না।

নিজের মান রাখতে সুষমাই বরং নিজে থেকে বললে, "সময় থাকলে তোমার ওখানে যেতুম, সবার সঙ্গে আলাপ করে আসতুম··ইস্-স্! এত কাছে!"

"অতি নিকট তো চিরকাল অতি দূরই মনে হয়! সেখানে পৌঁছতে আবার সময়ও বেশী লাগে! কাজের মানুষের হাতে অত সময় সব সময় থাকে না।" নিখিলেশ টিপ্পনী কাটলে, "তা ছাড়া, আমার বাড়ি আসবার জন্যে যখন এ পাড়ায় আসনি তখন দরকার কি, ওটুকু কৈফিয়ত না-ই দিলে!"

"না, না—তোমার কাছে—" সুষমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল।

সুষমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিখিলেশ বললে, "বুঝেছি, বল এখন কোথায় যাবে? এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপ করা বিপজ্জনক।"

ধরা পড়ে নিজেকে একান্তভাবে ছেড়ে দিয়ে সুষমা বললে, "চল কোথাও বসি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা কিসের শিহরন অনুভব করলে নিখিলেশ। ভাবতে বুঝি ভাল লাগে, সুষমা তারই কাছে বিপদে ছুটে এসেছিল, আজ তাকেই তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

হোক, বিনামূল্যে আর কারও কোন উপকারে আসবে না নিখিলেশ। বেগার অনেক খেটেছে, আর নয়! যেই হোক—

হঠাৎ কঠিন সুরে নিখিলেশ বললে, "বাসা ছাড়া তো আর কোথাও বসবার এখানে জায়গা নেই! হুট করে এখন সেখানে যাওয়া উচিত হবে না।"

"সে কথা আমি ভাল করেই জানি। অহেতুক তোমার সংসারে শান্তি নষ্ট করবার আমার কোন ইচ্ছেই নেই, বিশ্বাস কর!" কথা কেড়ে নিয়ে ভগ্ন কণ্ঠে সুষমা বললে, "আমি এখানে কাজে এসেছিলুম—"

"তা হলে কি করবে?" নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলে, "দাঁড়িয়ে থাকবে?"

"তাড়িয়ে দিলে মানুষ কি করে!" সুষমা বললে, "যে পথে এসেছিলুম সেই পথে চলে যাব!"

তাড়াতাড়ি নিখিলেশ বললে, "কি মুশকিল! তাড়াবার কথা তোমায় কে বললে! এস, এস—"

"না, যেদিন তোমার কোন ভয় থাকবে না সেদিন যাব, আজ নয়।" সুষমা বললে হেসে।

"ভয় আবার কি?" নিখিলেশ প্রশ্ন করলে।

"কিছু না, এস।" সুষমা সামনে চলতে আরম্ভ করলে, "ট্রামে তুলে দাও তো!"

নিখিলেশ রাজী হল না। বললে, "বাড়িতে একটু কাজ আছে—এখনই পৌঁছতে হবে!"

স্পষ্টই রাগের কথা। সুষমা হেসে বললে, "কাজটা কি খুব জরুরী? এখনই না পৌঁছলে নয়?"

নিখিলেশ হাসলে না, কিন্তু এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "চল।"

খানিক চুপ করে এগিয়ে এসে একটা অস্পষ্ট গ্যাসের আলোর ছায়ায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে সুষমা বললে, "কোথায় যাই বল দিকি?"

নিখিলেশ হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও যেন সুষমা প্রশ্নটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারেনি, ওর জীবনে আজ এইটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন। আরও চমকে উঠল নিখিলেশ ছায়াবিষণ্ণ ওর মুখটা দেখে। মুহূর্তের মধ্যে সুষমা অনেকখানি বদলে গেছে, এতটুকু পথ অতিক্রম করতে শ্রান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে।

নিখিলেশ বললে, "কেন! যেখানে যাচ্ছি—"

সামলে নিয়ে সুষমা বললে, "কোথাও বসে কিছু খেলে হত। বড্ড খিদে পেয়েছে। এ পাড়ায় দোকান-পসরা জানি না তো!"

"চল। ট্রাম-লাইনের ওপারে একটা খাবার বড় দোকান আছে।" নিখিলেশ পথ দেখিয়ে এগিয়ে এগিয়ে চলল।

খাবার জন্যে নিখিলেশকে সুষমা অনেক পীড়াপীড়ি করলে, নিখিলেশ কিছুই স্পর্শ করল না। চুপটি করে সুষমার খাওয়া লক্ষ করতে লাগল। ঠিক এমনি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত যেন সে আর কোন যুবতীকে ইতিপূর্বে দেখেনি। নারীর এ রূপ যেন কোন পুরুষের দেখা উচিত নয়। কেমন একটা নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ, দীন ভাব দৃশ্যটার মধ্যে।

মুখের মধ্যে খাবার নাড়তে নাড়তে সুষমা বললে, "ভাবছ, কি বেহায়া! কিন্তু কি করব, অনেকক্ষণ থেকে আমার খিদে পেয়েছিল!"

নিখিলেশ বললে, "না, না—খাও, খাও! ভাববার কি আছে!"

কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল সুষমাকে বাড়ির দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসায়, এখন সেই দুর্বলতাকে সুযোগ বুঝে সুষমা উপহাস করছে তাকে সামনে বসিয়ে বিনা সঙ্কোচে খাদ্য গ্রহণ করে! বন্ধুত্ব

থাকলেও কেমন যেন বেহায়াপনা প্রকাশ পাচ্ছে ব্যাপারটায়। নিজের মনেই নিখিলেশ সঙ্কোচ বোধ করে। দৃশ্যটা আদৌ সুখকর নয়।

সুস্থির হয়ে পরম তৃপ্তিতে সুষমা বললে, "জানি, তুমি খাবে না। নেহাত টেনে না আনলে আসতে না, সে কি আর জানি না!"

ব্যস্ত হয়ে নিখিলেশ বললে, "খাবার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই খেতুম। শুধু শুধু কেন—"

গম্ভীর হয়ে সুষমা বললে, "বুঝেছি।"

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করলে, "বল কি বলবে এবার।"

কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখায় সুষমাকে, নিখিলেশের কথাটা বুঝি কানে যায় না। নিখিলেশ লক্ষ করতে সুষমা বললে, "হ্যাঁ, বলছি—"

খানিক নীরবে কেটে যায়, বক্তব্যটা সুষমা বোধ হয় ভুলেই যায়। তারপর হঠাৎ কৌতুক করে সুষমা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হয় না?"

কি উত্তর দেবে, নিখিলেশ ভেবে পায় না। সত্যি কথাটা বলতে তার কেমন যেন বাধে। ছোট্ট করে বললে, "না।"

আবার সুষমা চুপ করে থাকে, উভয়ের মাঝখানে নীরবতাটা কেমন অস্বস্তিকর মনে হয়। কেউ না কেউ অপরাধী যেন কারও কাছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে সুষমা বললে, "যাক তোমাকেই জিজ্ঞেস করি, এখন যদি আমি নিজের ব্যবস্থা করে নিই তা হলে কি খুব অপরাধ হবে?"

চুপ করে বিহ্বল দৃষ্টিতে নিখিলেশ সুষমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কথার অর্থ কি? স্বামীর ঘর যার হল না, নিজের ব্যবস্থা সে আবার কি করবে? আর যা-খুশি করলে তাকে বাধাই বা দেবে কে?

অসঙ্কোচে সুষমা বলতে লাগল, "একদিন আমাদের সব ব্যাপারে তুমি ছিলে সাক্ষী—আমাদের সব কিছুই তুমি জানতে। আজ তাই তোমায় বলছি—আমিও আর সহ্য করব না! কেন করব?"

নিখিলেশ চুপ। সেদিন যেমন নীরবে ওদের ব্যাপার লক্ষ করেছিল, আজও তেমনি নীরবে ওদের কথা শোনা ছাড়া তার এ ব্যাপারে কি কর্তব্য আছে ভেবে পায় না।

বিকৃত কণ্ঠে সুষমা বললে, "আমি নতুন করে বাঁচব। একটা ভুলের জন্যে সারা জীবন নিজেকে কষ্ট দেব কেন?"

নিখিলেশ তেমনি চুপ করে থাকে। সুষমার কোন কথাই আজ তার বোধগম্য হয় না। ওর কথার মধ্যে যেন কেমন একটা গলদ পাওয়া যায়। যত অপরাধই সুশীল করুক, সুষমার অপরাধও কম নয়।

লক্ষ করে সুষমা বললে, "কই, তুমি কিছু বলছ না?"

মিয়নো সুরে নিখিলেশ বললে, "আমি আর কি বলব! যা ভাল বোঝ, করবে! বাঁচা না-বাঁচা তোমার ইচ্ছে!"

কঠিন সুরে সুষমা দোষারোপের মত বললে, "কেন, তোমার কোন ইচ্ছে নেই?" তারপর অভিমানে ভেঙে পড়ল যেন, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "ও, বুঝেছি!"

হয়তো সুষমা ঠিকই বুঝেছিল। নিখিলেশ তাদের ব্যাপারে নিজেকে আর জড়াতে চায় না। আর তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় নিখিলেশের মাথাব্যথা নেই কোন।

তবু সুষমার প্রশ্নটা 'তোমার কোন ইচ্ছে নেই?' নিখিলেশকে কয়েকদিন বেশ অন্যমনস্ক করে রাখে। কি করবে সুষমা তার ইচ্ছের অনু-মোদন নিয়ে? সুষমার নতুন করে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিখিলেশের অনুকূল ইচ্ছেটা কতখানি সহায়ক হবে! সত্যিকারের কি বলতে চেয়েছিল সুষমা?

আশ্চর্য, এই নিয়ে এত চিত্তচাঞ্চল্য ইতিপূর্বে নিখিলেশ এতখানি বয়েসে আর কখনও বোধ করেনি। বার বার সুষমার কথাই মনে হয়। নানা ব্যাখ্যায় সুষমার কথাগুলো মনে নানা ভাবের সৃষ্টি করে। কেমন একটা লুকোচুরির ব্যাপার করছে সে। স্পষ্ট ডেকে সুষমাকে বলে দেওয়া উচিত, তার করবার কিছু নেই -যেমন দূরে সে এতদিন ছিল, তেমনি দূরেই থাকবে। তোমার যা প্রাণ চায়, তাই কর।

কিন্তু কি করে সুষমাকে সে কথা জানাবে! সেদিনের পর আর তো দেখা হল না! বোধ হয়, আর কোনদিন সাক্ষাৎই হবে না! বুঝেই সে সরে গেছে।

সুষমা কি আবার বিয়ে করবে? নতুন করে বাঁচার অর্থ তো তা-ই। যদি করে, নিখিলেশের আপত্তির কি আছে! সুশীল যদি স্ত্রী ত্যাগ করে আবার স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, সুষমাই বা স্বামী ত্যাগ করে নতুন স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না কেন? এর মধ্যে অন্যায়টা কি আছে! যে মিলন সার্থক হল না, তার তিক্ত স্মৃতি নিয়ে মানুষ কতদিন বসে থাকবে! সুশীলের কাজে যদি সমর্থন থাকে, সুষমার কাজে কেন সমর্থন থাকবে না! নিখিলেশ মনে-প্রাণে সমর্থন করবে। দেখা হলে বরং সুষমাকে উৎ-সাহিত করবে। কোন মানে নেই একদা-প্রেমের রোমন্থনে—সুশীল নিশ্চয়ই তার মর্যাদা রাখেনি।

কিন্তু সুষমার বদলে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুশীলের সঙ্গে নিখিলেশের দেখা হয়ে গেল। ট্রামে উঠবার জন্যে ঊর্ধ্বমুখ ভিড়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে, একরকম হাল ছেড়ে দিয়ে নিখিলেশ ফুটপাথের

এক ধারে সরে দাঁড়াল। ভিড় কমুক, তখন উঠবার চেষ্টা করা যাবে। যার নাম সেই রাত আটটা বাড়ি ফিরতে!

হঠাৎ গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়াতে নিখিলেশ বুঝতে পারেনি বা অত খেয়াল করেনি। গাড়ির ভিতর থেকে ডাক শুনে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। গাড়িতে সুশীল তার জন্যে দরজা খুলে অপেক্ষা করছে।

সুশীল বললে, "উঠে আয়।"

কেন জানি না, সেদিনের মত নিখিলেশ আপত্তি করলে না। নির্বিবাদে গাড়িতে উঠে পড়ল। যেন একটু স্বস্তিও পেল।

সুশীল যদি নিজে থেকে কোন কথা না তুলত, তা হলে নিখিলেশ কিছু বলত না। বলবার তার কিছু নেই, দর্শক ছাড়া সে আর কি হতে পারে! করবারও তার কিছু নেই।

পাশাপাশি বসে দুই বন্ধু চলেছে। গাড়িতে আর কেউ নেই। পিছনের সিটটা আড়ি-পাতা, উৎকর্ণ যেন।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে আটকে যেতে সুশীল বন্ধুর হাতে সিগারেট দিয়ে বললে, "সেদিন তোকে একটা কথা বলব বলব করে বলা হয়নি।"

বুঝতে পারলেও নিখিলেশ কোন সাড়া করলে না।

সুশীল বললে, "খুব অবাক হয়েছিলি তো?"

এবারও নিখিলেশ কিছু বললে না।

সুশীল বললে, "সুষমার সঙ্গে তোর দেখা হয় কখনও?"

নিখিলেশ বিকৃত কণ্ঠে বললে, "না।"

সুশীল অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলতে লাগল, "আজ বছর তিনেক ছাড়াছাড়ি হয়েছে! শী লেফ্ট মি!"

নিখিলেশ কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে না। মৃদু স্বরে বললে, "ও।"

খানিক নীরব থেকে একসময় সুশীল বললে, "ভালই হয়েছে! রাতদিন অশান্তি—মর্যাদা, আত্মসম্মান, নানানখানির চুলচেরা হিসেব কেবল! বিরক্ত·· শেষটা পৌরুষ, মনুষ্যত্ব নিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা! বেশী লেখাপড়া-জানা স্বাধীন জেনানা, বলবার কিচ্ছু নেই····তারপর, তুই বিয়ে করেছিস?"

"না।" নিখিলেশ তেমনি বিকৃত সুরে বললে।

"ভাল করেছিস! আর যদি করিস, কখনও কোর্টশিপ করে করিসনি! পরে পস্তাবি। আনবেয়ারেব্ল!"

"তাদের অপরাধ?" নিখিলেশ প্রশ্ন করলে।

হঠাৎ সুশীল কোন উত্তর দিতে পারলে না, জবাবদিহির মত শোনায় বন্ধুর প্রশ্নটা। আর একটা মোড়ে দাঁড় করিয়ে সুশীল বললে, "তাদের আর

অপরাধ কি, যত অপরাধ আমাদের! এমন একটা মেয়ে বিয়ে কর, বুঝবি!"

নিখিলেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, "তোমরাই বোঝ, আমার আর বুঝে কাজ নেই!"

সুশীল চুপ করে গেল। তারপর বন্ধুকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সুশীল বললে, "আমি আবার বিয়ে করছি, এবং আশা করি, এবার সুখেই সংসার করতে পারব!"

গাড়ি থেকে নেমে মোড়ের মাথায় খানিক স্তব্ধ হয়ে নিখিলেশ দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য মানুষের মন, আশ্চর্য তার খেয়াল-খুশি, সুখ-দুঃখ, ভালবাসা বোধ! এই সুশীল কি ছিল, অবস্থান্তরে কি হয়েছে! সুখ সুখ করে আপন খুশিমত ছুটে বেড়াচ্ছে। এক স্ত্রী ত্যাগ করে আর এক স্ত্রীকে নিয়ে পরীক্ষা করছে। লেবু নিংড়ে রস বার করার মত গৃহসুখের আস্বাদন ওর কাম্য।

সেসব কথা আর মনে না করাই ভাল। কোন মূল্যই নেই এখন আর সেসব দিনের। কেউ বিশ্বাসই করবে না, সুষমার জন্যে কতখানি পাগল হয়েছিল সুশীল একদিন। মানুষের মন, না কাঁচের চুড়ি—একটুতেই পুট করে ভেঙে যায়!

সেদিন হয়তো একটু চেষ্টা করলে এ ঘটনার এমন পরিণতি হত না। লজ্জা-সঙ্কোচকে আর একটু কাটাতে পারলে, মনের অব্যক্ত রূপকে আর একটু উন্মুক্ত করতে পারলে বোধ হয় সুশীলের মত অপৌরুষেয় কাজ করতে হত না। বন্ধুর জন্যে সেদিন সরে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ ভাল করেনি। উচিত ছিল নিজের দাবিটাও প্রকাশ করা। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় নিখিলেশের, কেবল তার জন্যেই যেন একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। সুশীলকে তারা দুজনেই ভুল বুঝেছিল। সে বুঝছে আজ, সুষমা বুঝেছিল বিয়ের পরেই।

সেদিন শেষবারের মত সুষমা বুঝি তারই ইঙ্গিত করে গেল, "তোমার কোন ইচ্ছে নেই?"

সত্যি, তার কোন ইচ্ছে নেই। দেখে-শুনে সে অবাক হয়ে গেছে। দোষগুণ বিচার করে কোন লাভ নেই। দুঃখ সে করবে কার জন্যে? দুজনের কেউই ছেলেমানুষ নয়, ভালমন্দ বোঝবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে!

না, দোষ নিখিলেশ কাউকে দেবে না, এক নিজেকে ছাড়া। দেখে-শুনে সে আগাগোড়া বোকা সেজে বসে ছিল। কেবল নিজেই ঠকেনি, সবাইকে সে প্রতারিত করেছে।

খানিকটা হনহন করে এগিয়ে এসে একটা গ্যাসপোস্টের সামনে হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি দেখে নিখিলেশ থমকে গেল। ছায়াই—কোন মূর্তি নয়।

আশ্চর্য, এমন ভুলও হয় মনের—মনে হল, আলোকস্তম্ভের নীচে যেটুকু ছায়া পড়েছে, তাকে ঘিরে সুষমা যেন চুপটি করে দাঁড়িয়ে পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে!

ভাগ্যে নিখিলেশ কোন সম্বোধন করেনি—ছায়াও কোন কথা কয়নি! আর একবার যেন অমন ভুল হল, খুব স্পষ্ট না হলেও কিছু দূর এগিয়ে এসে মনে হল, সুষমা তার সামনে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে—কিছু বলার জন্যে অধরোষ্ঠ তার কাঁপছে।

মনে পড়ল, কিছু দিন পূর্বে এইখান থেকে নিখিলেশ সুষমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। অভিমানে সুষমা বলেছিল, "তাড়িয়ে দিলে মানুষ কি করে!"

কিন্তু সত্যি সে তাড়ায়নি, তাড়িয়ে দেবার স্পর্ধা তার নেই। হয়তো ভীরু সে, হয়তো লাজুক সে, দাম্ভিক সে নয় কোনকালে। সুষমাকে আদর করে গ্রহণ করবার মন তার আছে। কোনকালে সে কথা সে স্পষ্ট করে বলতে পারল না।

বড় অবাক লাগে নিখিলেশের। আজ এসব কি দেখছে—কেবল সুষমার ছায়া কেন চোখের সামনে! কি মানে হয় এ ছায়াছবির!

বেশ কড়া শাসনই নিজেকে করলে নিখিলেশ। পরের ব্যাপার নিয়ে এ কি পাগলামি করছে! সুষমা তার কাছেই বা আসতে যাবে কেন? আর জায়গা পায়নি? ভীরু কাপুরুষ কোথাকার!

আজ বুঝি অবাক হবার শেষ নেই নিখিলেশের। নিজের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে সত্যিকারের সুষমাই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। ভূত-দেখা ভয়ে নিখিলেশ দু পা যেন সরে গেল। মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না।

সুষমা হেসে বললে, "আর তাড়িয়ে দেবার পথ নেই! একেবারে বাড়ি চড়োয়া!"

গম্ভীর হয়ে নিখিলেশ বললে, "কতক্ষণ?"

নিখিলেশের বোন বললে, "এই তো সবে আমরা এসেছি, আর তুমি কড়া নাড়লে!"

নিখিলেশ বোনকে কি ইঙ্গিত করলে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "সে আর বলতে হবে না, এসেই বাড়ির সবার সঙ্গে উনি বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন!"

হাতের ঘড়িটা খুলে বোনের হাতে দিয়ে নিখিলেশ বললে, "আমার ঘরে টেবিলে রেখে আয়।"

বোন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে নিখিলেশ চোখ তুলে আর সুষমার দিকে চাইতে পারলে না। মুখ নিচু করে বললে, "তাড়িয়ে দেবার কথাটা কি তুমি এখনও সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর?"

কাছে সরে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুষমা সলজ্জ কণ্ঠে বললে, "না।"

সঞ্জয় উবাচ

নবেন্দু ঘোষ

ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তাকাল। লোকটির মুখে চাপদাড়ি ও গোঁফ। ডান চোখটা নেই। নেই মানে একেবারে অক্ষিগোলক সমেত সবটাই উধাও সেখান থেকে। আলোটা ভালভাবে না পড়ায় ডান চোখের গহ্বরটাকে বড় বেশী অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা ভদ্রলোকের। ট্রেনের ঝাঁকুনিতেও অটল হয়ে বসে আছে লোকটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে। বাইরে শীতের রাতের কুয়াশাকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে আমাদের ট্রেন তখন প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে।

খড়্গপুরে যখন উঠলাম তখন ভদ্রলোক শুয়ে ছিল আমার দিকে পিছন ফিরে। মিনিট পাঁচেক আগে পাশ ফিরতেই আমাকে দেখে উঠে বসেছে ভদ্রলোক। আর তার পর থেকেই মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে আর কি যেন ভাবছে।

আমার অস্বস্তি লাগতে লাগল। এই একচক্ষুহীন মানুষটা হঠাৎ আমার মধ্যে কি দ্রষ্টব্য পেল?

ভদ্রলোক হঠাৎ হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার রাগ হল, ফস্ করে বলেই ফেললাম, "আমার দিকে তাকিয়ে আপনার হাসবার হেতুটা জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক হাসিমুখেই প্রশ্ন করলেন, "আপনি অজিত গুপ্ত?"

"তার মানে? আমি অজিত গুপ্ত হলেই বা আপনি হাসবেন কেন?"

"চিনি বলে। আমায় চিনতে পারছ না জিতু?"

মানে? ভদ্রলোক যে ডাকনামটিও জানে!

"কে আপনি?"

ভদ্রলোক হাসল, "আমার নাম সঞ্জয়—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয় নই—পাটনার সঞ্জয় সেন।"

চিনলাম। সঞ্জয় সেন। স্কুলে পড়তে পড়তে কি করে একবার ওর ডান চোখে ঘা হয়েছিল—সেপ্‌টিক হওয়ায় শেষে পুরো চোখটাই উপড়ে ফেলে দিতে হয়। অবস্থা খুব ভাল ছিল না সঞ্জয়ের। বাপ-মা ছিল না। কাকার ওখান থেকে খুব কষ্টে-সৃষ্টে পড়ত। আগে একটু ডানপিটে মত ছিল, কিন্তু ওই চোখটা খারাপ হবার পর থেকেই কেমন যেন মিইয়ে গেল।

কারও কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই সে গাল খেত—কানা কোথাকার! সবাই যে আড়ালে তাকে কানা সঞ্জয় ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকে না, তা সে জানত। তাই সে সবার থেকে একটু দূরে দূরে থাকা আরম্ভ করল। একা একা। তার সেই একাকিত্বের নির্জনতায় একমাত্র আমাকেই সে একটু আন্তরিকতার সংগে আহ্বান জানাত। খানিকটা বন্ধুত্ব তার সংগে যে ছিল, এ কথা আজও স্বীকার করি আমি—যদিও আড়ালে আমিও তাকে কানা সঞ্জয়ই বলতাম। স্কুলের পর থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ও গেল আর্টসে, আমি সায়েন্সে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল সঞ্জয়, তবু বি-এ পাস করে আর পড়ার ব্যবস্থা করতে পারল না সে। কাকার অবস্থাও ভাল ছিল না। চাকরির চেষ্টা শুরু হল তখন। আর ঠিক সেই সময় কানাঘুষো শুনলাম যে, সঞ্জয় নাকি প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম সুধা। আমাদের পাড়ার মেয়ে। আমার ছোট বোনের মতই। একদিন সুধাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "হ্যাঁ রে সুধা, সঞ্জয় নাকি তোকে ভালবাসে?" সুধা জবাব দিল, "আমাকে ভালবাসে ত কি এমন অপরাধ করেছে? বাসুক না!" আমি বললাম, "আর তুই?" সুধা খিলখিল করে হেসে বলল, "মরণ আর কি! আমি এই কানাকে ভালবাসব কেন?" সঞ্জয় সেনের বন্ধু হলেও সুধার কথাটা আমার পছন্দ হয়েছিল সেদিন। ভালবাসার ব্যাপারেও যেমন, তেমনি চাকরির ব্যাপারেও সঞ্জয় সেনের একটি চোখ তার বৈরিতা করল। সে আবিষ্কার করল যে, তার একটি চোখের জন্যই তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা সব কিছুই পৃথিবীর কাছে নিরর্থক হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম যে, সঞ্জয় নিরুদ্দেশ। তার কাকা দু-একদিন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে হাল ছেড়ে দিলেন। আমরাও কিছু-দিন সহানুভূতির সঙ্গেই কানা সঞ্জয়ের চর্চা করে অবশেষে তাকে ভুলে গেলাম।

তারপর আজ দীর্ঘ বারো বছর পরে—

বললাম, "আশ্চর্য, কতদিন বাদে দেখা হল!"

সঞ্জয় বলল, "আশ্চর্য হবার কি আছে জিতু?"

"এই হঠাৎ দেখা?"

"জীবন একটা পথ—ঘুরে-ফিরে এই পথে দেখা হতেও পারে—কোন কিছুতেই আশ্চর্য হয়ে লাভ নেই!"

"তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।"

"সত্যকে জানলে মানুষ আশ্চর্যবোধ করে না জিতু।"

সঞ্জয় কি শাস্ত্র থেকে আবৃত্তি করছে? প্রসংগান্তরে যাবার চেষ্টায় বললাম, "হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলে কেন?"

"একটা উদ্দেশ পাবার জন্যে। হ্যাঁ হে, আমার কাকাবাবু কেমন আছেন?"

অবাক হয়ে গেলাম, "বল কি হে, আর যাওনি বাড়ি?"

"না ত!"

"তোমার কাকাবাবু ত প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন!"

নির্বিকারভাবে সঞ্জয় বলল, "যাক, একটা চিন্তা কমে গেল।"

আমি না বলে আর পারলাম না, "কাকার মরার খবর পেয়েও তোমার একটু দুঃখ হচ্ছে না? এও কি তোমার সত্যবোধের ফল নাকি হে?"

সঞ্জয় হাসল, "সত্যকে জানবার চেষ্টায় আছি, কিন্তু এখনও জানিনি। যা শুনেছি আর যা পড়েছি তাই আওড়াচ্ছি। সত্যবোধ হলে হয়ত কিছু জিজ্ঞেসই করতাম না!"

হাসলাম, "খুব শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ছ বোধ হয়?"

সঞ্জয়ের মুখে একটু বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ল। বলল, "পড়ছিলাম, কিন্তু নিজের জন্য নয়। আমি যাঁর কাছে চাকরি করতাম তাঁর জন্যে।"

"কে সে?"

"একজন অন্ধ।"

কৌতূহল হল। বললাম, "অন্ধ? কি চাকরি করতে তাঁর ওখানে?"

সঞ্জয় বলল, "সেক্রেটারির কাজ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সঞ্জয়ের শেষে যে কাজ ছিল।"

"হেঁয়ালি ক'রো না—খুলে বল সঞ্জয়।"

সঞ্জয় বলল, "সেক্রেটারির কাজ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সঞ্জয়ের আমায় বলা যায় কিনা। তারপর সে হেসে বলল, "তা হলে একটু ধৈর্য ধর—সিগারেটটা ধরিয়ে নিই।"

আমাকে একটা দামী সিগারেট দিয়ে সঞ্জয় নিজেও ধরাল, কম্বলটা আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল :

আমি আজ যা বলব তা শুনে তুমি হয়ত আমার ওপর রাগ করবে; হয়ত ভাববে যে, আমি একটা পাপিষ্ঠ। পাপপুণ্যের সংজ্ঞা এখন তোমার কি তা আমি জানি না জিতু. তবে এ নিয়ে আমাদের দুজনের মতের মিল যে হবে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তবে আমার তরফ থেকে এইটুকু অকপটে বলতে পারি যে, আমি একটা একচক্ষুহীন মানুষ। মুখবন্ধকে গুরুতর শব্দ প্রয়োগে গুরুগম্ভীর করে তুলে যে পরিমাণ কৌতূহল আমি তোমার মধ্যে সৃষ্টি করছি সেই পরিমাণ চমকপ্রদ কাহিনী তুমি আমার কাছে পাবে কিনা, জানি না। কিন্তু কাহিনী মানে ত শুধু ঘটনা নয় জিতু, কাহিনী মানে একটি উদ্ঘাটন—একটি সত্যের প্রকাশ। যদি সেটুকু পাও তা হলেই বলা আমার সার্থক হবে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে জিতু? আমার ডান চোখটা নষ্ট হয়ে

গেল। সবাই হাসত আড়ালে। একমাত্র তুমিই খানিকটা প্রীতি পোষণ করতে। অবশ্য তুমিও যে আড়ালে এক-আধবার হেসেছ তাও আমি জানি। লজ্জা পেও না—আজ বুঝি যে, তোমাদের কারও দোষ নেই—তোমরা সবাই মানুষ। আজ বুঝি যে, মানুষ শুধু মানুষের বহিরঙ্গটাই বড় করে দেখে। প্রাকৃতিক বিকৃতিকে মানুষ ঘৃণা করে, করুণা করে, উপহাস করে, কিন্তু ভালবাসে না কখনও। মানুষের দেহ আর আত্মা বলে দুটি কথা আছে। আত্মার হিসেবে নাকি আমরা সবাই এক বর্ণ, এক গণ, এক ওজন। কিন্তু এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। মায়া শব্দের অর্থ আগে বুঝতাম না; পরে বুঝেছি যে, তা সত্য। শিক্ষা, বুদ্ধি, তপস্যাকে ব্যর্থ করে ওই দেহের স্তরেই এনে বানচাল করে। ওই মায়ার প্রভাবের অমৃতকলস ছেড়ে কৃমিকীট-ভরা নর্দমায় এসে মুখ থুবড়ে পড়তেই বেশী ভাল লাগে।

ছোটবেলা থেকেই আমি এই বোধ সমেত বড় হয়ে উঠেছি। আমার এই উপলব্ধিকে বদলে দেবার মত একটি ঘটনাও তখন ঘটেনি। ভাল ছাত্র ছিলাম, এ কথা তোমার হয়ত মনে আছে। বি-এতে দর্শন ও সংস্কৃত ছিল, ডিস্টিংশনে পাস করেছিলাম। কিন্তু তবু ভাল চাকরি পেলাম না। ভালবাসলাম। তুমি নিশ্চয়ই চেন সে মেয়েটিকে। সুধা। কিন্তু চাকরি আর ভালবাসা দু ব্যাপারেই আমার এক চোখের শূন্যতা ব্যর্থতা আর হতাশার সৃষ্টি করল। শেষে একদিন উধাও হয়ে গেলাম।

পাটনা থেকে গেলাম কলকাতা। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে ডিস্টিংশনের সব চিহ্ন মুছে গেল। এক মোটরের কারখানার মিস্ত্রী হলাম। সেখানেই ড্রাইভিং শিখলাম। বছর দুই কাটল। সংস্কৃত কাব্য আর নাটকের রস পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শিলাকঠিন গদ্যের রূপ ধারণ করল আমার মন। হিংস্র হয়ে উঠলাম। একা মানুষের মনের বল অনেক হয়। আমারও তাই হল। আমার ত কেউ ছিল না। মা, বাপ, ভাই, বোন, বন্ধু—কেউ না। ঘৃণা হল পৃথিবীর ওপর—একটি আক্রোশ জন্মাল। শুধু অন্ধ, কানা আর বিকলাঙ্গরাই আমার সহানুভূতির পাত্র হল। বাকি সবাই যেন শত্রু। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। নীতির বাঁধন ছিঁড়ে ফেললাম। পয়সা দিয়ে সস্তা নারীদেহের সঙ্গে পরিচয় ঘটালাম। জয়-মা-কালী ব্র্যান্ড দিয়ে আমার বিবেক ও আত্মার শ্বাসরোধ করলাম। আমার গোত্রান্তর ঘটল সাময়িকভাবে। আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন একটা নতুন চাকরি পেলাম। এক মস্ত বড়লোকের বাড়িতে মোটর চালাতে হবে। নিলাম চাকরিটা। দিনরাত লোহালক্কড় এবং পেট্রল-গ্রীজ আর ভাল লাগছিল না।

মালিকের আসল নাম বলব না। ধর তাঁর নাম বিনায়ক চৌধুরী। কলিয়ারির মালিক তিনি। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বিরাট বড় বাড়ি। লক্ষ-

পাতি লোক। কিন্তু অন্ধ। বসন্ত রোগে তাঁর দুটি চোখই গেছে। ভদ্রলোকের বয়স তখন বত্রিশের মত হবে, আমার 'চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের বড়। চব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তার পরের বছরেই এই দুর্বিপাক ঘটে। সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতার মত তাঁর স্ত্রী। অসামান্যা তাঁর রূপ। সে রূপ দেখে প্রথমটা একটা জড়তার ভার নেমে আসে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর। যে রূপ আমার এই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার বর্ণনা না করে পারছি না। আজকাল রূপবর্ণনাকে মানুষ বড় করে স্থান দেয় না। কিন্তু আমি সংস্কৃতের ছাত্র, রূপের স্তুতি না করে পারি না। বিনায়ক চৌধুরীর স্ত্রী অনসূয়া চৌধুরী বিলেত-ফেরত এক নামজাদা ব্যারিস্টারের সুশিক্ষিতা মেয়ে। আজকাল তাঁর বাপ নেই। এক ভাই আছেন—তিনি বিবাহিত ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। অনসূয়া চৌধুরীর বয়স পঁচিশের বেশী নয়, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। তাঁর আবেশভরা যৌবনের ওপর অতীত-কৈশোরের ছায়া যেন তখনও বর্তমান ছিল। তিনি বাণভট্টের কাদম্বরী নন, তবু কাদম্বরীর দেহবর্ণনাব সংগে যেন তাঁর সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতির দৃঢ়-নিষ্পেষণে অতি-ক্ষীণ তাঁর কটিদেশ। পয়োধরের উন্নতি যেন অন্তরায় ছিল বলেই তাঁর কটিদেশ অনসূয়া চৌধুরীর মুখ দেখতে না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কটিদেশ থেকে যেন দ্বিধা-বিভক্ত লাবণ্যের স্রোতের মত নেমে গেছে তাঁর উরুযুগল। তাঁর বাহু দুটি যেন দুটি চঞ্চল মৃণাল। ঠোঁট দুটি যেন রূপসাগরের দুটি তরঙ্গ। দুটি চোখ যেন দুটি কৃষ্ণ-ভ্রমর। আর তাঁর হাসি—সে যেন পদ্মরাগমণির বরণডালায় মুক্তাব স্বপ্ন। বুঝতে পারছি জিতু, তোমার সন্দেহ হচ্ছে। মনিব-পত্নীর রূপ নিয়ে আমার এত আগ্রহ কেন? সেইজন্যেই ত আগে বলেছি যে, আমাকে তুমি পাপিষ্ঠ ভাবতে পার। তা ভাব। আমি যা সত্য তাই বলছি। কত বছর কেটে গেছে, তবু অনসূয়া চৌধুরীর রূপের সেই প্রথম-দর্শন স্মৃতি আমাকে এখনও প্রেতের মত অনুসরণ করে। ফুলের গন্ধে, পূর্ণিমার আলোতে, কালবৈশাখীর উদ্দাম হাওয়ায়, চন্দ্রহীন রাতের অতি নির্জন ও নিকষকালো কোন কোন মুহূর্তে এখনও আমার অনসূয়া চৌধুরীর রূপের কথা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে যে, আমি একচক্ষুহীন—অর্ধেক-অন্ধ।

রাগ ক'রো না জিতু। তোমাকে ত আগেই বলেছি যে, অকপটে সব কথা বলব। না, আমার লজ্জা হচ্ছে না; কারণ, আমি জানি যে, বিধাতার দুরন্ত ইচ্ছা না হলে তোমার সংগে আমার আর সহজে দেখা হবে না। হ্যাঁ, আমি টাটানগরে নেমে যাব। রাতশেষে আমার সংগে এই সাক্ষাৎকার তোমার একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হবে। সুতরাং একটু ধৈর্য ধরে শোন। আমি

চাকরির খবর পেলাম। চৌধুরীবাড়িতে ড্রাইভার আর একজন ছিল। কিন্তু গাড়ি দুটি। একটি মালিকের, দ্বিতীয়টি তাঁর স্ত্রীর। আমার ওপর দ্বিতীয়টিরই ভার পড়বে।

বিনায়ক চৌধুরীর সামনে প্রথমেই হাজির করা হল আমাকে। দোহারা গড়ন ভদ্রলোকের। দামী ধুতি ও জামা পরনে। দেশী কায়দায় সাজানো বাইরের কামরা। ঘরের চার দিকে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি টাঙানো। আর ছিল বীণা, তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা ও পাখোয়াজ। অনুমান করলাম যে, ভদ্রলোক সঙ্গীতানুরাগী। সামনে ম্যানেজার ছিলেন। বয়স্ক ভদ্রলোক, নাম শ্যামাদাস ভট্টাচার্য। বিনায়কবাবুর বাপের আমলের লোক। বাপের মতই। বিনায়ক আমাকে শিক্ষা-দীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ভাসা-ভাসা জবাব দিলাম যে, ইংরেজী-বাংলা লিখতে পড়তে জানি। আরও দু-একটা প্রশ্নের পর আমার চাকরি হল। বিনায়ক তাঁব স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। অনসূয়া চৌধুরী আমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। আমায় দেখে সম্মতি জানালেন। আমি লক্ষ করলাম যে, তাঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু ও অস্পষ্ট একটু হাসি ঝিলিক দিল। আমি বুঝলাম যে, সে হাসি আমার এক চোখের উৎকট শূন্যতাকে দেখে। কিন্তু আমার রাগ হল না; কারণ, আমি আমার এক চোখ দিয়েই তাঁব দু চোখের মধ্যে এক বিচিত্র অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। স্বামীর ওপর সে দৃষ্টি থাকে না, কারও ওপর নয়—সেই দৃষ্টি যেন চমকে চমকে বাইরের দিকে কি খোঁজে।

কাজ শুরু করলাম। বেশী খাটতে হত না। সারা দিনে হয়ত দু-তিনবার বেরোয় অনসূয়া দেবী। বান্ধবীদের বাড়ি। সবাই বড়লোক। কিংবা হয়ত কোনদিন বিকেলে গড়ের মাঠে, নয়ত সিনেমায়। বাড়িতে ঝি-চাকর অনেক, কিন্তু আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। যাঁরা আত্মীয় বলে প্রচার করেন তাঁদের সঙ্গে অনসূয়াব বনে না বলে বিনায়কেরও বনে না। হ্যাঁ, বিনায়কের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেবোতেন তিনি। এক-আধ দিন। বেড়াতে কিংবা কোন গানের জলসায়।

গান গাইতেন বিনায়ক চৌধুরী। চমৎকার মিষ্টি গলা তাঁর। পৌরুষ ছিল তাতে। বড় বড় ওস্তাদের কাছে ছোটবেলায় গান শিখেছেন। কিন্তু ধ্রুপদাঙ্গ গানই বেশী গান। কাজ আর কি তাঁব, ওই কাজ। গ্র্যাজুয়েট তিনি। কিন্তু সম্পত্তির কাগজপত্র বা পড়াশোনা আর ত হবে না তাঁর, তাই গানবাজনার চর্চাই একটা প্রধান কাজ। একজন সেক্রেটারি আছেন তাঁর, মাঝে মাঝে এটা-ওটা পড়ে শোনায়। কিন্তু ওসব বেশী ভাল লাগে না তাঁর। ভাল লাগে শুধু অনসূয়ার সঙ্গ আর গান। বিয়ের এক বছর

বাদেই তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন—অনসূয়ার সেই দেবীদুর্লভ সৌন্দর্য চিরকালের জন্য তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হলেও তার স্মৃতিটুকু তাঁর দু চোখের অন্ধকারে বহু দূরের তারার মত জ্বলে।

কিন্তু অনসূয়ার কি ভাল লাগত স্বামীর সঙ্গ? না। প্রথম দিনে তাঁর চোখের চঞ্চল তারাতে আমি যা পাঠ করেছিলাম তা ঠিক। প্রথম কিছুদিন ভাবলাম, আমার কি ভুল হল? এক মাস বাদেই যখন অনসূয়ার বিশ্বাস জন্মাল আমার ওপর, তখন টের পেলাম যে, আমার শয়তান মন ঠিকই ধরেছিল। অনসূয়া চৌধুরী তাঁর অন্ধ স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। গড়ের মাঠে আর সিনেমাতে তাঁর বেড়াতে যাওয়ার মাত্রা ক্রমেই যখন বেড়ে গেল তখন লক্ষ করলাম যে, সুপ্রকাশ মুখার্জি নামক একজন সুদর্শন যুবক তাঁর প্রতীক্ষায় থাকত। লোকটিকে একদিন বিনায়ক চৌধুরীর দপ্তরে দেখেছিলাম। তাঁর এক পিতৃবন্ধুর ছেলে। বিরাট বড়লোক, কলকাতা-বোম্বাইতে ব্যবসা আছে। বোম্বাইতেই বাসা, তবে বছরেব অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই থাকে। হোটেলে।

কিন্তু কাকে বলি এ কথা? বলেই বা লাভ কি? আমার পাপ-মন আমাকে যে মন্ত্রণা দিল সেই অনুযায়ী আমি নির্লিপ্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। গড়ের মাঠ ছেড়ে এখন ওদের হোটেলেই দেখা হতে লাগল। হোটেল থেকে অনসূয়া চৌধুরীকে যখন বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম তখন পেছনের সীটে বসে তিনি মাঝে মাঝে গুনগুন কবে গাইতেন। সেই রূপসী স্বৈরিণীর দেহ থেকে ভেসে-আসা মৃদু বিলাতী সেণ্টেব সুবাস আমাকে বাসনা-বিহ্বল করে তুলত আর নানা দুরাশার দুঃস্বপ্ন দেখাত।

উৎকট কৌতূহলে লক্ষ্য রাখতাম। কি আশ্চর্য এক মুখোশ পরে অনসূয়া চৌধুরী তাঁর স্বামীর কাছে যেতেন! আর বিনায়ক চৌধুরী? তিনি যেন বাতাসেও গন্ধ পেতেন অনসূয়ার। মাঝে মাঝে তিনি যখন রাতে গাইতেন তখন আমি লুকিয়ে উঁকি মেরে তাঁকে দেখতাম আর গান শুনতাম। সেই সময় এক-আধ দিন অনসূয়া নিঃশব্দে ঘরের দবজার সামনে এসে দাঁড়াতেন। কিন্তু বিনায়ক ঠিক টের পেতেন। বলতেন, "অনসূয়া এসেছ? ব'সো। একটি ধানশ্রী গাইছি, শোন।" অনসূয়া বসতেন। তখন তাঁকে দেখাত শুচিস্নিগ্ধা, সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি কল্যাণী বধূর মত। বসতেন স্বামীর কাছাকাছি—স্বামীকে যে প্রতারণা করছেন তা যেন পুষিয়ে দেবার জন্য একটু মুগ্ধতার রেশ গলায় তুলে বলতেন, "আহা, বড় সুন্দর ত—গাও।" বিনায়ক মৃদু কণ্ঠে বলতেন, "তোমার জন্যেই ত গাই অনু—তুমি কাছে থাক বা দূরে থাক, আমার সব গানই তোমার জন্যে।" আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসি পেয়েছে আমার এ কথা শুনে, করুণা হয়েছে ঐ অন্ধের ওপর। ঘৃণায়

কাঁপতে কাঁপতে সরে গেছি। কিন্তু বাসনায় উন্মাদ হয়ে আবার ফিরে এসেছি, আবার উঁকি মেরে দেখেছি অনসূয়া চৌধুরীকে। ক্রমে আমার হৃদয়ে শয়তান অনসূয়া চৌধুরী রাজত্ব গড়ে তুলল।

অনসূয়া আমাকে বহুবার পরীক্ষা করেছিলেন যে, আমি তাঁর বিশ্বাস-ভাজন কিনা। আমাকে ইঙ্গিতে বলেও ছিলেন যে, আমি তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে এতটুকুও কাউকে বললে আমার চাকরি যাবে। আমিও ইঙ্গিতে জানিয়েছিলাম যে, আমি বিশ্বাসভাজন। একদিন এক কাণ্ড হল। বিনায়ক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে অনসূয়া একদিন বিকেলের পর গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গেলেন।

বিনায়ক প্রশ্ন করলেন, "অনসূয়া, সূর্য কোথায়?"

অনসূয়া বললেন, "অস্তে যাচ্ছে।"

"কেমন দেখাচ্ছে সূর্যকে—বল না একটু!"

"লাল।"

অন্ধের সেই আকূতি আমি বুঝেছিলাম। তাই অনসূয়ার সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর আমার ভাল লাগল না। আমি পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বলে ফেললাম, "গঙ্গার পশ্চিম দিকে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, গঙ্গার জল দুলছে—তার ওপারে লাল টকটকে সূর্যদেবকে মনে হচ্ছে যেন একটি মধুক্ষরা রক্তপদ্ম—"

অনসূয়া ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। বিস্ময়? হয়ত একটু, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল বিরক্তি। একটা কানা ড্রাইভারের এ কি প্রগল্‌ভতা!

বিনায়ক চৌধুরী কিন্তু ভারি খুশী হলেন। বললেন, "তুমি বেশ বললে ত! মনে হল, যেন একটি ছবি দেখলাম। কত দূর পড়েছ তুমি?"

একদিন লজ্জায় শিক্ষার কথা গোপন করেছিলাম। আজ যেন অতি-দূরের আকাশবিহারী এক নক্ষত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা হল। বললাম, "বি-এতে ডিস্টিংশন নিয়ে পাস করেছি।"

"অ্যাঁ! বল কি? কি কি সাবজেক্ট ছিল?"

"সংস্কৃত আর দর্শন।"

"তাই—তাই এমন সুন্দর উপমা দিলে। কিন্তু—কিন্তু তুমি ড্রাইভারের কাজ করছ কেন?"

অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, "আমার একটা চোখ নেই।"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনায়ক চৌধুরী, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝেছি। কাল থেকে তুমি আমার সেক্রেটারির কাজ করবে।"

অনসূয়া চমকে বললেন, "কিন্তু একজন তা আছেনই!"

বিনায়ক দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "তাকে কলিয়ারিতে ভাল কোন কাজে পাঠাব।"

অনসূয়া বললেন, "বেশ, কিন্তু নতুন ভাল ড্রাইভার না আসা পর্যন্ত আরও ক'টা দিন আমার গাড়িটা ওই চালাক।"

"বেশ।"

অনসূয়ার বলার কারণ স্পষ্ট। সুতরাং তাই হল। পরদিন থেকে সেক্রেটারির কাজ শুরু করলাম। সেক্রেটারি মানে সঙ্গী! বিনায়ককে বই পড়ে শোনাতাম, সব কিছু নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে বোঝাতাম। ঠিক তোমাদের মহাভারতের সঞ্জয়ের মত। তিনিও নাকি প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ছিলেন, পরে মন্ত্রী হন। অবশেষে দূত। দিব্যদৃষ্টি পাওয়াতে তিনি অ-দৃষ্ট বস্তুও দেখতে পেতেন। আমার জীবনে অবিকল তেমনি ঘটনা না ঘটলেও অনুরূপ অনেক কিছুই ঘটল। এই কাজের সঙ্গে অনসূয়া চৌধুরীকে গড়ের মাঠে বা হোটেলে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও আমার চলতে লাগল। প্রায় বছরখানেকের মত কাটল। বিনায়ক আমাকে ভালবেসে ফেললেন। পিতৃসম শ্যামাদাসও স্নেহ করতে লাগলেন। আমার জ্ঞান ও চরিত্রমাধুর্য তাঁদের মুগ্ধ করল। এমনি সময় একদিন রাতে গানবাজনার পর অনসূয়ার সঙ্গে বিনায়ক চৌধুরীর কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।

গান বন্ধ করে বিনায়ক হঠাৎ আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কি হয়েছে অনু?"

"কই? কিছু না ত!"

"কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে অনু! বল, কি হয়েছে?"

অনসূয়া ধীর কণ্ঠে বললেন, "কিছু না।"

হঠাৎ বিনায়ক উঠে দাঁড়ালেন, হাতড়াতে হাতড়াতে অনসূয়ার কাঁধ খুঁজে দু হাতে তাঁকে চেপে ধরে বললেন. "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"হাত সরাও—আমার লাগছে।" দু হাতে সবলে নিজেকে মুক্ত করে বসন্তের দাগে হতশ্রী ও অন্ধ বিনায়কের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন অনসূয়া, বললেন, "রোজ রোজ এক প্রশ্ন! বলেছি ত, ক'দিন ধরে শরীরটা ভাল নয়—তবে ভাববারও কিছু নেই।"

"অনু! তুমি মিছে কথা বলছ।"

"কি বলতে চাও তুমি?"

দৃঢ় কণ্ঠে বিনায়ক বললেন, "কাল থেকে তুমি আর বাইরে বেরোতে পারবে না।"

"কেন?"

"আমার হুকুম।"

"কিন্তু কেন এই হুকুম?"

"তোমাকে জিরোতে হবে—ভাল হতে হবে।"

অনসূয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন। বললেন, "আচ্ছা, তাই হবে।"

ঘর ছেড়ে অনসূয়া বেরিয়ে যেতেই বিনায়ক কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে তারপর তিনি তানপুরাটি টেনে মৃদু কণ্ঠে গান ধরলেন :

"তেরো নাম চহুঁচক ভরপুর রহো,
তুঁহি দূরত ফিরত,
তুঁহি সবন মে করত কলোল।
তুঁহি তান, তুঁহি মান, তুঁহি
রোম-রোম রম রহো,
তুঁহি মুন, তুঁহি বোলে বোল।"

আমি এর আগেও এ গান শুনেছি। ধ্রুপদাঙ্গ গান। জৌনপুরী রাগ, চৌতাল। প্রতিপাদ্য ঈশ্বব। কিন্তু এ কোন্ ঈশ্বরের গান গাইতে গাইতে আজ বিনায়ক চৌধুরীর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল? অন্ধের আত্মা কি এত দিনে টের পেয়েছে যে, অনসূয়া চৌধুরী বদলে গেছে?

ক'দিন কাটল। অনসূয়া চৌধুরী আর বেরোয় না। তবে কি সুস্থতা ফিরে এল তাঁর? না। পাঁচ-ছ দিন বাদেই এক সকালে অনসূয়া আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠালেন। আমাকে একটা কাগজে-মোড়া বইয়ের প্যাকেট দিয়ে বললেন, "এই প্যাকেটটা আমাদের বন্ধু সেই সুপ্রকাশবাবুকে দিয়ে এস সঞ্জয়—বড় দরকারী।"

"আজ্ঞে।" বলেই পা বাড়াচ্ছিলাম। অনসূয়া ডেকে বললেন, "শোন, কেউ যেন এ কথা না জানে।"

হেসে বললাম, "আজ্ঞে না।"

রাস্তায় থেমে প্যাকেটটা খুলে দুটো বই পেলাম। একটা বইয়ের ভেতর একটি খাম।

প্যাকেট নিয়ে দিলাম সুপ্রকাশবাবুকে। তিনি আমাকে আদর করে বসিয়ে আবার একটা প্যাকেট দিলেন এবং এক শো টাকার একটা নোট আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বলা বাহুল্য, ফেরার পথে সেই প্যাকেট খুলে বইয়ের ভেতর তাঁর চিঠি পেলাম। অনসূয়ার গৃহত্যাগের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। পরদিন অন্ধকার থাকতেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটরে করে

অনসূয়াকে নিয়ে চলে যাবেন তিনি। অনসূয়া যেন ভোর চারটেয় তাঁর হোটেলে পেঁছিন। তাঁর গাড়ি থাকলে শ্যামাদাসবাবুরা সন্দেহ করবেন।

চিঠিটা পড়ে বাজারে গিয়ে ভাল চিঠির কাগজ কিনে অবিকল সুপ্রকাশ-বাবুর হাতের লেখা নকল করে আসলটা আমি বুকপকেটে রাখলাম। তারপর নকলটি সমেত প্যাকেটটি নিয়ে বাড়ি গেলাম। উন্মাদ আগ্রহের সঙ্গে অনসূয়া প্যাকেটটি নিলেন। খানিক বাদে আবার তিনি ডাকলেন আমাকে, স্থিরদৃষ্টি মেলে বললেন, "তোমায় বিশ্বাস করতে পারি সঞ্জয়?"

বললাম, "এত দিন করেননি?"

অনসূয়া মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। তবু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, কাউকে বলবে না সুপ্রকাশবাবুর কথা।"

বললাম তা। তখন অনসূয়া প্রস্তাব জানালেন যে, তাঁর গাড়িটাকে মেরামত করবার নাম করে জনক সেন লেনের মুখে সন্ধ্যের সময় দাঁড় করিয়ে রাখব আমি। তারপর রাতের বেলা ওই গাড়িতেই গিয়ে শুয়ে থাকব। ভোর রাতে তিনি এলে তাঁকে এক জায়গায় পেঁছে দিতে হবে। তারপর ভোর-বেলায় সত্যি কোন গ্যারেজে গাড়ি দিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।

বিনায়ক চৌধুরীর সেদিনকার চোখের জলের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, "এটা কি উচিত হবে?"

"কি উচিত?"

"মাপ করবেন—আপনার এভাবে যাওয়া!"

অনসূয়া আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে কি আগুন জ্বলল? নাকি বেদনা? তিনি বললেন, "তোমার এ অনধিকার-চর্চা সঞ্জয়। তবু আজ বাধ্য হয়েই বলছি। তুমি শিক্ষিত লোক. কিন্তু তোমার একটা চোখ নেই বলেই কি তুমি আজ ওই অন্ধের কথা বড় করে ভাবলে? আমার কথাও কি ভেবেছ একদিন? আমি বড় ক্লান্ত। আমি এ অন্ধের জগতে আর থাকতে পারছি না। আমি চাই সুস্থের ভালবাসা—আমি চাই, যে আমায় ভালবাসবে সে আমায় দু চোখ ভরে দেখুক আর স্তব করুক।"

প্রচণ্ড এক জ্বালায় জ্বলে উঠলাম, তবু বললাম, "বুঝেছি। আপনি যা বললেন তাই হবে।"

"শোন. তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, তা হলেও আমার মতি বদলাবে না। আজ না পারি কাল—একদিন-না-একদিন আমি যাবই।"

"বুঝেছি। কাউকে জানাব না আমি—প্রতিজ্ঞা ত করেইছি।"

আমি চলে গেলাম।

নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম। সত্যি কি ঠাকুর-দেবতা মানি আমি?

বিনায়ক চৌধুরীকে জানাব না?

শেষে আমি সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করলাম।

না, বিনায়ক চৌধুরীর জীবনে অনসূয়া এক অভিশাপ। অভিশাপ দূরেই যাক। তা ছাড়া এক ঢিলে দুই পাখি মারব আমি।

দিন গেল। রাত এল। যেমন ঠিক হয়েছিল তেমনি করলাম। মাঝরাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাঁচিল টপকে বাইরে গেলাম। তারপর জনক সেন লেনের মোড়ে। গাড়িতে বসে সিগারেটের পর সিগারেট জ্বালালাম। অনেকক্ষণ জেগে থেকে সবে যখন একটু তন্দ্রা এসেছে তখন অনসূয়া এসে আমায় জাগালেন।

চাদর মুড়ি দিয়ে অতি সাধারণ একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছেন তিনি।

তিনি পেছনে বসতেই বললাম, "কেউ টের পায়নি ত?"

"না। হোটেলে চল সঞ্জয়।"

গাড়ি চালালাম। সবেগে। শেষরাতের ফাঁকা রাস্তা একেবারে জনশূন্য। হোটেলের দিকে নয়। নির্জনতার অংশের দিকে।

"এ কোথায় যাচ্ছ?" অনসূয়া ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন।

"একটু নির্জনে।"

"কেন?"

"আপনাকে ঠিকই পেঁাছে দেব, চিন্তা করবেন না। তবে একটু বোঝাপড়া আছে আপনার সঙ্গে।"

"বোঝাপড়া মানে?" অনসূয়ার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও বিশ্রী হয়ে উঠল।

গাড়ির বেগ আরও বাড়িয়ে বললাম, "সুপ্রকাশবাবুর আসল চিঠিটা আপনাকে আমি দিইনি—সেটা আমি কর্তাকে দিতে পারতাম বা পারি।"

সামনের ছোট্ট মিররে অনসূয়ার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, "তার মানে—কি চাও তুমি?"

স্পষ্ট করে বললাম।

"গাড়ি থামাও।"

"গাড়ির স্পীড এখন সত্তর মাইল—থামবে না।"

"আমি চেঁচাব।"

"ঠিক আছে। তা হলে বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই আপনাকে—আপনার অন্ধ স্বামীর কাছে—"

অনসূয়ার গলা কাঁপছে তখন, বললেন, "টাকার জন্য এমন করছ সঞ্জয়—তোমায় আমি হাজার টাকা দেব।"

বললাম, "না। এ জীবনে আমিও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারব, কিন্তু আপনাকে ত পাব না!"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ক্ষীণ গলায় অনসূয়া বললেন, "কোথায় সে চিঠি?"

দেখালাম দূর থেকে।

"আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও।"

"শর্তটা তা হলে মঞ্জুর করলেন?"

দাঁতে দাঁতে পিষে অনসূয়া বললেন, "শয়তান! আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও।"

অপমানে, রাগে, দুঃখে অনসূয়া কাঁদলেন, হিংস্র হয়ে উঠলেন, কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

ওরা পালাল। আমি সব পর্ব সেরে বাড়ি ফিরলাম। তখনও কেউ টের পায়নি। কিন্তু একটু বাদেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল, কোথায় অনসূয়া? শ্যামাদাসবাবু আমাকে আড়ালে নিয়ে বললেন যে, অনসূয়া নিশ্চয়ই সুপ্রকাশের সঙ্গে পালিয়েছেন। তাঁর সন্দেহকে সত্য করল অনসূয়ার চিঠি। বিনায়কের নামে লেখা। কিন্তু বিনায়ককে তিনি সে কথা জানালেন না। বললেন যে, অনসূয়া বাপের বাড়ি গেছেন। অনসূয়ার দাদা রথীনবাবুর কাছে গেলেন তিনি। কি সব পরামর্শ হল তাঁদের। তারপর তাঁরা এসে বিনায়ককে বললেন যে, অনসূয়া তাঁর কাছেই এবং সেদিনই সকালে দার্জিলিঙে বেড়াতে যাচ্ছেন। বিনায়ক তাকে অহেতুকভাবে বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ করাতেই তিনি এমন করেছেন। দু-চার দিনেই ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে, বিনায়ক যেন এ নিয়ে ছেলেমানুষি বা জেদ না করেন। বিনায়ক স্থির হয়ে শুনলেন সে কথা। শান্ত হলেন, সম্মতি জানালেন। বললেন, "রথীদা, অনসূয়াকে বলবেন আমায় ক্ষমা করতে।" রথীনবাবু চলে গেলেন। ইতিমধ্যে শ্যামাদাস বোম্বাইতে সুপ্রকাশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। খবর পেলেন যে, সে বোম্বাই ফিরবে না, মোটরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবে। পুরনো চাকরদের রাতারাতি তিনি কলিয়ারিতে চালান করে নতুন চাকরদের বহাল করলেন। তারপর রথীনবাবুকে গিয়ে বললেন, "আর দেরি করা উচিত নয়। হয় সত্যি কথা বলতে হয়; নয় বলতে হয় যে, অনসূয়া মারা গেছেন।" রথীন অনেক ভেবে বললেন, "চলুন, তাই বলব—অনসূয়ার এবার মরাই ভাল।" তাঁরা বিনায়কের কাছে গিয়ে জানালেন যে, দার্জিলিঙের পথে একটা মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছেন অনসূয়া। অন্ধের কাছে

মিথ্যাকে সত্য করে তোলার যত উপায় ছিল সব প্রয়োগ করা হল। বিনায়ক চৌধুরী বিশ্বাস করলেন।

এর পর বিস্তৃতভাবে বলতে পারব না জিতু। বলা যায় না। বিনায়ক চৌধুরী কাঁদেননি অনসূয়ার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেলেন। বাজে-পোড়া গাছ দেখেছ? তেমনি। শ্যামাদাস বাপের মত আগলে রাখলেন। আমিও। কিন্তু আমার অবস্থাও যে তখন বর্ণনাতীত! আমি গ্লানি বোধ করেছিলাম? না। বিনায়ককে দেখে অপরাধ বোধ করে-ছিলাম। এই অন্ধ, সৎ, সুকুমার ও শিল্পী লোকটির জীবনের এক বিয়োগান্ত অধ্যায় রচনাতে আমি যে হীন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম, সে কথা স্মরণ করে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। বিনায়ককে বললাম সে কথা। "আমায় ছুটি দিন।"

বিনায়ক আমার দু হাত চেপে ধরলেন, "আমাকে ছেড়ে যাবে সঞ্জয়? না, না—তুমি যেও না। আমার মত অন্ধকে কে সাহায্য করবে? তুমি থাক সঞ্জয়, আমার ছোট ভাই হও—আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব।"

থাকলাম। আমার মাইনে অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু মরমে মরে গেলাম। শিক্ষিত যে মনটাকে জানোয়ার করে তুলেছিলাম সে আবার নিজের সত্তা ফিরে পেল। ভাবলাম, যার এমন ক্ষতি করেছি তাঁর কাছে থাকব কি করে? কোন্ উদ্দেশ্যে? তাও ঠিক করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি তাঁকে রক্ষা করব। তাঁর কুলত্যাগিনী স্ত্রীর রূপমুগ্ধ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য আমি—তবু যেন আমি বিনায়কের দুঃখ বুঝলাম। আমি স্থির করলাম যে, অনসূয়াকে আমি ভুলে যাব এবং বিনায়ককে ভুলতে বাধ্য করব।

দিন কাটতে লাগল। আমি বিনায়কের ছায়া হয়ে উঠলাম। তিনি স্ত্রীর বিষয়ে গল্প করেন না, বেশী কথা বলেন না। আমি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। তখন একদিন তাঁকে বিয়ে করতে বললাম। তিনি চমকে উঠে বললেন, "অসম্ভব। অন্ধ হলেও চরিত্রবলে আমি ছোট নই সঞ্জয়।" তিনিই উলটে আমাকে বিয়ে করতে বললেন। আমিও চমকে উঠলাম। অসম্ভব। অন্য কোনও নারী আর আমার সহ্য হবে না। কোন নারীর ভালবাসা পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

কিন্তু দিন কাটবে কি করে? বিনায়ক আর গানও করেন না। অনসূয়ার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রেতের মত তিনি শীর্ণ হয়ে উঠছেন। প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলাম তাঁকে। "বেশ ত, বিয়ে না করলেন, কিন্তু আর কিছু?" ঘৃণায় বিনায়কের মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "ছিঃ সঞ্জয়!" তা হলে? এবার কি করি? কি করে বিনায়ককে বাঁচাই? কি করে

নিজে বাঁচি? বিনায়ককে একদিন প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, জীবন কি? মানুষের লক্ষ্য কি?" বিনায়ক হাসলেন, "প্রশ্নটা বেশ ত! এস, জানা যাক।"

আবার কাজ পেলাম। বিনায়কবাবু আর আমার কাজ। ফর্দ করে বই আনতে শুরু করলাম। কিনে, লাইব্রেরি থেকে। দর্শন, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বাইবেল। আমি পড়ি আর বোঝাই। আমি বক্তা, তিনি শ্রোতা। আমি অধ্যাপক, তিনি ছাত্র। আমি গুরু, তিনি শিষ্য। শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। বলতে বলতে আমি বদলে যেতে লাগলাম। একচক্ষুহীন হয়েও আমি বিনায়কের দু চোখ হয়ে উঠলাম। আকাশ-বাতাস-ফুল-ফলের বর্ণনা করে বোঝাতে লাগলাম তাঁকে, ছবি এঁকে এঁকে তুলে ধরতে লাগলাম তাঁর কাছে। আমার পাপ স্খালনের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ধীরে ধীরে বাড়ির এ ঘরে ও ঘরে অনসূয়া চৌধুরীর যত ছবি ছিল তার ওপর অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ধুলো জমল। তানপুরার ধুলো গেল। আমিও তবলা শিখলাম, পাখোয়াজ শিখলাম। জীবনের অর্থ খুঁজে পেলাম আমরা, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেলাম।

বিনায়ক আবার গান শুরু করলেন। আরও মিষ্টি হয়ে উঠল তাঁর গলা। পাড়ার লোকেরা এসে উঁকি মারতে শুরু করল। মধুমুগ্ধ ভ্রমরের মত। দিন মাস বছর কাটল। বছরের পর বছর। এরই মধ্যে শ্যামাদাস মারা গেলেন। অন্ধের রাজ্যে একচক্ষুহীন আমি রাজসদৃশ হয়ে উঠলাম। দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেল। সাধুর মত আকৃতি হয়ে উঠল আমাদের। বিনায়ককে দেখাত যোগীর মত। বীতশোক, ব্রহ্মোপলব্ধিতে আনন্দিততনু। ভবভূতির সীতাবিহীন রামের মত। এতদিন আমি গুরু ছিলাম, এবার তিনি গুরু হলেন। তিনি তাঁর দিব্য অনুভূতির কথা রোজ শোনাতে লাগলেন। মনে হল যে, আর কাউকে ঘৃণা করব না, হিংসা করব না। অনুভব করলাম যে, আমিই ব্রহ্ম—আমার অন্তরে ব্রহ্ম, বাইরে ব্রহ্ম। আমি অমৃত-সাগরে নিমজ্জমান এক অমৃত-কুম্ভ। সত্যকে অনুভব করলাম। বুঝলাম যে, মানুষের ঘৃণা প্রেম হিংসা ভালবাসা সুখ আর দুঃখ—এ সবই গুণের বিকার, এ সব কিছুই। জানলাম যে, সত্যই ভগবান।

বছর কয়েক বাদে বিনায়ক বললেন, "এবার তীর্থে চল।"

বললাম, "কোথায়?"

"হিমালয়ে—মানস-কৈলাস তীর্থে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে ভগবানের মুখোমুখি হতে।"

উৎফুল্ল হয়ে বললাম, "চলুন।"

বেরোলাম। আমি, বিনায়ক, তিনজন চাকর, একজন সরকার। কুলি আট-দশজন। তাঁবু, রসদ, ওষুধ, মালপত্র আর দুটি বন্দুক। তখন যাত্রীদের

চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আলমোড়া থেকে ডাণ্ডিতে চড়িয়ে নিলাম বিনায়ককে। পেছনে মালবাহী ঘোড়ার দল ও কুলিরা। ধলচিনারের পর উতরাইয়ের পথ ধরে একটু নামতেই দূরে অভ্রভেদী হিমালয়কে দেখতে পেলাম। আমি বিনায়ককে চলতে চলতে সব কিছুর বর্ণনা দিতে লাগলাম। হিমালয়ের চূড়োয় চূড়োয় তুষাররাশির ওপর সূর্যের আলো পড়েছে। কি অদ্ভুত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃশ্য! একটার পর একটা শৃঙ্গ। যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউ। বিনায়ক উৎসাহিত হয়ে বলেন, "আরও বল।" বলি। কোথায় কেমন ঝরনা, কোথায় কেমন গাছ। পাতার আকার আর রঙ। পাখিদের নাম ও চেহারা। দিন কাটতে লাগল চড়াই আর উতরাই পার হয়ে। দেবদারু-বনের শনশন শব্দের ভেতর দিয়ে, পলায়মান কস্তুরী-মৃগের দেহ-গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আকুল করে। ডাণ্ডিরহাট, অ্যাস্কট পার হয়ে, গৌরীশৃঙ্গ, কালী-গঙ্গা অতিক্রম করে, নানা মরসুমী ফুলের মাধুরী পান করে, ভেড়ার পালের শব্দের সঙ্গে বায়ুবেগে দোলায়িত বাঁশির শব্দ শুনতে শুনতে, কালিদাসের যক্ষবর্ণিত মেঘের মত আরো তাঁর কত বর্ণনা সত্য হতে দেখলাম। রাস্তায় কতবার মেঘ এল, আমাদের গাঢ় আলিঙ্গন করে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। দূরের মেঘেরা যেন আমাদের দেখে ডাকতে লাগল, আর তাদের সেই ডাক পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে শত-সহস্র মৃদঙ্গের ধ্বনির মত শোনাতে লাগল।

দিনের পর দিন। পাহাড়ে চড়া আর নামা। এখানে ওখানে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম। রাতে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেওয়া। এইভাবে আমরা গার্বিয়াং পৌঁছলাম। ডাণ্ডি ছেড়ে ঝব্বুর পিঠে চড়লাম আমরা। সঙ্গে ঘোড়াও আছে। পাহাড়ের চেহারা তারপর থেকে বদলে যেতে লাগল। রুক্ষ, উদাসীন। জীবজন্তুর সংখ্যা কমে যেতে লাগল। মনে হল, যেন ভূতনাথের যোগাবাসের ভেতর ঢুকেছি। চারদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। সূর্যালোকে তুষার-শৃঙ্গগুলো জ্বলছে, মহাদেবের রজতশুভ্র অট্টহাসির মত। সেই হাসির শব্দ যেন শনশন হাওয়ার ধ্রুপদ গান হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ঝব্বুদের গলায় বাঁধা ঘণ্টাগুলো যেন সেই গানের সঙ্গে মঞ্জীর বাজাতে লাগল।

কালাপানি পার হয়ে সঙচিঙে থামলাম। শেষরাতে সতরো হাজার ফুট উঁচু লিপুলেক পাসের বিস্তৃত তুষাররাশি পার হতে শুরু করলাম। অসহ্য শীত, তুষার। তবু থামি না। আমরা মানস-কৈলাসের যাত্রী। ভগবানের মুখোমুখি দাঁড়ানোর দৃঢ় পণে নির্ভর আমাদের হৃদয়। তুষার পার হয়ে ধূমায়িত ছায়া দেখলাম দূরে। রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠল, বাতা-সের বেগ বাড়ল। অবশেষে আমরা তাকলাকোটে পৌঁছলাম। তারও দু দিন পরে গুরেলা মান্ধাতা পর্বতশৃঙ্গকে ডান দিকে রেখে এগোতেই বাঁ

দিকে রাবণ-হ্রদের নীল জল দেখতে পেলাম। তারপর আরও তিন মাইল। আরও তিন-চারটি চড়াই অতিক্রম করলাম। আর তার পরই এক মাস বাদে বেলা চারটের সময় মানসের অনন্ত-বিস্তৃত নীল জলরাশি দেখতে পেলাম।

চিৎকার করে উঠলাম, "পৌঁছেছি।"

বিনায়ক বললেন, "শিব—শিব—"

ঘোড়া নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলাম। হু-হু হাওয়ায় মানসের নীল জলে তখন ঢেউ উঠেছে। দূরে তুষার-শোভিত পর্বতশৃঙ্গের বলয়রেখা। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ধন্য হলাম। এই সেই ব্রহ্মার মানস-সৃষ্টি। এরই তীরে বসে কত দিন না জানি বালখিল্যের দল সন্ধ্যা-বন্দনা করেছেন। এরই জলে স্নান করতেন সপ্তর্ষিরা, সিদ্ধ-বধূরা ধুয়ে নিয়ে যেতেন তাঁদের কল্প-লতার বল্কল। দেবতা ও মুনি-ঋষিদের স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে যেন এ গড়া। এত স্বচ্ছ যে, জলের তলার প্রত্যেকটি নুড়ি যেন গোনা যায়।

বিনায়ক এলেন, বললেন, "বল, কি দেখছ?"

বললাম, "নীল জল। দিগন্তবিস্তৃত। এখানেই এক হংস-দম্পতি পরস্পরে সুখে প্রেমে নিরন্তর বিহার করত।"

"আরও বল।"

"পবিত্র এই মানস। অপরূপ। পরিশ্রান্তের শ্রান্তিহর। নাস্তিকের বিশ্বাস। এশিয়ার নাভিস্থল। ঝড়ের লীলাক্ষেত্র। দেবতাদের চোখের মণি। অরূপ রূপের সরোবর। এত সুন্দর যে, এর মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়।"

বিনায়ক বললেন, "শিব—শিব।"

আমাদের তাঁবু পড়ল। আমরা সেই পবিত্র জলে সাহস করে স্নান করলাম। এক ডুব দিয়েই শরীর হিম হয়ে এল। তাঁবুর ভেতরে গিয়ে বসলাম দুজনে। বিনায়ক জপে বসলেন।

হঠাৎ দেখলাম যে, কৈলাসের দিক থেকে কুড়ি-পঁচিশজনের একটি যাত্রিদল আসছে। কৌতূহল হল। বাইরে গেলাম। জানলাম যে, ওঁরা আজ রাতে এখানে থেকে আবার ভোরে চলে যাবেন তাক্‌লাকোটের দিকে। তাঁদের তাঁবু পড়তে শুরু করল। কল-কোলাহলে মানসের তীর সরগরম হয়ে উঠল। আমি দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। আমার স্নায়ুতন্ত্রী ঝনঝন করে উঠল। মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনসূয়া চৌধুরী! বিধবার বেশ। মলিন বর্ণ। তাঁর সেই অপূর্ব যৌবনকান্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। তুষার-পীড়িত কমলের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। যেন কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদ। কিন্তু মনে হল যে, তবু চাঁদ। ষোল কলা না হলেও চাঁদ। এ কি অঘটন!

মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমায় দেখতে পেলেন। একবার তাকিয়েই দ্রুত-পদে নিজের তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেলেন।

না, আমার ভুল হয়নি। হিমালয়ের দুর্গম পথ বেয়ে যে দুঃসাহসে ভর করে এসেছি তাও যেন যথেষ্ট নয়। তবু দুরুদুরু বুকে সেই তাঁবুর ভেতর ঢুকলাম।

ডাকলাম, "শুনুন—"

তিনি পেছন ফিরে বসে ছিলেন, বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে তাকালেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি কে?"

"আমি সঞ্জয়।"

"কে সঞ্জয়? আমি আপনাকে চিনি না!"

"আমি আপনার স্বামী বিনায়ক চৌধুরীর সেক্রেটারি—"

"বেরিয়ে যান, আমি কাউকে চিনি না!"

"বিনায়কও আছেন আমার সঙ্গে।"

তিনি গর্জে উঠলেন, "বেরিয়ে যান বলছি—"

তাঁর দু চোখ জ্বলতে লাগল।

এক পা পিছিয়ে বললাম, "আপনার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত—"

"ভূপ সিং!" বলে অনসূয়া হাঁক দিলেন।

দৈত্যাকৃতি একজন মাঝারি বয়সের লোক বন্দুক হাতে এগিয়ে এল।

"যাচ্ছি।" বলে বেরিয়ে গেলাম।

ভূপ সিং বলল, "হুকুম মাজী?"

অনসূয়ার গলা শুনলাম, "তোমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে?"

"হাঁ, মাজী।"

অনসূয়া আমাকে শাস্তি দিলেন না।

তাঁবুতে ফিরে গেলাম।

বিনায়ক বললেন, "কে? সঞ্জয়! ব'সো। তোমাকে ধন্যবাদ ভাই। তুমি না থাকলে আমার মত এক অন্ধের ভাগ্যে কি এই সৌভাগ্য হত? টাকা থাকলেই কি সব পাওয়া যায়?"

আমার ঈশ্বরানুভূতি তখন লোপ পেয়েছে। এই দশ বছরের শাস্ত্রচর্চা, দর্শনালোচনা আর যোগাভ্যাস সব বুজরুকি বলে মনে হতে লাগল। বহুদিন আগেকার শেষরাতের সেই পাপের কথা স্মরণ করে আমার বুকের ভেতর বিবেক আর বাসনার মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আমার সামনেকার ওই সাধু বিনায়কের দিকে তাকাতেও কেমন যেন ভয় হতে লাগল। ওঁর চোখ দুটো জ্বলছে কেন? আমার অন্তর পর্যন্ত দেখে উনি কি আমায় ব্যঙ্গ করছেন? কি করি? বলব? না, না—এ'র জীবনকে ত প্রকারান্তরে আমিই নষ্ট করে-

ছিলাম! বহু আয়াসে তাঁর জীবনের গতিকে ধর্মপথে চালিত করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে আবার মেরে ফেলব? না, না। অনসূয়া ত দার্জিলিঙের পথে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছেন!

"কি হল সঞ্জয়?"

বললাম, "জপ করছি।"

"তাই বল। মাপ কর ভাই, বিরক্ত করব না।"

রাত এল। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠল। তুষারশৃঙ্গে প্রতিফলিত সেই চাঁদের আলো যেন উজ্জ্বলতর হয়ে মানসের নীল জলে প্রতিবিম্বিত হল। ক্রমে রাত বাড়ল। বিনায়ক তানপুরা ধরে ডাকলেন, "সঞ্জয়, পাখোয়াজ বাজাও।"

ইমন কল্যাণ ধরলেন বিনায়ক।

"তু'হি পরম তীর্থ তু'হি পরম অর্থ
তু'হি এক অব্যর্থ যোগিজন গাবে।"

আমি আমার উৎকট চিন্তা থেকে বাঁচলাম। সাধকের মত তন্ময় হয়ে উঠলেন বিনায়ক। আমিও চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বাজাতে লাগলাম। ক্রমে সব ভুললাম। ক্রমে চৈতন্যের মধ্যে একটা ধ্বনি আলোকবৃত্তের মত ঘুরতে লাগল। ক্রমেই যেন মনে হতে লাগল, আমি আমার নীরবতার নাগপাশ ছাড়িয়ে আবার ওপরে উঠছি। আমি সেই পরম তীর্থের মুখো-মুখি দাঁড়াচ্ছি।

"কে?"

হঠাৎ গান বন্ধ করলেন বিনায়ক। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "কে?"

চমকে বাজনা থামিয়ে তাঁবুর দরজার দিকে তাকালাম। দেখলাম, অনসূয়া চৌধুরী দাঁড়িয়ে। মুহূর্তকাল। তার পরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছুটে বাইরে গেলাম। মুহূর্তের জন্য তাঁকে দূরে দেখলাম। গন্ধর্বকন্যার এক ছায়ার মত। এগোতে গিয়েও আর সাহস হল না।

তাঁবুতে ফিরলাম।

অধীর আগ্রহে বিনায়ক বললেন, "কে সঞ্জয়?"

"একজন যাত্রী—গান শুনছিল আপনার।"

"পুরুষ, না স্ত্রীলোক?"

"পুরুষ। এবার ঘুমুন আপনি।"

বিনায়ক বললেন, "শিব—শিব।"

বিনায়ক শুয়ে পড়লেন। হয়ত ঘুমুলেন। কিন্তু আমার ঘুম এল না অনেকক্ষণ। অনসূয়া এসে কার দিকে তাকিয়ে ছিলেন? বিনায়কের

দিকে? না, আমার দিকে? বুঝলাম না। শুধু স্থির করলাম যে, ভোরবেলা আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাব। প্রেতের মত, রাহুর মত আমি অনসূয়ার অনুসরণ করব। তাঁর ঘৃণার কি শেষ হবে না একদিন?

কিন্তু হায়, যখন ঘুম ভাঙল তখন শুনলাম যে, রাতের তৃতীয় যামে সেই ঘোর শীতের মধ্যেই অনসূয়ার দল তাক্‌লাকোটের দিকেই চলে গেছেন। দলের প্রায় অর্ধেক ছিল তাতে। দলচ্যুত বাকি লোকেরা রাগারাগি করে বলাবলি করছিল যে, ওই মিসেস মুখার্জি বড় জেদী মেয়েছেলে। শুনলাম যে, তিনি বোম্বাই থেকে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট দল। বুঝলাম যে, সুপ্রকাশ মারা গেছেন।

বিনায়কের দিকে তাকালাম। যাব ওঁকে ছেড়ে? আমি একচক্ষুহীন পুরুষ, আমার জিদ অনসূয়ার চেয়ে অনেক বেশী তা আমি প্রমাণ করেছি। যাব? কিন্তু বিনায়কের সেই সাধুর মত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা ভেঙে গেল। না, না—বিনায়ককে নিয়ে চলা মানেই অনসূয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা। আমার এই যুদ্ধই অনুরাগের চিহ্ন। না, না—আমি ঈশ্বরকে পাব না জানি, কিন্তু বিনায়ককে পেতে হবে।

বেলা বাড়ল। হাওয়া বাড়ল। মানসের নীল জল আমার মনের মতই অস্থির হয়ে উঠল। আমরা আবার যাত্রা করলাম কৈলাসের দিকে। কিন্তু মানসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছতেই বিকেল হল। আমরা তখন মানস আর রাবণ-হ্রদের মধ্যবর্তী খালটার ধারে তাঁবু ফেললাম।

আবার দিন গেল। সন্ধ্যা হল। চাঁদ উঠল। কৈলাসের স্বপ্নে বিভোর বিনায়ক শাস্ত্রালোচনা শুরু করলেন। কিন্তু আমার মনে তখন অজস্র কীটে কুরে খাচ্ছে। আমার খালি ভুল হতে লাগল।

বিনায়ক হেসে বললেন, "কাল তার দর্শন হবে সঞ্জয়?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

বিনায়ক তানপুরায় ঝঙ্কার তুলে গাইতে শুরু করলেন। পূরবী থেকে শ্রী রাগে, শ্রী রাগ থেকে দরবারীতে গেলেন তিনি। বাজাতে আজ ভাল লাগছিল না আমার, তবু বাজিয়ে চললাম। ক্রমে আঙুলগুলো অবশ হয়ে এল।

হঠাৎ গান বন্ধ করে বিনায়ক বললেন, "কে?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কেউ না।"

"আচ্ছা সঞ্জয়, কাল কে এসেছিল?"

বললাম, "একজন লোক।"

বিনায়কের অন্ধ চোখে কি দৃষ্টি ফিরে এল? আমার দিকে ফিরে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সত্যি করে বল—স্ত্রীলোক?"

হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠলাম। ভগবানের সামনে যে দাঁড়াতে চায় তাকে আমি কেন সত্য কথা বলব না? সত্যই ত ভগবান! দাঁড়াক সে ভগবানের মুখোমুখি!

বললাম, "সত্যি কথা বলব?"

"বল সঞ্জয়।"

"অনসূয়া দেবী এসেছিলেন।"

তানপুরা নামিয়ে রেখে বিনায়ক হাসলেন, "অনসূয়া তা হলে মরেনি?"

"তাই ত মনে হচ্ছে!"

"রথীদা আর শ্যামকাকা তা হলে মিছে কথা বলেছিলেন? বুঝেছি কেন বলেছিলেন। শিব—শিব।" বিনায়ক আবার তানপুরা তুলে নিলেন, বললেন, "সত্যই ভগবান সঞ্জয়—সেই সত্য তুমি গোপন করেছিলে?"

জবাব দিলাম না।

প্রশান্ত হেসে বিনায়ক বললেন, "বাজাও ভাই।"

বললাম, "আমার হাত ফেটে গেছে।"

"আহা, তা হলে তুমি শোও—আমি আরও গাইব।"

তিনি মধুর কণ্ঠে শুরু করলেন—

"ধন ধন ভাগ, সুহাগ তেরো,
তু পিয় কে মন ভাই—"

বিনায়কের উদ্দেশে মাথা নিচু করলাম। যে ভয়কে আমি বজ্রাগ্নির মত ভয়ংকর ভেবেছিলাম তা এক ফুঁয়ে যেন কোথায় উড়িয়ে দিলেন বিনায়ক। বিনায়ক ভগবানকে পেয়েছেন। আমি হীন, নরাধম, লালসাতুর। তবু বিনায়কই আমার সাধনা। সে সাধনায় আমি সিদ্ধি পেয়েছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। বিনায়কের গানের স্রোতে স্রোতে কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙল। রাতের বেলা অমন বন্দুক ছাড়ি আমরা। ডাকত না আসে সেই ভয়ে। কিন্তু চোখ মেলে ঘরের ভেতর আলো দেখলাম, অথচ বিনায়ককে দেখলাম না। ছুটে বাইরে গেলাম। দেখলাম, আরও দু-চারজন বেরিয়ে এসেছে। দূরে মানসের নীল জলে আজও চাঁদের আলো। স্থির, অচঞ্চল জল এখন। আর তেমনি স্থির ও অচঞ্চল হয়ে রক্তাক্ত দেহে পাথরের ওপর পড়ে আছেন বিনায়ক। বন্দুকটা ছিটকে দূরে পড়েছে। মারা গেছেন তিনি।

তাঁবুর ভেতর গিয়ে দেখলাম, চিঠি রেখে গেছেন।

"সঞ্জয়, আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম। তুমিও ভুল করছিলে। আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, ভাল না বাসলে ঈশ্বরকে সঠিক জানা যায় না। এতদিন যা জেনেছি তা তোমার পুঁথি থেকে পড়ে। শোনানো কথা দিয়ে।

কিন্তু জানা আর অনুভব করা ত এক কথা নয় সঞ্জয়! আমি ভালবাসতে পারিনি; কারণ, আমি ভালবাসা পাইনি। তাই প্রেমহীন জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটবে না জেনেই আমি মরলাম। আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ঘটনাকে তুচ্ছ করে দিলাম। এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যে, মরবার আগে আজ আমি রাজহংসের মত গেয়েছি। মানসের জলে হাওয়ার দোলা লেগে যে অনন্তের সুর বাজে তা আমি শুনেছি। তুমি ফিরে যাও সঞ্জয়। ইতি—"

ট্রেনের গতি বেড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সঞ্জয়ের কথা থেমে যেতেই নড়ে বসলাম। এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

প্রশ্ন করলাম, "তারপর?"

সঞ্জয় বলল, "আমি সেদিন সেই মানসের তীরে শেষরাতে সত্যকে দেখলাম। দেখলাম যে, এত দিন এক চোখ দিয়ে আমি শুধু অর্ধেক সত্যই দেখে এসেছি। জীবনকে দেখেছি আমি অর্ধেক আলো আর অর্ধেক অন্ধকারে।"

"তারপর?"

"অনেক ঘুরেছি। প্রায় দু বছর অনসূয়াকে খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। শুনেছি, বোম্বাইয়ের সব কিছু স্থাবর সম্পত্তি দান করে তিনি নাকি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমি থামব না, আমি তাঁকে খুঁজে বের করবই।"

"এখন কোথায় যাচ্ছ?"

"টাটানগরে। আমার নতুন মনিব সেখানে। কফি-বাগানের মালিক। কোটিপতি মান্দ্রাজী। ছ শো টাকা মাইনে দেবে।"

"আবার চাকরি করছ? বেশ, বেশ। কি করে এমন চাকরি বাগালে?"

সঞ্জয় ম্লান হেসে বলল, "আমার এক-চোখের কথা শুনেই ভদ্রলোক ভয়ানক খুশী হয়ে গেলেন।"

"সে কি—এ কেমন লোক?"

সঞ্জয় বলল, "এও অন্ধ।"

বা ই শ ন ম্ব র ছ বি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাইশ নম্বরের ছবিখানা নট ফর সেল। কেমন কৌতূহল হল।

কারও কাছে বিক্রি করা ছবি নয়, কাউকে উপহার দেওয়া হয়েছে তাও নয়। ছবি হিসেবেও নিতান্তই সাধারণ স্তরের বলে মনে হল। বিষয়-বস্তুও পুরোনো—একটি মেয়ের প্রোফাইল, জানালার শিক ধরে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। ওস্তাদ পোর্ট্রেট শিল্পী বন্ধুটির এই অনুল্লেখ্য ছবিটির প্রতি এতটা পক্ষপাত কেন, কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

শীতের সন্ধ্যা—সাড়ে সাতটা বাজে। হলে খুব বেশী লোক ছিল না। আর্ট স্কুলের তিনটি ছাত্র দল বেঁধে এক্‌জিবিশন দেখতে এসেছে—বন্ধুটি তাদের একখানা কিউবিস্ট ছবির তত্ত্ব বোঝাচ্ছিল। আমি একটা কোনায় দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলাম ওই বাইশ নম্বরের ছবিখানার দিকেই।

মেয়েটিকে চেনা চেনা ঠেকছে। কোথায় যেন দেখেছি এবং একাধিকবার দেখেছি। কিছু কিছু পরিচয়ও যেন ছিল। কিন্তু কিছুতেই সেটা মনে করতে পারছি না। অথবা এমনও হতে পারে, একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ছবির ওপরে আমার পরিচিত কারও প্রতিফলন দেখছি—কিন্তু বাইরের ডিটেল্‌সে মিলছে না বলে কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের রেখার ভেতরে আনতে পারছি না তাকে।

ওদিকে আলোচনা চলছে বোধ হয় কিউবিজ্‌ম সম্বন্ধেই। পিকাসো নামটা বারকয়েক শুনলাম, একবার ম্যাতিস। এক্স্‌পেরিমেণ্টালিজ্‌ম কথাটার ওপর কে যেন ক্রমাগত জোর দিচ্ছে। একটা দেশলাই জ্বালাবার আওয়াজ পেলাম, এক ঝলক চুরুটের গন্ধও ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে।

ভাবছিলাম, বেরিয়ে চলে যাই; এমন সময় তাকিয়ে দেখি, আর্ট স্কুলের ছেলেরা বিদায় নিচ্ছে। নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হলে রাস্তায় নেমে গেল ছেলেরা। শীতের সন্ধ্যায়—এই কুয়াশা-কঠিন একটা স্তব্ধ বৃত্তের মধ্যে আমরা দুজন মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমি আর আমার আর্টিস্ট বন্ধু।

চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে বন্ধু এগিয়ে এল—এখনও আছ সুকুমার?

—যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অনেক আগেই। কিন্তু তোমার বাইশ নম্বরের ছবিখানা আমাকে আটকে দিয়েছে।

—বাইশ নম্বরের ছবি? হঠাৎ এক ঝলক চুরুটের ধোঁয়া বন্ধুর মুখখানাকে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আড়াল করে দিলে। নিও-মাউণ্ট চশমার নেপথ্যে আরও অস্বচ্ছ হয়ে এল ওর চোখ। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা ঘরের ভারি বাতাসের মধ্যে মিশে গেল—চশমার অন্তরালে চোখ দুটো স্পষ্ট হয়ে গেলে ও বললে, তুমি কি সুচরিতাকে চিনতে?

সুচরিতা! এইবার মনে পড়ল। আর্টিস্টের সঙ্গে একবার তাকে দেখেছিলাম দার্জিলিঙের 'প্লিভা'তে, একবার নিউ মার্কেটে ব্রোকেড কিনতে—আর একবার—আর একবার—ঠিক ধরতে পারছি না।

—দু-একবার দেখেছি বোধ হচ্ছে। হয়ত সামান্য আলাপও হয়েছিল। সারা বাংলা দেশ ছাওয়া তোমার বিশাল বান্ধবীমালায় একটি মুক্তো। কিন্তু যত দূর মনে পড়ছে—আমি হাসলাম—খুব উজ্জ্বল একটি মুক্তো নয়।

—না, তা নয়। আর্টিস্টও হাসল। লক্ষ করলাম, হাসিটা খুব স্বচ্ছন্দ নয়।

—তোমার স্টাডিতে তো মডেলের অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ওই বিশেষ ছবিটির প্রতি এত পক্ষপাত কেন? একেবারে নট ফর সেল?

—তার কারণ, তার কারণ—আর্টিস্ট একবার হাসল—ওই ছবিটি আজ পর্যন্ত আমার মাস্টারপিস।

—মাস্টারপিস! খানিকক্ষণ আমি নির্বোধের মত তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। ছবি ভাল বুঝি সে দাবি নেই, হালের নানা ফর্মের বাঁশবনে আমি ডোম-কানা। সুর্রিয়্যালিস্টদের তো কথাই নেই, ম্যাতিস কিংবা ব্লেক-পন্থীদের পর্যন্ত আমি ভয় করি। কিন্তু দেওয়াল জুড়ে শক্তিমান শিল্পীর এই যে অজস্র প্রতিভার স্বাক্ষর ঝলমল করছে, এর ভেতরে এই ছবিটি মাস্টারপিস! বন্ধুর স্টুডিয়ো তো আমার অপরিচিত নয়। আর্টের সমঝদার না হয়েও আর্টিস্টের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে এইবারে আমার সন্দেহ হতে লাগল।

মনের কথাটা বন্ধু বোধ হয় অনুমান করল। কেমন অস্বস্তিতে উস্‌খুস্‌ করে উঠল একবার।

—এত রাত্রে আর ভিজিটার আসবে না। পার্চেজার তো নয়ই। এস, কোনার দিকের কাউচটায় বসে কফি খাওয়া যাক এক পেয়ালা।

বুঝলাম, এ ওই ছবিটার সম্পর্কেই ভূমিকা। অনুসরণ করলাম ওকে।

বেয়ারাকে কফি আনতে পাঠিয়ে ঘন হয়ে বসলাম দুজনে। কলকাতায় ক্রিস্‌মাসের শীত বেশ নিবিড় হয়ে নেমেছে এবার। ঘরের উজ্জ্বল আলো-

গুলোও যেন কুয়াশার জাল রচনা করছে চারদিকে। চুরুটের ধোঁয়া এখন আর হাওয়ায় মিশিয়ে যাচ্ছে না—শরতের মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছে মাথার ওপর।

আর্টিস্ট চোখ তুলে তাকাল। সামনের দেওয়ালে ওরই আঁকা একখানা ল্যান্ডস্কেপ্—তুষারাকীর্ণ অমরনাথের পাহাড়। ওই ছবিখানা ঘরের মধ্যে, ওর নিও-মাউণ্টের নীলাভ কড়া কাঁচে, এমন কি মাথার ওপর মেঘের মত জমে ওঠা চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যেও একটা সুদূরতা ঘনিয়ে আনল।

—সুচরিতার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ছ বছর আগে এমনি শীতের রাত্রে। সেদিন শিল্পী হিসেবে দেশে আমি অচেনা, সেবারে আমার প্রথম এক্‌জিবিশন। ভিজিটারের সংখ্যা ছিল নামমাত্র, পার্‌চেজারের তো কথাই নেই! তৃতীয় দিন রাত্রে একা বসে বসে ভাবছি, সাত দিনের এক্‌জিবিশনটাকে পরের দিনেই বন্ধ করে দেব কিনা, এমন সময় বাইরে একখানা গাড়ি এসে থামল।

ছোট বেবি ফিয়াট গাড়ি। সেটা আশ্চর্যের নয়, কিন্তু চালিয়ে এসেছিল একা একটি মেয়ে। ছ বছর আগে একটি বাঙালী মেয়ের এভাবে গাড়ি চালিয়ে আসা সুলভদর্শন ছিল না। লঘু হাতে স্টিলের দরজাটা বন্ধ করে যখন সে এক্‌জিবিশন হলে এসে পা দিল, তখন আমি মুগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

মেয়েটি আমায় তাকিয়েও দেখল কিনা, জানি না। সহজ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নিজেই গেল উঁচু টেবিলটার দিকে, একখানা এক্‌জিবিট ক্যাটালগ তুলে নিলে, তারপর ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে লাগল। আর আমি যেখানে ছিলাম, সেইখানে দাঁড়িয়েই বেকুবের মত লক্ষ করতে লাগলাম ওর গতিবিধি।

ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত একখানা মাঝারি ধরনের ছবির সামনে সে দাঁড়াল। জলার ধারে তালগাছের সারি, আকাশে ঝড়ের কালো মেঘে এক ঝাঁক উড়ন্ত বক—খুব সম্ভব এই ছিল সাব্‌জেক্ট। প্যাস্টেলে আঁকা নিতান্তই সাধারণ নেচারের ব্যাপার—অ্যাম্বিশাস ছবি নয়। কিন্তু মেয়েটি যেরকম মুগ্ধভাবে ছবিখানা দেখতে লাগল, তাতে মনে হল, বেশ পছন্দ হয়েছে। হয়ত কিনেও ফেলতে পারে।

মনটা আশায় উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ধার করে এক্‌জিবিশন দিয়েছি—হাতের আংটি আর সোনার ঘড়িটা বেচে দেনা শোধ করতে হবে মনে মনে ভাবছিলাম। কিন্তু বেবি ফিয়াটে করে এমন সময় যে মেয়েটি ছবি কিনতে এল, সে যে মাত্র পঞ্চাশ টাকার একটা জিনিসকে পছন্দ করে বসবে, এইটেই ভারি পীড়াদায়ক ঠেকছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখ একবার। এমনি একটি নির্জন রাত্রে একা

একটি হল-ঘরে আমি আর মুগ্ধ তরুণী ভক্তটি। সে-কাল হলে হয়ত এক-ছড়া গজমোতির হার এসে পড়ত শিল্পীর গলায় এবং সেই সঙ্গে—। কিন্তু এ যুগে অতটা দুরাশা আর নেই—তা সে পরিবেশটা কালিদাসের কালের মতই হোক কিংবা যাই হোক। আমি শুধু প্রত্যাশা করেছিলাম, হাতের ব্যাগটি থেকে নেহাত যদি একখানা এক শো টাকার নোটও বেরিয়ে আসে, তা হলে কাল অন্তত দুটি রাঘব-বোয়াল পাওনাদারের মুখ আমি বন্ধ করতে পারব।

মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকাল। ইঙ্গিত বুঝে আমি এগিয়ে গেলাম।

—আপনি?

—আমিই আর্টিস্ট শ্রী—

—ওঃ, আপনিই আর্টিস্ট? দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আমার দিকে প্রশংসাগভীর দৃষ্টি ফেলল—চমৎকার ছবি আপনার! ভারি আনন্দ পেলাম।

বিগলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

—এই ছবিটা আমি কিনতে চাই।

—বেশ, নিন।

মেয়েটি ব্যাগ খুলল—দামটা তা হলে—

পুরো দামটা নগদ পেলে তখন আমি বেঁচে যাই, কিন্তু এমন একটি চিত্তহারিণী পেট্রনের কাছে কাঙালপনা করতে বাধো বাধো ঠেকছিল। বললাম, দামের জন্যে এখন আটকাবে না। আপনি নাম-ঠিকানা দিয়ে যান, 'বুক' করে রাখব। এক্‌জিবিশনের পরে যখন ডেলিভারি দেব, তখন—

মেয়েটি হাসল—দিতে যখন হবে, তখন আগে দিয়ে রাখাই ভাল। ললিত ছন্দে, সরু সরু লীলায়িত আঙুলে পাঁচখানা দশ টাকার নোট দিলে আমার দিকে।

এক্‌জিবিশন দিতে এসেছি শুধু পাব্‌লিসিটির জন্যে নয়, কিছু টাকার জন্যেও বটে। তা ছাড়া এও জানি, কলকাতার অভিজাত পরিবারের শৌখিন মেয়েরা করুণাময়ী হয়ে কিছু কিছু ছবি না কিনলে অনেক অর্ধাহারী আর্টিস্টকেই উপোস দিতে হয়। তবু এই রাত্রিতে—এমনি একটি রোমাঞ্চিত অবসরে এ টাকাটা নিতে অত্যন্ত বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গদ্‌গদ কণ্ঠে বলা উচিত ছিল : 'যত চাও তত লও তরণী পরে'—এবং শেষকালে স্বরকে আরও গভীর করে বলা যেতে পারত : 'এখন আমারে লহ করুণা করে—' সেখানে আমি পত্রপাঠ পঞ্চাশটা টাকা ওয়ালেটের ভেতরে পুরে ফেললাম। মাঝে মাঝে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের পৌরুষের কি মর্মান্তিক অপমান যে সহ্য করতে হয়!

[এইখানে বেয়ারাটা কফি নিয়ে এল। আর্টিস্ট একবার বললে, কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' আমি ভদ্রতা করে বললাম, না—মন্দ কি! যদিও কফিটা তেতো লাগছিল, দুধ-চিনির মাত্রাটা বড্ড কম মনে হচ্ছিল। তখন মনে পড়ে গেল, কফি খেতে আমার ভাল লাগে না—এ কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল আর্টিস্টকে। দুজনের দুটো আলাদা ভাবনার রেখা টেনে আমরা কফি শেষ করলাম। ও ওর নেবা চুরুটটাকে ধরাল, আমি পকেটে একটা সিগারেট খুঁজলাম—পেলাম না। কেস্‌টা খালি হয়ে গেছে। ওর কাছে কড়া একটা বর্মা চুরুটই চাইব কিনা, ভাবতে ভাবতেই ও আবার শুরু করল।]

বেবি ফিয়াটে স্টার্ট দিয়ে মেয়েটি যখন বিদায় নিলে, তখন আমার মনে হল, ব্যাপারটা বড় আকস্মিক। একটা ভারি সুন্দর গানের চমৎকার অন্তরাটার প্রথম কলি গেয়েই কেউ যদি আসর থেকে উঠে যায়, তা হলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বাইরে শীতের আড়ষ্ট পথটা অনেকক্ষণ ধরে পোড়া পেট্রলের গন্ধ বয়ে ওর স্মৃতিতে মন্থর হয়ে রইল। হাতের কার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম : সুচরিতা দাশ, —নং বালিগঞ্জ প্লেস।

জানই তো, বান্ধবীভাগ্য আমার মন্দ নয়। কিন্তু সুচরিতার মত মেয়ে এর আগে কখনও আমি দেখিনি। একটা অদৃশ্য টান অনুভব করতে লাগলাম। এক্‌জিবিশনের পরে নিজের হাতে ছবি নিয়ে যেদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম, সেদিন দু ঘণ্টার আগে আর উঠে আসা গেল না।

তারপরে দু বছরের একটা অধ্যায় আরম্ভ হল। সে অংশটা তোমার অন্তত জানা। আমাদের ঘনিষ্ঠতা একটু একটু করে মুখরোচক হয়ে উঠতে লাগল। ব্যাপারটা হয়ত আরও খানিক গড়াত—যদি না এর মধ্যেই দার্জিলিঙের ঘটনাটা ঘটে যেত।

—দার্জিলিং? আমি নড়ে উঠলাম।

—হ্যাঁ, তোমার মনে থাকতে পারে। সে বছর জুন মাসে তুমিও দার্জিলিঙে ছিলে বোধ হচ্ছে। একটা ধুসো কোট গায়ে চড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আসতে উদয়চাঁদ রোড দিয়ে।

ঠিক এই রকম একটা জমাট গল্পের ভেতরে আমার ধুসো কোটের উল্লেখটা ভাল লাগল না। বিরস মুখে বললাম, হুঁ, আমার মোটা টুইডের কোটটা। কিন্তু তোমাকেও আমি দেখেছি অনেকবার। একটা অত্যন্ত সিলি লাল-নীল-হলদে ছাতা মাথায় দিয়ে ম্যালে হাঁ করে ফগ গিলতে।

চুরুটটা ভাল লাগছিল কিনা জানি না, আর্টিস্ট সেটাকে মেজেয় ফেলে পা দিয়ে পিষতে লাগল। হয়ত চুরুটটাকে বিধ্বস্ত করে আমার কুদর্শন কোটটাকে ক্ষমা করল এ যাত্রা। তারপর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে তুলে বললে, সেই ম্যালে আমার সঙ্গে সুচরিতাকেও তুমি দেখেছিলে।

—তা দেখেছি। আমি সংযোজন করলাম—প্লিভাতে দেখেছি চা খেতে। স্মৃতিতে টান পড়তে লাগল—একটা ক্যামেরা নিয়ে উবু হয়ে মেয়েটির ছবি তুলতে দেখেছি বটানিক্সের ফ্লাওয়ার বেডের সামনে। সিঞ্চল লেকের কাছে পাশাপাশি বসে খেতে দেখেছি চকোলেট—

আর্টিস্ট বললে, অর্থাৎ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স ঘটবার আগের অধ্যায়টুকু মাত্র দেখেছ। কিন্তু শেষ দৃশ্যটা ঘটল ঘুমের মনাস্টারিতে। সেখানে তুমি ছিলে না।

শুধু তুমি কেন—কারও কি থাকবার সম্ভবনা ছিল? একটা কুয়াশা-ঘেরা অদ্ভুত শীতের রাত্রে সুচরিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল—ঠিক সেই রকম আরও শীতল, আরও গভীর কুয়াশার মধ্যে সে পরিচয়পর্বে ছেদ ঘটল। তফাত এই, সেটা দিনের বেলা। কিন্তু পাহাড়ের কুয়াশার কথা তো তুমি জান। এক একদিন এমন নিবিড়, এমন পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে সে আসে যে, রাত্রি আর দিনকে সে একাকার করে দেয়, সময় যেন তার ধূসর গম্ভীর বৃত্তটার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

দার্জিলিং থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এলাম, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি আর কুয়াশার সঙ্গে রোদের লুকোচুরি চলছিল। কিন্তু মাইলখানেক উঠতেই ঘুমের স্বভাবকালো আকাশ আরও কালো হয়ে উঠল। হাল্কা বৃষ্টির সঙ্গে কুয়াশা আরেও নিবিড়—আরও নিতল হয়ে আসতে লাগল। পাহাড়-জঙ্গল, ঘর-বাড়ি যেন একটা বিরাট সাদা ক্যান্ভাসে পরিণত হল, আর চারদিকের পৃথিবী তার মধ্যে জেগে রইল জলো-কালির ছিটের মত।

সুচরিতা একবার বললে, আজ ফিরে গেলে হত না?

বললাম, পাগল! ফিরব কেন? আজই তো দুজনের বেড়াবার মত দিন! আজকের প্রতিটি মুহূর্ত একান্তভাবে তোমার-আমার জন্যেই। তাই পৃথিবী আমাদের চারিদিকে পর্দার আড়াল গড়ে দিয়েছে।

এত ভাল করে কথা গুছিয়ে বলতে পারি, এ আমি নিজেও কোনদিন জানতাম না। কখনও কখনও এমন হয় সুকুমার, বিশ্বাস কর, মানুষ নিজের কথারই প্রেমে পড়ে। তৈরি করে বলা কথাটাই মনের ভেতর এমনভাবে গুঞ্জন করে বেড়ায় যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে জেনেও সেইটেই শেষ পর্যন্ত প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমারও তাই হল। নইলে এই নিতল শুভ্র কুয়াশা, উইন্ড-স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে আসা চাবুকের মত এই কন্কনে বাতাস, এই শির্শিরে বৃষ্টি—দার্জিলিঙের পাহাড়ে এর চেয়ে অস্বস্তিকর আর কিছু নেই। সুচরিতা আগে থেকে না বললে হয়ত আমিই বলতাম, আজ ফিরে যাওয়া যাক। কিন্তু নিজের কানে ভাল লাগা ওই কথাটা আমাকে পেয়ে বসতে লাগল। সাদা ক্যান্ভাসের ওপর জলো-কালির

ছিটের মত সরে সরে যাওয়া ল্যান্ডস্কেপের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতে লাগল : সত্যি সত্যিই আজকের দিনটা আমাদের দুজনের জন্যেই বুঝি সৃষ্টি হয়েছে!

সুচরিতা আর কোন কথা বলল না—আমিও না। শুধু কাছাকাছি বসে, ওর নিশ্বাসে নিশ্বাসে উড়ন্ত ধোঁয়ার রেখা দেখতে দেখতে আশ্চর্য একটা তৃপ্তির মধ্যে আমি মগ্ন হয়ে গেলাম। ঠাণ্ডায় ওভারকোটের পকেট থেকে হাত বের করতে ইচ্ছে করছিল না, নইলে কিছুই বলা যায় না—আমি হয়ত প্রোপোজ করেও বসতাম ওকে।

একটা বিশৃঙ্খল পাহাড়ী পথে ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে আমাদের ট্যাক্সিটা ঘুমের বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

দুটো বর্ষাতি চড়িয়ে নামলাম দুজনে। মন্দিরের চত্বরটা তখন ফাঁকা। এই দুর্যোগের দিনে আর কারই বা এমন করে বেড়াতে আসবার শখ চেপেছে? কাছাকাছি এক-আধজন শ্রমণকে পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। জমাট আড়ষ্ট ঠাণ্ডায় তারা কোথায় ঘন হয়ে বসে আছে, কে জানে!

মূল মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছাদ পর্যন্ত উঁচু বুদ্ধের বিশাল মূর্তি। আশেপাশে অজস্র তান্ত্রিক দেবদেবী আর ধর্মগুরুর দল, রাশি রাশি পুঁথি, বিশাল ঘণ্টা। বাইরের ধূসর গভীর কুয়াশার সঙ্গে তুলনায় এই স্তব্ধ-স্তিমিত ঘরটি আশ্চর্য রকমে উজ্জ্বল। বিদ্যুতের আলো ঝলমল করছে মূর্তিটির বিরাট শরীরে—প্রশস্ত ললাটের হীরেটা ক্রুদ্ধ তৃতীয় নেত্রের মত দপদপ করে জ্বলে উঠছে।

সে একটা আশ্চর্য অনুভূতি! মনে হল, এতক্ষণ ধরে আমরা পাহাড়ের পথ বেয়ে আসিনি—আমরা এসেছি এক মহাশূন্যতার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে। পথে যেগুলোকে কালির ছিটে বলে মনে হয়েছিল—সেগুলো আমাদের লৌকিক স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ। জীবন পেরিয়ে, মৃত্যু পেরিয়ে—লোক-লোকান্তরে সমস্ত চৈতন্যের সীমা পার হয়ে, আজ এই মুহূর্তে আমরা মহাকালের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। বাইরের হাওয়ার শব্দ—বৃষ্টির শব্দ—ওসব সেই শূন্যতার মহাক্রন্দন!

একটা কথা বলি সুকুমার, কখনও ভুলো না। যাকে ভালবাসতে চাও, যাকে ছুঁতে চাও, যাকে পেতে চাও, তাকে নিয়ে কখনও এই বিরাটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িও না। যেখানে তুমি সম্রাট ছিলে, সেখানে ডেকে এনো না মহাসম্রাটকে। তোমার নিজেকে কখনও এমন করে ছোট হতে দিও না। যদি পার, 'সেইখানে গিয়ে দাঁড়িও—যেখানে আকাশ তোমার প্রয়োজনে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, যেখানে তুমি নিজের হাতে তুলে খোঁপায় পরিয়ে দিলে তবেই ফুলগুলো সুন্দর হয়ে ওঠে, যেখানে তোমার কথা

শুনেই লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে দিনান্তের রাঙা মেঘ। যে পৃথিবী তোমারই জন্যে, সেইখানেই তোমার প্রতিষ্ঠা; কিন্তু যে পৃথিবীতে তুমি একটা কীটের মত তুচ্ছ হয়ে গেছ—যাকে তুমি ভালবাস তাকে নিয়ে কখনও সেখানে যেও না! প্রকাশ ক'রো না নিজের দীনতাকে!

যে উপলব্ধিটা এতক্ষণ আমাদের মনের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, এই-বারে আচমকা তার ঘোর ভাঙল। সমস্ত মন্দিরটা কাঁপিয়ে আকস্মিক-ভাবে উঠল ঘণ্টাধ্বনি। একটা গভীর গম্ভীর মন্দ্র মন্দিরের ছায়া-জমাট কোনায় কোনায় প্রতিধ্বনিত হল, বুদ্ধের নিস্তব্ধ বিরাট মূর্তিটার ওপর দিয়ে তা যেন আলোক-তরঙ্গের মত দুলে দুলে বয়ে যেতে লাগল, ললাটের হীরেটায় লকলক করে উঠল একটা অগ্নিফলক। ঘণ্টা প্রতিটি শব্দ-সংঘাতে যেন হাজার হাজার অলৌকিক কণ্ঠে বাজতে লাগল : ওঁ মণিপদ্মে হুং—ওঁ মণিপদ্মে হুং—

আর তখনই সেই মুহূর্তে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল সুচরিতা। তার দুই চোখ থেকে হীরের দীপ্তিটা যেন প্রতিফলিত হয়ে পড়ল—সাপের জিভের মত কি যেন দুলে গেল চোখের ভেতরে।

চাপা গলায় সুচরিতা বললে, আমি তোমায় ঘৃণা করি।

বিশ্বাস কর সুকুমার, একটুও আশ্চর্য হইনি। যে মুহূর্তে এই মন্দিরে পা দিয়ে ওই মূর্তিটার দিকে তাকিয়েছিলাম, যে মুহূর্তে শীতার্ত কুয়াশা, চাবুকের মত হাওয়া আর কান্নার মত বৃষ্টি আমাদের চারদিকে শূন্যতার ওই রকম একটা পরিবেশ রচনা করেছিল, সেই মুহূর্তেই আমি জানতাম : ঘটবে—ওই রকম একটা কিছু ঘটবে।

সুচরিতা বললে, আজ দু বছর অজিত হালদারকে আমি ভুলে ছিলাম। সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা অজিত হালদার—কবাটের মত চওড়া বুক। ইস্টার্ন রাইফেল্‌সের মেজর সে—বর্মার সেগুনবনে রাইফেল নিয়ে এখন সে লড়াই করছে জাপানীদের সঙ্গে। এখন মনে হচ্ছে, তুমি তার পায়ের ধুলোরও যোগ্য নও।

আর বলবার দরকার ছিল না। কারণ, মূর্তিটার কপালের হীরেতে তখন দুলছে সেই অগ্নিফলক, তখনও ঘরময় রণিত হচ্ছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি : ওঁ মণিপদ্মে হুং—

কি করে মন্দির থেকে বেরিয়ে দার্জিলিঙে এলাম, তা মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে, পরদিন সকালের ট্রেনেই আমি ফিরে এলাম। একা। ফিরে এলাম কলকাতায়। যে কলকাতা আমার মনের রঙে রাঙানো—যে কলকাতাকে আমি আঁকড়ে ধরতে পারি মুঠোর মধ্যে।

আর্টিস্ট থামল। দম নিলে একবার।

—আমি জানি, বেশীক্ষণ থাকবে না অজিত হালদার। কলকাতার পথ, বেবি ফিয়াট গাড়ি, পথে পথে ট্রাফিক সিগন্যাল, ছোট আকাশ জুড়ে বাড়ি, ট্রামের আর ইলেকট্রিকের তার। চৌরঙ্গির কোন রেস্তোরাঁয় নীল আলো-জ্বলা লাউঞ্জে বসে এর উপযুক্ত জবাব আমি দিতে পারতাম সুচরিতাকে। অজিত হালদার সেখানে একটা ভাঙা কাঁচের গ্লাসের সঙ্গে মিলিয়ে যেত। কিন্তু তবু আর নয়। এমনি কুয়াশা—এমনি একটা বিরাট মূর্তি—এমনি একটা গম্ভীর মন্দ্র ঘণ্টাধ্বনি আবার ফিরে আসবে না—কে তা বলতে পারে!

দেখ তাকিয়ে, ওই বাইশ নম্বর ছবিতে সুচরিতাকে কিভাবে আমি ধরে রেখেছি! জানলাটাকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছি সারি সারি গরাদ বসিয়ে, একটা কৃপার মুষ্টির মত ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছি ভাঙা আকাশের গুঁড়ো। লক্ষ করে দেখ, কত তুচ্ছ ওর বসবার ভঙ্গি—ওর সমস্ত চেহারায় কি শিথিল নগ্ন দীনতা! যদি আবার কোনদিন—কোন এক শীতের রাত্রে ও আমার এই এক্জিবিশনে আসে, তা হলে দেখবে, ও কত ছোট—কত ঘৃণা দিয়ে আমিও ওকে আঁকতে জানি! তাই বলছিলাম, ওই ছবিখানা আমার মাস্টারপিস।

বাইরে হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ন স্বরে মোটরের হর্ন বাজল। দুজনেই চমকে উঠলাম একসঙ্গে। সুচরিতা দাশ? কিন্তু না, সুচরিতা নয়। গাড়িটা তীরবেগে বেরিয়ে গেল সামনের পথ দিয়ে।

আর্টিস্ট বললে, চল, বাড়ির দিকে ফেরা যাক। বেশ রাত হয়ে গেছে।

বেয়ারাকে দিয়ে তালা বন্ধ করিয়ে আমরা রাস্তায় নামলাম। কনকনে হাওয়া—পাতলা কুয়াশা ভাসছে চারদিকে। কলকাতায় নেমেছে ক্রিস্মাসের শীত।

আমি পেছনে, আর্টিস্ট আগে আগে চলতে লাগল। একটা ল্যাম্পপোস্ট পেরিয়ে কি দেখে থমকে গেলাম আমি। আমাদের দুজনের ছায়া একসঙ্গে মিলে একটা সুদীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত করে দিয়েছে পথের ওপর—মনে হল, আমাদের আগে আগে হেঁটে চলেছে অজিত হালদার।

উ জ্জী ব ন

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই ঘরের এক কোণে যেখানে অল্প অল্প অন্ধকার সেখানে চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দুলাল। তার মুখে কথা নেই। আর যেন কিছু করবারও নেই। তবুও সে সব কিছু দেখছিল বোবা একটা পশুর মতো। আর মাঝে মাঝে তার সমস্ত শরীর নাড়া দিয়ে কোথা থেকে কাঁপুনির এক-একটা প্রচণ্ড বেগ আসছিল। কিন্তু না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এখন আর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই তার।

এখন যা কিছু করবার সুধাই করবে। হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলবে পর্দা। দুমদুম এদিক-ওদিক ছুঁড়ে মারবে ওদের দুজনের শখের অনেক ছোট-বড় জিনিস। আর আপন মনে তার অক্ষম স্বামীর সম্পর্কে উচ্চারণ করে যাবে অনেক নির্মম কটু বিশেষণ। ভুল করে একবারও তাকাবে না অন্ধকার কোণে চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা দুলালের দিকে।

কিন্তু দুলাল দেখছিল সুধার ক্ষিপ্র হাতের ওঠা-নামা আর তার শরীরের বিদ্যুৎ-গতি। আর ভাঙার এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে দেখতে মরে যেতে চাচ্ছিল—নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চাচ্ছিল এই কাঠ-কাঠ আগুন-লাগা বীভৎস পৃথিবী থেকে।

হাতিবাগানের ছোট একটা গলির এই বাড়িতে আজই ওদের শেষ রাত। কাল খুব ভোরে—সামনের সস্তা চায়ের দোকান খোলবারও অনেক আগে হাওড়া স্টেশন থেকে একা সুধাকে ট্রেনে তুলে দেবে দুলাল। তারপর আবার ফিরে আসবে এখানে। থাকবার জন্যে নয়; তাদের সংসারের সব জিনিস-গুলো তার এ বন্ধু ও বন্ধুর বাড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে। আবার কবে ওদের কাছ থেকে জিনিসগুলো ফিরিয়ে আনবে, সে কথা জানে না দুলাল। আর বাপের বাড়ি থেকে আবার কবে সুধাকে কলকাতায় আনতে পারবে তাও তার জানা নেই। তাই থেকে থেকে সে কাঁপছিল।

ছোট হলেও একটা সাজানো সংসার দুলালের চোখের সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু অন্ধ আক্রোশে উন্মাদ হয়ে যে ভাঙছে—আশ্চর্য—তার চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। যেন খুব তাড়াতাড়ি ঠিক সময়ের অনেক আগে দুই হাতে সব চুরমার করে সুধা এখান থেকে চলে যেতে চায় তার অকর্মণ্য স্বামীর ছোঁয়া বাঁচাতে। যদি সে কাঁদত কিংবা করুণ একটা ছায়া

ফুটে উঠত তার মুখে, তা হলে হয়তো দুলাল সান্ত্বনার দু-একটা কথা বলতে পারত তাকে। কিন্তু অভাবে আক্রোশে চোখের সব জল শুকিয়ে গেছে বলে তাকে সে অবসর দেয় না সুধা।

চুপচাপ দুলাল। আর, এখন সারা ঘরে বোবা অন্ধকার। তার কাটা হয়ে গেছে বলে আজ জোরালো আলোর রেখা কাঁপবে না এখানে। জানলার কাছে মিটমিট করে একটা সরু মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা শিখা হেলছে, দুলছে। সেই আলোয় তাড়াতাড়ি ভাঙার কাজ সারছে সুধা।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসে দুলালের। চমকে উঠে সে মোমবাতির অল্প আলোয় দেখে, সুধার হাত থেকে কি যেন একটা মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু জিনিসটা কি বোঝবার আগেই আবার দুমদুম শব্দ শোনে সে। ওগুলো হঠাৎ হাত থেকে পড়ে না সুধার। ইচ্ছে করেই আছড়ে আছড়ে সে এক-একটা শখের জিনিস ভাঙে। কৃষ্ণনগরের আহ্লাদী-পেহ্লাদী, পুরীর পুতুল, রথের মেলায় কেনা সুধার কত সাধের অনেক ছোট-বড় মাটির খেলনা।

তখন দুলালের চোখ বড় হয়। ঠোঁট কাঁপে। আর জিভের জড়তাও কেটে যায়। সে এগিয়ে আসে সুধার কাছে। ভাঙা গলায় আপত্তির সুর তোলে, ভাঙছ যে?

তার কথা শুনে আরও জোরে রাধাকৃষ্ণের একটা যুগলমূর্তি দেয়ালে ছুঁড়ে মারে সুধা, ভাঙব না তো কি?

যেন ফিসফিস করে কথা বলে দুলাল, ওই ঝুড়িটার মধ্যে রাখলেই তো হয়! আমি তো কাল সকালেই—

তাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে ওঠে সুধা, ঝুড়ি ভারি হয়ে যাবে না তা হলে? কুলিগিরি করবার ক্ষমতা আছে নাকি তোমার? ওটা মাথায় নিয়ে একা-একা পৌঁছে দিতে পারবে বন্ধুর বাড়ি?

আরও আস্তে কথা বলে দুলাল, দু-একজন কুলি তো ডাকতেই হবে—

আগুনের ঝাঁজের মতো কড়া স্বর বার হয় সুধার গলা চিরে, একটা কুলি না-হয় কমই ডাকলে—বুঝলে? আর যে পয়সাটা বাঁচবে তা দিয়ে আফিম কিনে খেও। তুমি না থাকলে বাপের বাড়িতে মানটা থাকবে আমার—

এবারেও সুধাকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করে দুলাল, মোটে তো কয়েকটা মাস! এর মধ্যে একটা চাকরি যোগাড় করে নেবই আমি। তারপর আবার নতুন বাড়ি ঠিক করে—

খিলখিল করে অদ্ভুত হাসি হেসে ওঠে সুধা, দেখবে, এক-এক করে শেয়াল-কুকুরেরও চাকরি হয়ে যাবে কোথাও না কোথাও, কিন্তু তোমার কখনও কিছু হবে না—

বিষাক্ত তীরের মতো সেই পুরোনো কথাগুলোই হয়তো আবার নতুন করে একে-একে দুলালের দিকে ছুঁড়ে মারত সুধা। কিন্তু দমকা হাওয়ার ঝাপটায় হঠাৎ দপ করে মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা শিখাটা নিবে যায়। ঘরের মধ্যে শুধু আঁজলা ভরে তুলে নেবার মতো নিকষ-কালো অন্ধকার। ওরা প্রথমটায় চমকে ওঠে। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। তারপর সুধা আন্দাজে আন্দাজে হাতের কাছের বাকি জিনিস ঝুড়ির মধ্যে ফেলে। রান্নাঘরের দেশলাই এনে ঠিক এই মুহূর্তে আবার মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নেবার কোনই উৎসাহ থাকে না ওর।

আর যেন পা টিপে টিপে দুলাল এসে দাঁড়ায় জানলার কাছে। সুধাকে দেশলাই এনে দেবার সাহস তার হয় না। আবার যদি চিৎকার করে ওঠে— যদি তাকে এক কথায় ঠেলে দিতে চায় মৃত্যুর জীবন্ত অন্ধকারে! এখন সুধার মুখে কোন কথাই বাধে না। তার মান বাঁচবার একমাত্র সমাধান— দুলালের মৃত্যু।

হাতিবাগানের দোতলার ঘরে দাঁড়িয়ে রাস্তা আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক-চেরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুলাল। ঘরের মধ্যে ঠকঠক ঝপঝপ শব্দ। রাস্তায় ট্রাম-বাসের আওয়াজ। কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়। রিক্‌শাওয়ালা ঘণ্টা বাজায় ঠুংঠুং। ট্যাক্সির হর্ন। ঝুড়ি মাথায় কুলি ছুটে ছুটে যায়। আর হাঁকে ফেরিওয়ালার দল। গরম মুড়ি। চানাচুর। ঘুগনি। আইসক্রিম।

শুধু দুলালেরই কিছু করবার নেই। হ্যাঁ, কর্মের জগতের সব দরজা বন্ধ ওর জন্যে। আর একটা চাকরি যোগাড় করতে পারল না দুলাল। কোথায় না যেতে বাকি রেখেছে সে! কি না করতে চেয়েছে! কিন্তু তার জন্যে কোথাও কোন কাজ খালি নেই। আশায় আশায় শুধু নীরস উপবাসী দিন কেটেছে। শরীরের ঘাম ঝরেছে অনেক। জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়েছে কত! কিন্তু দেখতে দেখতে তার বিশ্রামের একমাত্র কোমল জায়গাটাও শুকনো খটখটে হয়ে উঠল—হারিয়ে গেল। এখন সুধাও তাকে বিশ্বাস করে না—এখন তার কাছেও সে ডাস্টবিনে ফেলে দেবার মতোই [illegible]াল।

অকারণেই কাশি আসে দুলালের। বমি-বমি ভাব। মাথা ঘোরে। চোখ দুটো কটকট করে। ক্ষুধা নেই। তৃষ্ণা নেই। আর বেঁচে থাকবারও কোন সাধ নেই। দেহের মধ্যে থেকে নিজের প্রাণটাকে সে যেন উপড়ে নিতে চায়— যেমন করেই হোক। সে হারিয়ে যাবে—লুপ্ত হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে। কোন চিহ্ন রাখবে না কোথাও। সে না থাকলে কারও কোনই ক্ষতি হবে না।

অন্ধকারে ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে নিজের লুপ্ত হয়ে যাওয়ার দৃশ্য-গুলো একে-একে কল্পনা করে দুলাল। না, সুধা চলে যাবার পর কোন

জিনিসপত্র সে এখান থেকে সরাবে না। শুধু নিজের কাছে আফিমের দামটা রেখে বাকি পয়সা তুলে দেবে সুধার হাতে।

কাল ভোরে হাওড়া স্টেশন থেকে সুধার ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর আফিম পকেটে নিয়েই সে ফিরে আসবে এ বাড়িতে। এত কম ভাড়ায় কি সুন্দর ফ্ল্যাট! এমন বাড়ি আর আছে নাকি কোথাও কলকাতা শহরে! মৃত্যুর ঠিক আগে-আগেও এ বাড়ির ওপর পুরোপুরি মায়া কাটে না দুলালের। এ বাড়ি সে রাখতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও, কিন্তু শেষ অবধি এ বাড়িই রাখুক তার প্রাণহীন দেহ।

দিনের আলোয় শূন্য ঘরের চারপাশে শুকনো চোখে তাকিয়ে দেখবে দুলাল। যেখানে তাদের ছবি টাঙানো ছিল—যেখানে সুধার ছোট আয়নাটা ঝুলছিল আর সস্তা যে টেবিলটার ওপর রেডিওটা ছিল। একে-একে সবই দেখবে দুলাল। সব কথাই ভাববে আবার। সুধার কথাও। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হয়েই ভাববে। কারণ, তখন তাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে কেউ থাকবে না কোথাও। আর, হয়তো ততক্ষণে সুধাও পৌঁছে যাবে তার বাপের বাড়ি। আর কাকে ভয় দুলালের!

কিন্তু শুধু একটা কথাই দুলাল ভুলতে পারবে না। আর কয়েক ঘণ্টা পর যখন আফিমের যন্ত্রণায় ফেনা উঠবে তার মুখ দিয়ে—গোঁ গোঁ কর্কশ আওয়াজ বার হবে—হয়তো মৃত্যুর অনেকদিন পর যখন তার পচা দেহের দুর্গন্ধে সচকিত হয়ে উঠবে পাড়ার লোক আর দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকবে পুলিস আর টেনে-হেঁচড়ে তার বিকৃত দেহ নিয়ে যাবে লাশ-কাটা ঘরে ছুরির আঁচড়ে চিরে চিরে পরীক্ষার জন্যে—হ্যাঁ, তখনও দুলাল ভুলতে পারবে না যে, সুধা তাকে বিশ্বাস করে না—তার কোন মূল্যই নেই স্ত্রীর কাছে।

সবই তো জানে সুধা! দুলালের চেষ্টার কি কোন ত্রুটি ছিল শেষ দিন অবধি? রোদে জলে ঝড়ে নির্লজ্জ ভিক্ষুকের মতো এর কাছ থেকে ওর কাছে যাওয়ার কোন বিরাম ছিল না তার। প্রথম প্রথম আশা দিত সকলে। সমবেদনা জানাত। আবার দেখা করতে বলত—কিছুদিন পরে। আর তখন তাদের কথার ওপর নির্ভর করে দুলালেরও বিশ্বাস জন্মাত—উপায় একটা হবেই।

পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে আর পকেটে একটা পয়সা না থাকলেও সব ক্লান্তি ভুলে হাসি-হাসি মুখে সুধার সামনে দাঁড়াত দুলাল। আর তার চেহারা দেখে আভরণহীন ক্লান্ত দেহটাকে যেন অনেক কষ্টে সোজা করত সুধা। ম্লান চোখ তুলে দুলালকে জিজ্ঞেস করত, কিছু হল?

বেশ জোর গলায় বলত দুলাল, আর একটু কষ্ট কর—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি হবে? বসে পড়ত সুধা। বোধ হয় তখন থেকেই আস্থা রাখতে পারত না দুলালের কথার ওপর।

চাকরি—চাকরি হবে। সুধার গায়ে একটা হাত রেখে তাকে আশ্বাস দিত দুলাল, আর মোটে কয়েকটা মাস একটু ধৈর্য ধর।

লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর মুখে সুধা বলত, ধরব।

সুধা আশা ছেড়ে দিয়েছিল আগেই, কিন্তু দুলাল ছাড়ল অনেক— অনেক পর। যারা তাকে দেখা করতে বলেছিল তারা আবার যেতে বলল তিন মাস পর। তারপর ছ মাস পর। তারপর আশার বদলে দিল উপদেশ, ও বাড়িটা ছাড়ুন। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন বাপের বাড়ি। আগে খরচ তো কমান! যা দিনকাল, আপনার এত খরচ চালাবার মতো চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন— একেবারে অসম্ভব বললেই চলে—

যদিও সামনে কঠিন অন্ধকার, মাথায় প্রবল যন্ত্রণা, আর ভাল করে খাওয়া জোটেনি পর পর অনেকদিন, তবুও দিশা না হারিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে দুলাল নিজের পক্ষ টেনে কথা বলবার চেষ্টা করে, বাড়িটা যদি আপনি দেখেন—মোটে তিরিশ টাকায় আজকালকার দিনে অমন ফ্ল্যাট—একটু থামে ও। হাঁপায়। তারপর ভাঙা স্বরে আবার আস্তে আস্তে বলে, চাকরি আমার হয়তো একটা হবে কিন্তু অমন বাড়ি সারা জীবনে আর আমি পাব না। আর আমার স্ত্রীকে কোথায় পাঠাব বলুন—তার বাপের বাড়ির অবস্থাও তো এমন কিছু ভাল নয়!

কারও কথা শুনতে পারেনি দুলাল তখন। কারও উপদেশ মানতে পারেনি। আর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও ঘুরে যায়নি তার। যেমনভাবেই হোক না কেন, সে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল। আর এতদিনের সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে হাতও পেতেছিল অনেকের কাছে। যে যেমন দিয়েছে তাই নিয়েছে ও। এক টাকা, দু টাকা, তিন টাকা, পাঁচ টাকা। এমন কি, মাঝে মাঝে খুচরো পয়সাও।

তারপর ওর কাছে বড় হয়ে উঠল চাকরির চেয়ে টাকা ধার করার ভাবনা। রোদ্দুরে শুকনো মুখে রাস্তা চলতে চলতে কিংবা অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ও শুধু ভাবত—কার কাছে যাওয়া যায়—কার কাছে টাকা পাওয়া যায়। চাকরির সন্ধান করবে, না টাকার যোগাড় করবে ঠিক করতে না পেরে ও হাত-পা গুটিয়ে পার্কে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে কতদিন। আর কড়া রোদে বাড়ি ফিরে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে সুধাকে, এইবার চাকরি হবেই।

যদিও কিছু না বললেও চলত সুধাকে। কারণ, কৌতূহলের কোন আভাই ফুটে ওঠে না তার চোখে আজকাল। একটা যন্ত্রের মতো সে শুধু হাত-পা নাড়ে। তাকায় না দুলালের দিকে। কোন প্রশ্নও করে না। যেন

আগাগোড়াই তাকে মিথ্যা বলে এসেছে দুলাল—যেন ইচ্ছে করেই কোন চেষ্টা করেনি।

সুধার থমথমে চেহারা দেখে মেজাজটা হঠাৎ বিগড়ে যেত দুলালের। সে বিড়বিড় করে উঠত, সারা দিন এমন কালো মুখ করে থাকবার কোন মানে হয়?

কে তোমাকে বলেছে আমার মুখের দিকে তাকাতে?

বেশ জোরে কথা বলত দুলাল, পরিশ্রম কার বেশী হচ্ছে? তোমার, না আমার? সারা দিন খিদে পেটে নিয়ে ছত্রিশ জায়গায় ঘোরা—

বাধা দিয়ে ফুঁসে উঠত সুধা, আর আমি বুঝি পোলাও-কালিয়া খেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সারা দিন আরাম করি তোমার সংসারে?

তা না করলেও, এমন কিছু বাহাদুরিও কর না। সব স্ত্রীই স্বামীর বিপদে তোমার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করে। আর তারা এমন খিটখিটও করে না।

চিৎকার করে উঠত সুধা, কে বলেছে তোমাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে? হঠাৎ গলাটা যেন ভিজে উঠত তার, নিজে তো পালিয়ে বেড়াও পাওনাদার এড়াতে, আর ওরা কি বলে চিৎকার করে যায়, জান? জান, কি বলে গেছে বাড়িওলা?

দুলালের উত্তরের অপেক্ষা না করে সুধা বলে যেত, তোমার সংসারে তোমাকে একা রেখে একদিন ওই একটা পাওনাদারের সঙ্গেই আমি চলে যাব—

তুমি সব পার—

আর তুমি কি পার শুনি? সারা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাড়ি ফিরে আমাকে বোকা বানাও—

সুধা!

থাম। আমি সব জানি। মিথ্যাবাদী কোথাকার! জল পড়ত না সুধার চোখ থেকে কিন্তু তবু সে তখন হাঁ হাঁ করে কাঁদত।

আর নিদারুণ আঘাতে যেন নড়বড়ে তক্তপোশের ওপর টলে পড়ত দুলাল। কথা বলতে পারত না সুধার সঙ্গে। ওদিকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সুধাও গড়িয়ে পড়ত ঠাণ্ডা মেঝেতে। যেন মুখ দেখতে চাইত না অকর্মণ্য স্বামীর। আর সুযোগ বুঝে তখন একটা সতর্ক কাক এদের দিকে দু-একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে যেত রান্নাঘরের দিকে। কেননা, ও নিশ্চিন্ত যে, কেউই ওকে বাধা দেবে না। তারপরই ডেকচির ঢাকনা উল্টে ফেলবার শব্দ। খাবলে খাবলে ফেলে-ছড়িয়ে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাতগুলো খেত সেই কাক। যেন এরা দুজন দু দিকে পড়ে থাকা দুটো মৃতদেহ। কোন ভয় নেই কাকের।

কি বলবে সুধাকে দুলাল! এখন নিজেই সে ভেঙে পড়েছে।

আশা আর পাওয়া যায় না, টাকাও না। পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেও ওর আর ইচ্ছে করে না। এখনও শুধু যত উদ্ভট কল্পনা ভিড় করে ওর মাথায়। যদি হঠাৎ প্রচুর টাকা ও পেয়ে যায়। যদি উৎকট মড়কে কলকাতা শহরের সব লোক শেষ হয়ে যায়, আর শুধু ওরা দুজন বেঁচে থাকে। ব্যাঙ্কগুলো ফাঁকা। গয়নার দোকানে একটি লোকও নেই। কোথাও দেখা যায় না পুলিস। যা দরকার সবই রয়েছে এখানে-ওখানে ছড়ানো। খুশি-মতো মুঠো মুঠো তুলে নাও।

কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় এ বাড়ির মায়া দুলালের কেটে যায় হঠাৎ। না, এখানে আর থাকা চলবে না। একটা কিছু করতে হবে। এ ভাঙাচোরা সংসার একেবারে ভাঙতে হবে। সুধাকে পাঠাতেই হবে বাপের বাড়ি। চুরি করে, ধার করে কিংবা যেমন করে হোক তার রেল-ভাড়া যোগাড় করে পাঠাতেই হবে। মুদী আর ধারে জিনিস দেয় না। চাল চাইতে গেলে মুখ কালো করে চুপ করে থাকে আশেপাশের বউ আর গিন্নীর দল। কম ভাড়ার এই সুন্দর ফ্ল্যাটে কেমন করে আর বাস করতে পারে ওরা দুজন।

এ সংসার ভেঙে যাক—তবু যেন অনেক হাল্কা হবে দুলালের দেহ। মাথার মধ্যে একটা বিষাক্ত পোকা সারা দিন কটকট করবে না। তাকে খোঁচা মারবার জন্যে কেউ বসে থাকবে না বাড়িতে। যেদিন পয়সা থাকবে সেদিন সে পাইস হোটেলে গিয়ে খাবে, আর পয়সা না থাকলে রাস্তার কলের জল খাবে—উপোস করে কাটাবে। তবু শান্তি থাকবে মনে। তার ক্ষতের জায়গায় কেউ কথার নুন ছিটোবে না। আর কলকাতা শহরে থাকবার জায়গার অভাব! এর উঠোনে, ওর বারান্দায়, পার্কে কিংবা ফুটপাথে সে ঠিক কাটিয়ে দেবে রাত! এখন কিছুতেই তার আর আপত্তি নেই। হঠাৎ এই জটিল পৃথিবীটাও অনেক সহজ হয়ে যায় দুলালের কাছে। এখন সুধাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে এ সংসার ভাঙতে পারলেই সে যেন নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু সুধাকে কথাটা বলতে অনেক সময় নেয় দুলাল। ভয় পায়। ইতস্তত করে। হয়তো ও পাগলের মতো এই গ্রীষ্মের মধ্যরাত্রে হেসে উঠবে। কিংবা ক্ষেপে উঠে চিৎকার করবে। বিদ্রূপে বিদ্রূপে ক্ষত-বিক্ষত করবে দুলালকে। আর তখন ধিক্কারের গ্লানিতে মরে যাবে সে।

তার চেয়ে থাক। কিছু বলবার দরকার নেই। কিছু করবারও দরকার নেই। একদিন দুলাল হঠাৎ আর বাড়ি ফিরে আসবে না। দূরের কোন আশ্রমে চলে যাবে সে। বৃন্দাবন কিংবা হরিদ্বারে। কিংবা কোন গহন অরণ্যে। মুখে দাড়ি, মাথায় জটা, পরনে গৈরিক বসন। যা হয় হোক সুধার। যা খুঁশি করুক সে। দুলাল না থাকলে তো তার কোনই ক্ষতি হবে

না। আর হয়তো সে তখন প্রশ্রয় দিতে পারবে তার মনের কোন সুপ্ত ইচ্ছাকে। হ্যাঁ, তখনও আত্মহত্যার ইচ্ছেটা এত স্পষ্ট করে দেখা দেয়নি দুলালের মনে।

কিন্তু তবুও হঠাৎ সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায় দুলালের। ঠান্ডা হয়ে যায় দেহ। এক পা হাঁটবার শক্তি থাকে না। তখন খুব আস্তে সে ডাকে সুধাকে। যদিও সাড়া পাওয়া যায় না তবুও দুলাল জানে যে, সে ঘুমোয়নি। ইচ্ছে করেই চুপ করে আছে। এখন এত সহজে ঘুম আসে নাকি ওর!

সুধা। আবার একটু জোরেই ভয়ে ভয়ে ডাকে দুলাল।

বিরক্তির একটা ঝাঁক কেঁপে ওঠে তখন, কি?

কোন ভূমিকা না করেই দুলাল বলে, এ বাড়িটা পয়লা তারিখ থেকে ছেড়েই দিই—কি বল?

কোন্ চুলোয় যাবে শুনি? এতটুকু দরদ নেই সুধার স্বরে।

তবুও আহত হয় না দুলাল এই মুহূর্তে। সুধার কোন দোষও দেখতে পায় না। তার আরও কাছে সরে আসে। মাথাটা যন্ত্রণায় জ্বলে গেলেও তার গায়ে একটা হাত রাখে। কিন্তু এক ঝাপটায় দুলালের হাতটা সরিয়ে দেয় সুধা।

এবারেও কোন প্রতিক্রিয়া হয় না দুলালের মরা মনে—তুমি কিছুদিন তোমার বাবার বাড়িতে গিয়ে থাক—

কিছুদিন, না চিরদিন? দুলালের দেহটা দুই হাতে ঝাঁকিয়ে দেয় সুধা, আমার বাবার বাড়িটা কি একটা ধর্মশালা? ভিখিরীর মতো সেখানে যাবার কথা বলতে একটু লজ্জা হয় না তোমার? কেন, তোমার দিকের একটা লোকের কথাও কি ভেবে বের করতে পারলে না?

না। তুমি তো জান, আমার কেউই নেই!

হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে সুধা। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। একবার বোধ হয় কপালও চাপড়ায়। আর দুলালের দেহটা যেন কুঁকড়ে কুঁকড়ে অনেক ছোট হয়ে যায়। নির্লজ্জ পরাজয়ের গ্লানিতে পঙ্গু হয়ে সে তাকাতে পারে না সুধার দিকে।

কোথায় নামিয়েছ তুমি আমাকে! মাঝরাতে ঘর কাঁপিয়ে তীক্ষ্ন চিৎকার করে ওঠে সুধা, এমন কপালও হয় মানুষের! কিন্তু আর নয়—এবার হয় তুমি মর, নয় আমি মরি। উঃ, আশ্চর্য! এমন অকর্মা মানুষও জন্মায় পৃথিবীতে! দু-দুটো বছরে কথার জাহাজ ভাসানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না গো!

ইচ্ছে করলে সুধাকেও আঘাত করতে পারত দুলাল। আরও অনেকের উদাহরণ দিয়ে তাকে ছোট করতে পারত। কিন্তু কোন শক্তি নেই দুলালের।

মান-সম্ভ্রম, দম্ভ—কিছু নেই। যা খুশি বলুক সুধা—সে চুপ করেই থাকবে। অন্য দিকে পাশ ফিরে চুপচাপ মড়ার মতো পড়ে থাকে দুলাল। কিন্তু থাকলে হবে কি, সুধা যেন তার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়েই চলে।

খুব ভোরবেলা হাওড়া স্টেশনে একটা ফাঁকা রেলের কামরায় বসে আছে ওরা দুজন। বেশী লোক নেই। ট্রেন ছাড়তে আর কিছুক্ষণ দেরি।

সুধার চোখ দুটো হিংস্র—ভয়ঙ্কর। মাথার ঘোমটা খুলে পড়েছে, কিন্তু খেয়াল নেই তার। দুলাল তাকে কয়েকবার চায়ের কথা বলেছিল—সে উত্তর দেয়নি। ফিরেও দেখেনি দুলালের দিকে।

আসবার আগে বাড়িটার দিকেও ফিরে তাকায়নি সুধা। পা দিয়ে সব সাধের জিনিসপত্র ঠেলে মাড়িয়ে গটগট করে ট্রাম-লাইনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। আর, একটা কাঠের পুতুলের মতো দুলাল এসেছে ওর পেছনে পেছনে।

তখন একবার মুখ টিপে হেসেছে দুলাল। আর একটু পরে এ বাড়িতে ফিরে এসে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে বলেই হেসেছে। সকলে খুব জব্দ হবে এবার—সুধা; তার যত ভদ্র মিথ্যাবাদী বন্ধুর দল; আর, পরশু সন্ধ্যার সেই কাবুলীটা। তার কাছ থেকেই সুধার যাবার ভাড়াটা যোগাড় করেছে দুলাল।

হাতিবাগান থেকে হাওড়া স্টেশনে আসবার সময় কিছুই টলাতে পারেনি দুলালের মন। ভোরের মিষ্টি হাওয়া, নরম আকাশ, এই পৃথিবীর মধুর একটা ঘ্রাণ—কিছু না। কারও ওপর কোন আকর্ষণই অনুভব করেনি সে। বেঁচে থাকবার ক্ষীণ ইচ্ছেও মনে জাগেনি তার। বরং তাড়াতাড়ি মরবার জন্যে ছটফট করেছে মনে মনে। এই পৃথিবী থেকে পালাতে পারলেই সে যেন বেঁচে যায়।

এখন তাড়াতাড়ি সুধার ট্রেনটা ছাড়লেই হয়। সে সরে যাক দুলালের চোখের সামনে থেকে—কঠিন, বীভৎস গোটা পৃথিবীটাই সরে যাক। শ্রবণ শিথিল হয়ে গেছে দুলালের, আর দৃষ্টিও বোধ হয় অন্ধ হয়ে গেছে। কাউকে দেখে না সে। কারও কথা শোনে না।

কিন্তু এখন সুধা তাকে দেখে এক অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। দুলাল তাকে না দেখলেও সে দেখে। আর ঠিক তখন ট্রেন ছাড়ার চঞ্চলতা জাগে হাওড়া স্টেশনে। আকস্মিক চমকের ঝাপটায় দুলাল উঠে দাঁড়ায়। এবার তাকে নামতে হবে। সুধাকে কিছু না বলেই সে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কোথায় যাচ্ছ?

সুধার রুক্ষ গলার স্বর শুনে ঘুরে দাঁড়ায় দুলাল, এখুনি গাড়ি ছাড়বে, মুখ নামিয়ে সে বলে ওই যে ঘণ্টা দিয়েছে—

আরও তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে সুধার গলার স্বর, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোন্ চুলোয়?

বাড়ি—

সব ভুলে এখানেও যেন বিদ্রুপের হাসি হাসে সুধা, উঃ, বাড়ি দেখানো হচ্ছে! বাড়ি আর আছে নাকি তোমার?

নেই যে, সে কথা তো জানই! এত লোকের সামনে সুধার এই খোঁচা ভাল লাগে না দুলালের, কিন্তু জিনিসপত্রের একটা গতি তো করতে হবে—

হুইশ্‌লের শব্দে চমকে উঠে সুধা বলে, কিছু করতে হবে না। কি করবে তুমি শুনি? স্বরে যেন ঝাঁজালো বিষ ঢালে সে, কি ক্ষমতা আছে তোমার?

তা হলে কি করব আমি এখন?

এখানে ব'সো—

অসহায় দুলাল বিড়বিড় করে ওঠে, গাড়ি ছাড়ছে যে!

ছাড়ুক।

বাঃ, আমি কোথায় যাব?

আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে—

বিব্রত দুলাল বলে, তোমার বাবার বাড়িতে? এই অবস্থায়? না, না—আমি পারব না—

বিষাক্ত সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে সুধা, নিজের বেলায় দেখছি টনটনে জ্ঞান—আর আমাকে রাজরানীর মতো পাঠাবার বেলা সে কথা খেয়াল থাকে না? কেন, আমাকে সেখানে চিরকাল রাখার মতলব নাকি? খবরদার, দরজার দিকে পা বাড়াবে না—ব'সো শিগগির!

কোন উপায় নেই দেখে সুধার পাশে বসে পড়ে দুলাল। গাড়ি দুলে ওঠে। বাইরে তাকিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ছেড়ে ও বলে, না, না—ফিরে তো আসতেই হবে যত শিগগির হয়; কিন্তু অত জিনিস পড়ে রইল—

ক' মাসের ভাড়া বাকি, খেয়াল আছে? ওসব বাড়িওলা তোমাকে দেবার জন্যে বসে আছে! মুখপোড়া ওগুলো নিয়ে নেবে বলে কত জিনিস যে ভেঙে দিয়েছি আমি! তুমি বোকা, তাই কিছু ভাঙতে পারনি।

ধরা গলায় দুলাল বলে, আর কত ভাঙব!

সুধা কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু হঠাৎ যেন তার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, মহেশ্বর!

ট্রেনটা দুলে ওঠে। এগিয়ে যায়। এখনও ভয়ে সুধার দিকে তাকায় না দুলাল। কিন্তু ভোরের তাজা আলোয় তার চোখে ধাঁধা লেগে যায়। আর অনেক দিন পর এই প্রথম প্রচণ্ড ক্ষিধেয় তার বুক জ্বলে।

কিন্তু পরের স্টেশন আসতে এখনও অনেক দেরি।

প্রে ম প ত্র

সন্তোষকুমার ঘোষ

কনক, আমি সুধাময়। তোমাকে যে ভালবেসেছিল এবং যার ভালবাসার ভয়ে তুমি এখন দূরে গিয়ে পালিয়ে রয়েছ।

এ লেখাটা শেষ পর্যন্ত তোমাকে হয়তো পাঠাব না, পাঠাতে সাহস হলেও রুচি হবে না; তবু লিখছি। এই ভরসায় যে, কিছু হালকা হওয়া যাবে। নিজের নামটা আগেভাগে লিখে রাখলুম; ফলে, শেষের পৃষ্ঠাটা তোমাকে প্রথমেই দেখে নিতে হবে না।

মধ্যবয়সী একটা মানুষের ভালবাসাকে ভালুকের মত ভয় পাও, কনক—তুমি কি! একটু যদি ধৈর্য থাকত তোমার, তবে জানতে, সে ভালবাসার নখ-দাঁত কোনটাই নেই। সুতরাং পালাবার প্রয়োজন ছিল না।

এখন তুমি তো অনেক দূরে কনক, সত্যি করে বল তো, তোমাদের জানালা থেকে আমাকে যখন দেখতে, তখন তোমার মনে ঠিক কি ভাব জাগত! মাথার দখল নিয়ে লড়াই করে কাঁচা আর পাকা দু তরফের চুলই যার সাফ হয়ে এসেছে, সেই লোকটি টেবিলে বসে ঝিমোত, গালে তার তিন দিনের বাসী দাড়ি, ঢিলে লুঙিগতে কষে বাঁধা কোমর। লোকটি কলম খুলে কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকত। মাঝে মাঝে লিখত। কি, জান? মানে নেই এমন টুকিটাকি। ছাতের কার্নিসে বসে একটা কাক কাকিনীটার ঘাড়ের রোঁয়া ঠুকরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর একটা অবাক কাঠবিড়ালী একটু দূরে থেকে তাই তারিফ করছে—লোকটি তার খাতায় এই জরুরী খবরটি টুকে রাখল। কিংবা কোনদিন দুপুরের দাউদাউ রাগের পরে বন্ধ পাগল আকাশটা হঠাৎ শোরগোল করে হয়তো কান্না জুড়ে দিয়েছে, লোকটি তখন লেখা ফেলে পিছনেব পানাপুকুরে বৃষ্টির খই ফুটছে কিনা দেখতে দৌড়ল। এসব কোন কাজে লাগে না—না কাহিনী, না ডায়েরি; তবে খাপছাড়া লোকটার কথাই আলাদা।

লুকিও না কনক; আমি জানি, তুমি লুকিয়ে দেখতে। কিন্তু তোমার কি মনে হত! কৌতুক? সম্ভব। ভয়? বোধ হয় না। তখনও আমাকে ভয় করবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু সে যখন কিছুই লিখতে না পেরে কাগজ কুটিকুটি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত, অস্থির হয়ে এদিক ওদিক চাইত, তখন? করুণা কি হত, কনক? কমবয়সী মেয়েরা কি প্রৌঢ় পাগলামিকে করুণাও করে?

দেখ কনক, সময়কে যদি বলা যায় বহতা পানি, এক-একটা বয়স তবে তার পাড়ের এক-একটা বাঁধানো ঘাট; উজান থেকে মানুষ কতটা এল, সে হিসাব যার সিঁড়িতে খোদাই করা আছে। ভাঁটির ঘাটে দাঁড়িয়ে পিছনে চাইলে উজানের ঘাট বড় জোর ঝাপসাভাবে চোখে পড়বে; কিন্তু মানুষ সেখানে কখনও ফেরে না, ফিরতে পারে না।

কেউ যা পারেনি, ভেবেছিলুম আমি তা পারব। জানতুম না, প্রকৃতির নিয়মের উপর জারিজুরি চলে না।

তোমার মনে আছে কনক, আমার বসবার ঘরের জানালাটার পাশে একদিন বিকালে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে ছিলুম? পর্দা সরিয়ে তুমি কি যেন দেখছিলে, শুধু চেয়ে ছিলে। আমি পিছনে এসে দাঁড়ালুম। তোমার কাঁধে সন্তর্পণে একটি হাতও রেখেছিলুম মনে পড়ছে। স্পর্শকাতর লতার মত তুমি কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলে; সরে যেতে চাইলে।

আমার ইচ্ছাটা যদি নিজেই নিজের বিধি হত, তবে সেই মেঘে-ঢাকা কালামুখী বিকেলে ব্যাপারটা কত দূর গড়াত, বলতে পারিনে। একটু দূরে গিয়ে তুমি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছ, আমার দিকে অপলক চেয়ে একটু একটু করে পিছনে হটছ।

হঠাৎ আমি অস্ফুট গলায় নিজেকে বলে উঠতে শুনলুম, "বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালাটা।" বলতে বলতে আমি পাল্লা দুটো নিজেই টেনে ধরলুম। ঠাস-ঠাস চড় পড়ার মত দুটো শব্দ হল। আমি দম নেবার জন্য এক চোখ বুজেছি, তুমি সেই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছ।

কনক, তুমি আজও জান না, সেদিন আমার কি হয়েছিল। কেন হঠাৎ জানালাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম।

আমার স্ত্রী যূথিকা কিন্তু জানত, কেন। বসবার আর শোবার ঘরের মাঝখানে একটাই তো পর্দা, ফ্যানের হাওয়া সেটাকে থেকে থেকে মুঠোর মত পাকিয়ে আবার খুলে দেয়। বিছানায় বালিশের উপর বালিশ সাজিয়ে যূথিকা এদিকেই চেয়ে ছিল, সব দেখেছিল।

একটু পরে যখন ও ঘরে গেলুম, সে বালিশের স্তূপে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল। একটা চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "কে এসেছিল?"

তোমার নাম বললুম।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চোখটাকে বন্ধ করে যূথিকা ভাবনার ভান করল। তারপর দুটো চোখই খুলে বলল, "বুঝেছি। সিনেমায় নামবে বলে ঘোরাঘুরি করছে, পাড়ার সেই খারাপ মেয়েটা, কেমন? তা হঠাৎ অমন দুদ্দাড় ছুটে পালাল কেন?"

সব জানে, তবু আমার মুখে শুনতে চায়। বন্ধ জন্তুকে খোঁচা দেবার বর্বর সুখ।

তিক্ত গলায় বললুম, "জানি না। তুমিই বল না!"

"জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলে বলে।"

চমকে উঠলুম। অত্যন্ত কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, "জানালা কেন বন্ধ করলুম, তাও জান বোধ হয়?"

অদ্ভুত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যূথিকা ধীরে ধীরে বলল, "তাও জানি। জানালার ঠিক বাইরে কচি সজনে গাছটার পাশে ন্যাড়া মরা নিম-গাছটাকে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়েছিলে।"

অনেকদিন কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি, কোন মানুষ যদি হাসতে হাসতে হঠাৎ মরে যায়, তবে তার মুখে কেমন হাসি ফুটে থাকে। চোখের কোল হয়তো একটু কুঁচকে যায়, সামান্য ফাঁক হয় ঠোঁট দুটি। আর তার কোন নড়চড় কিছুতেই হয় না। যূথিকার মুখে সেই স্থির, বোবা হাসি দেখতে পেলুম। কনক, চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে আমি সেদিন যূথিকার চোখের মণি উপড়ে নিতে পারতুম।

আজ বুঝতে পারছি, যূথিকা ঠিকই বলেছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেই খণ্ড-মুহূর্তে সহসা মনে হয়েছিল, মরজন্ম ঘুচে গিয়ে লোকান্তরে আমরা উদ্ভিদ-দেহ পেয়েছি, সবুজ সজীব সজনের ডালের পাশে ন্যাড়া মরা নিম হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি।

জানালাটা সেদিন থেকে বন্ধই থাকত। তবু কনক, তোমার কাছে আজ অকপটে স্বীকার করছি, মাঝে মাঝে এক-একদিন আমি লুকিয়ে জানালাটা খুলতুম। কেন, আমিও জানিনে। মরা নিমের ডালে একটি কি দুটি কচি পাতা ফুটেছে দেখতে পাব, হয়তো গোপন মনে এই অসম্ভব আশা লালন করেছি। চুয়ান্ন বছরের প্রবীণ শরীর একটি বাতুল ইচ্ছার নড়িকে আশ্রয় করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে।

এইখানে যূথিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খোলাখুলি আলোচনা করলে ভাল হয়। উপরে তার যে ছবিটি এঁকেছি তা থেকে যদি ধারণা কর কনক যে, আমরা বিবাহিত জীবনে সুখী হইনি, তবে ভুল করবে। যদি মনে কর, যূথিকা স্বভাবক্রূর সামান্য রমণী, তবে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

আসলে যেদিন যূথিকা হাসপাতাল থেকে দুরারোগ্য অসুখ নিয়ে ফিরে এল, সেদিন থেকেই এই জটিলতার শুরু। সূতিকায় তো কত শিশুই মরে, কিন্তু তাদের মায়ের দেহ-মনে এমন ছাপ আর কেউ রেখে যায় না। যূথিকা জেনে এসেছিল—সে আর কোনদিন মা হবে না। তার চোখের চাউনিই বদলে গিয়েছিল।

প্রথমে দিন কয়েক বিছানাতেই আয়না, চিরুনি, পাউডার আর স্নো নিয়ে পা ছড়িয়ে বসত। মুখ দেখত আর মুখ দেখত। রঙ বুলিয়ে ঠোঁট দুটি করত টুকটুকে। আঙুল দিয়ে সিঁথি চিরে চিরে পরখ করত ক'টা চুল পাকল। গুনত, ভুল করত, ফের গুনত।

হঠাৎ বা কোনদিন জিজ্ঞাসা করত, "এটা কি সাল বল তো?" শুনে নিয়ে হিসাব করতে বসত।..."এক, দুই, তিন...আমার তবে এখন চলছে চুয়াল্লিশ। না, না, হল না—তেতাল্লিশ। কি জানি, ঠিক গুনতে পারছি না। তুমি একবার বলে দেবে?"

ভয় হত, বয়স গুনে গুনে আর পাকা চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাগল না হয়ে যায়।

এ ভাবটা মাস তিনেকের বেশী স্থায়ী হয়নি। একদিন দেখি, শিয়র থেকে সরে গেছে আয়না, বালিশ-বিছানার আনাচেকানাচে থেকে পাউডার, কুমকুম ইত্যাদি বিলাসের সব উপচার অন্তর্হিত।

কাছে যেতেই বলল, "উঁহু, এস না, এস না—আগে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে এস।"

বিস্মিত এবং কতকটা বিরক্তও, জিজ্ঞাসা করেছি, "গঙ্গাজল কোথায় পাব?"

"আছে। চাকরকে দিয়ে আজ আনিয়েছি। তুমি আমাকে গীতা এনে দেবে?"

তিন দিনে যূথিকার এক অধ্যায় গীতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ ছিল না; কিন্তু সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে আমাকে তার ব্যাখ্যা করে শোনাতে বসত কিনা, কনক, মুশকিল ছিল সেখানে। এ বিষয়ে আমার উৎসাহের অভাব তো ছিলই, কিন্তু প্রকৃত সমস্যা অন্য। যূথিকা যত দূর সম্ভব আমার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল। দৈবাৎ গায়ে গা ঠেকত যদি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে গঙ্গাজলের ব্যবস্থা তো ছিলই।

মজা যে একেবারেই পাইনি, তা বলব না কনক। পেয়েছি। প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কত দূর গড়াবে তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

যূথিকা একদিন বলল, "আমি দীক্ষা নেব।"

বললুম, "বেশ তো, নাও না! গুরু-টুরু কি পেয়ে গেছ?"

"গুরু আমার ঠিকই আছে। শোন—তিনি বলেছেন, তোমাকেও দীক্ষা নিতে হবে।"

"আমাকে? আমাকে আবার কেন? তোমার পুণ্যের একটু ভাগ

আমাকে দিও, তবেই বৈতরণী তরে দেখবে, স্বর্গে ঠিক তোমার পাশে গিয়ে হাজির হয়েছি।"

বলতে বলতে, কি সর্বনেশে বুদ্ধি হল, ঝুঁকে পড়ে যূথিকাকে বুকের উপরে টেনে নিতে গেলুম। তীব্র একটা গুলির মত ছিটকে গেল যূথিকা, আলুথালু বেশে ভাঙ্গা-চোরা একটা বাঁশির মত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।" মাথায় ঠক করে কি লাগল। তুলে দেখি, সেই বাঁধানো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলল, "পশু।"

সেই মুহূর্তে আমারও কি জানি কি হল, এই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। সব দিক থেকে নিঃস্ব এই মেয়েমানুষটার কাছে কোনদিন কিছু চাইতে পারব না, চাইলেও দেবার মত কানাকড়ির সম্বলও ওর নেই। শণের-নুড়ি চুল আর শির-ওঠা রোগা রোগা হাত দুটির দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, "বুড়ী!"

পলকে যূথিকাকে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখলুম। "কি, কি বললে?"

কথাটাকে জিভ দিয়ে যেন টাকার মত বাজিয়ে বাজিয়ে বললুম, "বুড়ী। বুড়ী। বুড়ী।"

ভেবেছিলুম, নুয়ে-নেতিয়ে পড়বে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে যূথিকা নিজেকে যেন ফিরে পেল। এক পা এক পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আমার সমুখে। বলল, "বুড়ী? আমি বুড়ী? আর তুমি?"

কি ছিল সেই অপলক চোখে, আমার ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। অত্যন্ত ক্ষীণ, শুকনো গলায় বললুম, "আমি কি?"

আশ্চর্য স্থির এবং প্রশান্ত ভঙ্গিতে যূথিকা বলল, "তুমিও কিছু কালকের খোকাটি নও। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার ছায়াই তোমাকে সে কথা বলে দিত। আমাকে বলে দিতে হত না।"

কনক, আয়নার দরকার হয়নি; যূথিকার চোখে আমি নিজের ছায়া দেখেছি। সে চেহারা এক ভয়াল তান্ত্রিকের। শবাসনে বসেছে—শব তার নিজেরই শরীর। ইচ্ছা-বাসনা, সুখ-স্বপ্ন—সব মটমট করে ভেঙে সামনে জ্বালানো ধুনিতে আহুতি দেবে।

তুলনাটা কিছু বীভৎস হয়ে গেল, হয়তো দুর্বোধ্যও। সোজা করে বলি। সেই সময়ে আত্মহত্যার মত কাঁচা-নাটকীয় একটা কাণ্ড করবার প্রবল লোভ মাঝে মাঝে আমাকে বিচলিত করেছে। পাহাড়ে উঠে চারিদিকে চেয়ে লোকে যে শূন্যতা অনুভব করে, এ তাই। উঠবার পথ খাড়া ছিল, দুর্গম ছিল—কাঁটায়, কাঁকরে, কষ্টে, রক্তে, যন্ত্রণায় মাখামাখি অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন চূড়ায়

উঠেছি, যা কিছু দেখার দেখে নিয়েছি, আর উঠব না, কষ্ট পাব না, কিছু নেব না, শুধু নেমে যাব। আরোহণের পর এই অবরোহণ।

সেই নামেমাত্র বেঁচে থাকাটাকে আমি ভয় করতে শুরু করেছি। স্বাদহীন, স্বেদহীন সেই আলুনী আয়ু নিয়ে আমি কি করব?

কনক, ঠিক এই সময়ে তোমরা এই পাড়ায় উঠে এলে; একদিন লেখার টেবিলে বসে ফরমাশী ফিল্মের স্ক্রিপ্ট্ লিখছি, রাস্তার ও-পাশের বাড়ির ছাদে তোমাকে দেখতে পেলুম।

দেখ, প্রথম দেখাটাকে আমরা এ-কালে আর তেমন মূল্য দিই না, হঠাৎ কোন কিছুকেই না। সব সম্পর্কই পরম্পরা বেয়ে বেয়ে লতার মত জড়িয়ে ওঠে। তবু সেদিন অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখেছিলুম।

ছাদের কার্নিসে কোন কিছু না ধরে পা ঝুলিয়ে বসে আছ—তোমার সেই দুঃসাহসী কিন্তু অনায়াস ভঙ্গির ছবি আমার মনে একেবারে ছাপা হয়ে গেছে। ভাল লাগল। বেপরোয়া, সব কিছু তুচ্ছ করবার ভাবকে ভয় পেলাম। ওভাবে ছাদে পা ঝুলিয়ে আমিও একদিন বসেছি; এখন শরীর ওজনে ভারি, মনও ভীতু, এখন আর পারি না; কিন্তু তুমি পার, আর সেই পারার অহংকার লুকোবার এতটুকু প্রয়াস তোমার মধ্যে দেখলুম না। সেই ঔদ্ধত্য আমাকে মুগ্ধ করল।

তবু সেই মোহ হয়তো শুদ্ধ, নির্গন্ধ সাদা ফুলের মত অনুভূতি মাত্র হয়ে মনে বেঁচে থাকত, কিন্তু যূথিকা প্রথম থেকেই সন্দেহের নখে আঁচড়ে আঁচড়ে তাকে রক্তাক্ত ঘায়ের মত করে তুলল যে। নইলে, তোমার সঙ্গে আমার বয়সের যা ব্যবধান, তাতে আমি দিব্য তোমার পিতৃব্য বনে যেতে পারতুম।

প্রথম বোধ হয় পাড়ারই কি একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তোমাকে গান গাইতে শুনি। সেখানে কার মধ্যস্থতায় আমাদের আলাপ হল জানি না, কিন্তু তার দিন কয়েক পরে তুমি নিজেই একদিন আমার বসবার ঘরে চলে এলে। কার কাছে শুনেছ, আমি সিনেমার জন্যে গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ ইত্যাদি রচনা করে থাকি। স্টুডিও মহলে আমার যাওয়া-আসা আছে। সামান্য পরিচয়ের ভরসায় জানতে এসেছ, আমি কিছু সুবিধা করে দিতে পারি কিনা।

পারি না; কিন্তু তোমাকে সেদিন কথাটা খোলাখুলি বলতে অহংকারে বেধেছিল। আশাও দিইনি। একেবারে নিরাশও করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অবাক হয়ে তোমাকে শুধু দেখেছি। সেই সবে পরিচয়, তবু তোমার এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এই একবার বসলে, এই উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে। মাথায় সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে গিয়ে খোঁপা একবার আলগা হয়ে পড়ল, পিছনে দু হাত নিয়ে কনুই তুলে ফের সেটাকে বিন্যস্ত করলে। সামান্য একটা কথাতেই কৌতুক পেয়ে হঠাৎ হালকা গলায়

হেসে উঠেছ। সেটাও ঈষৎ বিস্ময়কর, কিন্তু তখন অসংগত বা বেমানান মনে হয়নি।

গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বসে ছিলুম বটে, কিন্তু কনক, সেই মুখোশের ছিদ্র দিয়ে আমি তোমাকে অপলক দেখেছিলুম। ঠিক তোমাকে কি? না, তোমার চাপল্যকে। যে চাপল্য আমি ইহজন্মের মত খুইয়েছি, আর পাব না, তাকেই তুমি তোমার শাড়ি-ব্লাউজের মত, তোমার চোখে ক্ষীণ সুর্মা-রেখার মত অসামান্য রুচির সংগে পরে আছ।

যূথিকা সেদিনই টের পেয়েছিল; হেসে বলেছিল, "ও মেয়েটা তোমার কাছে কেন এসেছিল? সিনেমায় নামতে চায় বুঝি?"

সংক্ষেপে বলেছি, "হ্যাঁ।"

যূথিকা তবু থামেনি, গলায় নকল গাম্ভীর্যের ঢঙ এনে বলেছিল, "সাধু, সাবধান!"

"মানে?"

"নিজেই বুঝে দেখ।"

তীব্র কণ্ঠে বলেছি, "আমার বোঝা আছে। তুমি দয়া করে তোমার ছোট মন আর খুঁতখুঁতে নাক নিয়ে এসব ব্যাপারে এসো না।"

"না। আমার আর কি! আমার বিছানার চারপাশে তো তুমি ওষুধের শিশির পাহাড় জমিয়ে রেখেছ, তার লেবেল পড়ে পড়েই আমার দিন কাটবে। কিন্তু আমি হাসছি তোমার কথা ভেবে। ও মেয়ের চোখের দিকে চেয়েছ? দেখেছ, মণি দুটো না-সাদা, না-বাদামী, কি অদ্ভুত রঙের? এসব মেয়ে সর্বনেশে হয়, জেনে রেখো।"

কনক, সেদিন যূথিকার কথায় চটেছি। কিন্তু পাড়ায় তোমার সত্যিই তো সুনাম ছিল না। ওই ক'দিনেই তোমার নামে অনেক খবর কানে এসেছে, কিছু চোখেও পড়েছে। তোমার হাব-ভাব ভাল না, তুমি পুরুষের সংগে বড় বেশী মেশ, এমন কি সদর রাস্তায় প্রকাশ্যেই লোকের সংগে সহাস্য নির্লজ্জ গল্প জুড়ে দাও। এর সংগে দুপুরে হয়তো বের হও রিক্শায়, ওর সংগে সন্ধ্যায় ট্যাক্সিতে। অনেক দিন গভীর রাত অবধিও ফেরনি—হলফ করে এমন কথা বলবারও লোক ছিল।

আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে যূথিকা কোথা থেকে কিভাবে জানি না, সব খবরই যোগাড় করত।

প্রথম দিকে তিন-চার দিন পর পর আসতে, পরে প্রায় রোজই আমাদের বাসায় আসা শুরু করলে। জানতে, কোন্ সময়ে আমাকে বাসায় পাওয়া যায়। যূথিকার সংগেও আলাপ করে নিলে। রোজ তার ঘরেও একবার যেতে, তার কোমরের ব্যথা আর ঘাড়-ফোলাটা কেমন আছে খোঁজ নিতে।

যূথিকা সামনাসামনি তোমাকে কিছু বলত না, কিন্তু মনে মনে জ্বলত, জ্বলত, জ্বলত। আড়ালে যেসব খারাপ গালাগাল মুখে আনত, শুনলে কনক, তুমি কানে আঙুল দেবে।

ইনিয়ে-বিনিয়ে, কথায় বিষফোড়ন দিয়ে বলত, "মেয়েটাকে সিনেমার কাজ এখনও জুটিয়ে দিতে পারলে না বুঝি? তা বাপু আমি বলি কি, ওসব সিনেমা-টিনেমা বাড়ির বাইরে হলেই তো ভাল! বাড়িতে কি ওসব কেউ করে?" বলতে বলতে হাসত যূথিকা, "দেখ, একটা মজার কথা মনে পড়ল। আমার এক দাদামশাইয়েরও এসব রোগ ছিল। থিয়েটারের কার কাছে তিনি রোজ যেতেন। কিন্তু মনে রেখো, যেতেন, তাকে বাড়িতে এনে তোলেননি। সেকালের লোকেরাও তোমাদের খারাপ ছিল, কিন্তু ভদ্র ছিল। বাড়ি আর বাগানবাড়ির তফাত বুঝত। তোমরা দুটোকে এক করে নিতে চাও।"

জবাব দিতে হলে অত্যন্ত কুৎসিত ঝগড়ার ডুবজল পাঁকে নামতে হয়। অতএব কনক, আমি অধিকাংশ দিনই চুপ করে সরে এসেছি।

এসেও পরিত্রাণ পেলাম না।

যূথিকা সেই জানালা বন্ধ করে দেবার ঘটনার চার দিন পরে বিশ্রী রকমের ঠাট্টাটা করল। এই চার দিন তুমি আসনি। অথচ তুমি এখানেই ছিলে। একদিন বিকালে তো মুখোমুখি পড়ে গেলুম। পাড়ার যুব সংঘের পাণ্ডা গোছের একটি ছেলের সঙ্গে তুমি রিক্‌শায় উঠছ। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। মাথার চুল ফাঁপানো, ধূসর শাড়ির আঁচল অন্যমনস্ক, পাশের ছেলেটির সঙ্গে আরও জোরে জোরে হেসে কথা বলেছ।

কনক, সেদিন আমারও মনে হয়েছিল, তুমি সত্যিই বড় খারাপ মেয়ে!

বাড়ি ফিরে কোন কাজে মন দিতে পারিনি। চড়া আলোটা নিবিয়ে নিষ্প্রভ-নীল ডুমটা জ্বেলে শুয়ে পড়েছি। ও-পাশের খাট থেকে যূথিকা বলেছে, "কি হল?"

শুকনো এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি। "মাথা ধরেছে।"

"তবে বালিশ-টালিশ সরিয়ে বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে নাও!"

আধো-অন্ধকারে দেখিনি, ও মুখ টিপে হাসছিল।

বালিশ সরাতে গিয়ে বিষাক্ত বিছের কামড় খেলাম। যন্ত্রণায় গলা অবধি নীল হয়ে এল। কোনমতে বললুম, "এসব কি? কে এনেছে, কে রেখেছে এসব এখানে?"

অত্যন্ত ভালমানুষের ভঙ্গিতে যূথিকা বলেছিল, "কোন্ সব?"

"এই যে কলপ, আর সালসার শিশি?"

নিষ্ঠুর নির্বিকার গলায় যূথিকাকে উত্তর দিতে শুনেছি, "আমি। আমিই বাজার থেকে আনিয়েছি।"

"কেন?" মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে যেন ফেটে পড়লুম। বললুম, "কেন, কেন, কেন?"

ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে যূথিকা ফিসফিস করে বলল, "শ্-শ্-শ্। আস্তে। তোমার সুবিধার জন্যেই। আজকাল আর আসে না—দেখি, সেজন্যে ঘরময় পায়চারি কর, মাথার চুল ছেঁড়। আসল কথা কি, জান? তোমার বয়সকে তুমি ভুলেছ, কিন্তু বয়স তোমাকে ভোলেনি।"

চমকে চাইলুম। একটু দূরেই থরে থরে শিশি-বোতল সাজিয়ে ছোট খাটটার সঙ্গে যূথিকার বি-শ্রী একদা-নারী শরীর মিশে আছে। অস্পষ্ট আলোয় সেদিকে চেয়ে মনে হল, যেন যূথিকা নয়, যেন আমার ভয়ের বয়সটা ছদ্মবেশ নিয়ে আমাকে উপহাস করছে।

কলপ আর সালসার শিশিটা ছুঁড়ে শব্দ করে চুরমার করবার লোভ অতি কষ্টে সংবরণ করেছি। কারণ, আমি ভীরু, প্রৌঢ়, সামাজিক মানুষ। একসঙ্গে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকানোর মত সব রকম আতিশয্যই এ বয়সে বারণ।

কনক, তুমি আমার চোখে কামনার হিসহিস চেরা-জিভকে নড়ে উঠতে দেখেছ, কিন্তু তার আড়ালে পরম-কাপুরুষ সামাজিক মানুষটিকে দেখতে পাওনি। পেলে অন্তত পালাতে না।

সত্যি কথা, সেদিন অনেক রাত অবধি সদর রাস্তায় তোমার জন্য পায়চারি করেছি। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে একটা গাড়ি পলকে অদৃশ্য হল; তুমি সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে বাসায় ঢুকতে যাবে, আমি তোমার পথ আড়াল করে দাঁড়ালুম। বললুম, "একবার আমার সঙ্গে একটু আসবে কনক? কয়েকটা কথা ছিল।"

চমকে ভয়ে ভয়ে বললে, "কোথায়?"

"পার্কে, কিংবা. ধর, কোন চায়ের দোকানে?" এলোমেলো জবাব, হয়তো সেইজন্যেই তোমার সন্দেহ হল। একটু পিছিয়ে গিয়ে বললে, "না, না। আজ থাক। অনেক রাত হয়ে গেছে।" উপর দিকে আকাশে চেয়ে যেন তারাদের সাক্ষী মানলে।

হঠাৎ তোমার কবজিটা চেপে বললুম, "এসই না! বেশীক্ষণের জন্যে তো না! আমার কথাগুলো যে খুব জরুরী!"

অনায়াসে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে, দ্রুত পাশ কাটিয়ে চৌকাঠে পা রেখে ফিরে বললে, "আজ নয়। কাল সকালে আসবেন। আর, আর, দেখুন—" তোমার গলা এখানে একটু কেঁপেছে, "দেখুন, আমাকে যত খারাপ ভাবছেন, আমি ঠিক ততটাই খারাপ নই।"

বেত-খাওয়া জন্তুর মত মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছি।

কনক, আজ তোমার কথাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিই। যতটা ভেবেছিলে, আমিও ঠিক ততটাই খারাপ নই।

মিছিমিছি সেদিন ভয় পেলে কেন? পেলে যদি, এত কেন, যে ভয় হিতাহিত জ্ঞানহীন করে? অন্যথা পাড়ার রকের মুরুব্বী অপদার্থ ছোকরাটার সঙ্গে সাত দিনের মধ্যে পালানোর মত ভুল তুমি করতে না। এ কথা আমি পরে বারবার ভেবে সুখ এবং দুঃখ পেয়েছি যে, ভালবেসে নয়, আমার হাত এড়াতেই তুমি চূড়ান্ত দামে একটা লোকসান কিনেছ।

পাড়ায় অবশ্য তোমার পলায়ন নিয়ে অনেক মুখরোচক গুজব তৈরী এবং ফিরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল, তোমার মাতৃত্ব আসন্ন।

তোমার কারণ তুমি জান, আমার তরফ থেকে একটা কথা তোমাকে খোলাখুলি জানাতে চাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যত চাঞ্চল্যই দেখিয়ে থাকি না কেন, আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, সব রকমের বাড়াবাড়িকেই ভয় করে থাকি। বেশী দূর এগোতাম না। এক, ইচ্ছা ছিল না। দুই, সাধ্যও না।

আজ কবুল-জবাব দেবার নেশায় পেয়েছে, নইলে সাধ্যের কথাটা লিখতে কলম সরত না।

যূথিকাকে একদিন বুড়ী বলে গাল দিয়েছিলুম, মনে আছে? যেদিন সে আমাকে আয়নায় মুখ দেখতে বলেছিল?

ও বিছানা নেবার প্রায় এক বছর পরের কথা। একদিন আমার চোখকান-ঢাকা নীতিবোধের টুপিটা বিকালের হাওয়ায় উড়ে গেল। সন্ধ্যার ঘোর লাগতে বেরিয়ে পড়েছিলুম সেই সুখের সন্ধানে—যা পণ্য। সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সংগ্রহ করতে পারিনি। শুধু গান শুনে আর পান করে ফিরে আসতে হয়েছে। বোবা, বিবাস ইচ্ছাটা শরীর-চেতনায় কিছুতেই ধরা দেয়নি। যূথিকার সালসার শিশির ঠাট্টাটা সাধে কি সহ্য করতে পারিনি!

শ্রাবণের মেঘ যেমন আকাশ ছেয়ে এবং প্রবল জ্বর শরীরেব রক্তকণা ছেয়ে আসে, মৃত্যুর সাধও তেমনি আমাকে সেদিন পেয়ে বসেছিল। কোন কাজে মন ছিল না। ভাবিনি সেই নিরাশা এবং নিষ্ক্রিয়তার সাঁড়াশির চাপ কোনদিন আবার শিথিল হবে।

হয়েছিল। সামান্য ক'দিনের জন্য, কিন্তু হয়েছিল।

পরিবর্তনটা যূথিকার চালাক চোখে ধরা পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই এক ধরনের আমোদ-পাওয়া হাসি হাসত। মুখে কিছু বলত না, কিন্তু চোখের পাতা কখনও ঠোঁটের কাজ করে। সেই হাসির মানে আমি পড়তে পারতুম। যূথিকা যেন বলত, ব্যাপার কি? আগে ঠেলে-ঠুলে নড়ানো যেত না, এখন যে বড় চটপটে ভাব! সময়মত নাওয়া, খাওয়া! লেখার প্যাডে ধুলো জমছিল, হঠাৎ তিন-তিনটে স্ক্রিপ্টের খসড়া তৈরী হয়ে গেল!

চোখের পাতা দপদপ কাঁপত। যূথিকা যেন বলত, জানি, জানি। এত উৎসাহের ইড়া-পিঙ্গলায় কে বসে আছে, জানি।

প্রায় বছর ঘুরতে চলল কনক, এখনও তোমার খোঁজ পাইনি। তোমার বাড়ির লোকেরা সন্তাপে, লজ্জায় এ পাড়া ছেড়ে গেছেন। শুনেছি, তাঁরা তোমাকে হিসাব থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। পুলিস কেস করবার মত মূল্যও তাঁরা তোমাকে দিতে রাজী নন।

একটি পাথরের নুড়ি কয়েকটি জল-বলয় তুলে ডুবে গিয়েছে--পুকুর শান্ত, স্থির।

কিন্তু একটি হৃদয় এখনও শান্ত হয়নি।

উপসংহারে তার একটা অত্যন্ত ছেলেমানুষী সাধের কথা শোন। সব গিয়েছে, তবু এখনও মাঝে মাঝে এই সাধের সহকারে একটি প্রিয় কল্পনার লতাকে জড়িয়ে দিই। কি কল্পনা, জান?

একবার, জীবনে আর মাত্র একটিবারই, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তোমার বাসার দরজায় গিয়ে দাঁড়াব, টোকা দেব। না, দেখা হতে তোমার মুখ কঠিন হবে না। ম্লান হেসে বলবে, "ও, আপনি!"

ম্লান হাসি, কনক—কেননা, চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি যে, তুমিও সুখে নেই। অনেক উচ্চাশা ছিল যার মনে, অনেক প্রাণের ফেনা যার চোখের কোণ দিয়ে উছলে পড়ত, এই হতশ্রী পরিবেশের হট্টগোলে তাকে চেনা শক্ত হবে।

"খুব রোগা হয়ে-গিয়েছ!"

অপ্রতিভ হয়ে বলবে, "হ্যাঁ, বড় একটা অসুখ থেকে উঠলাম। টাইফয়েড হয়েছিল। দেখছেন না চুলের হাল! সব উঠে গেছে।"

জানি, অত্যন্ত অনুচিত কল্পনা—একান্তই হীন। তবু এই বিষাক্ত লালা দিয়ে মন-মাকড়সা তার জাল বুনে চলে; ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি, সে সাধ্য নেই।

একটি কর্কশ কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে লিকলিকে রোগা এক শিশুকে দেখতে পাব।

জিজ্ঞাসা করব, "এরও অসুখ?"

মাথা নীচু করে বলবে, "হ্যাঁ, জন্ম থেকেই রিকেট।"

"চিকিৎসা?"

এবার জবাব দেবে না বলেই অকস্মাৎ টের পাব, যার সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসেছিলে, সে সরে পড়েছে। তুমি একা।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাব, কিন্তু ফিরেও আসব খানিক পরে। ঘোরাঘুরি করে ফল আর টনিক ওষুধ কিনে এনেছি।

সেগুলো হাতে তুলে নিতে তোমার চোখ ছলছল হবে।

পরদিন আবার ফিরব। তারও পরদিন আবার।

বাস্তবে হয়তো সম্ভব হত না, কিন্তু সবটাই যখন কল্পনা, তখন একদিন তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কিছু টাকা দিতে বাধা নেই। তোমার কুণ্ঠা দেখে বলব, "না, না—দান নয়, ধার। একটা কাজ পেয়ে শোধ দিও।"

কাজ? বিষণ্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে বলবে, "কাজ কোথায় পাব?"

অভয় দিয়ে বলব, "নিশ্চয়ই পাবে। তোমাকে এতদিন বলিনি, একটা ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে ছোট একটা পার্ট তোমাকে দেবে বলে কথা প্রায় পাকা করে এনেছি।"

বিশ্বাস করতে সাহস পাবে না, অথচ চোখ দেখে বুঝতে পারছি তো, বিশ্বাস করতে পারলে তুমি বেঁচে যাও। হয়তো সেই টানাপোড়েনে তোমার চোখে জল এসে যাবে। হঠাৎ আমার হাত দুটি চেপে ধরার মত ছেলেমানুষি করে ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলবে, "আপনাকে আমি কিছুই দিইনি, তবু···"

কনক, তখন? যে কথাটি বলবার জন্যে কল্পনার এই আয়োজন, তার এক বর্ণও কি সেই গদগদ মুহূর্তে মুখে ফুটবে? হয়তো বলতেই পারব না, কি পেয়েছি, কতখানি। বেঁচে থাকার অভিরুচি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ। জেনেছি, এখনও তবে আমি ভালবাসতে পারি। আমার যৌবন যায়নি।

মুখ ফুটে বলতে যদি পারি, অবাক হয়ে তাকাবে। "যায়নি?"

"না।"

দেহগত তুচ্ছ একটা পটুতা নয়, ভালবাসা পাওয়াও না, শুধুমাত্র ভালবাসতে পারাই যে যৌবন, এ বয়সে এ কথা বোঝা তোমার পক্ষে শক্ত হবে। তবু লিখে রাখলুম: এই ভরসায় যে, কোনদিন হয়তো বুঝবে। কেননা, কনক, তোমারও তো এই বয়সের অবসান আছে!

বি জ য়ি নী

রঞ্জন

কলকাতায় কোন টুলুস লোত্রেক সম্ভবই নয়। তাই তাঁর জন্যে কোন মুল্যাঁ রুজের কথা ভাবিনে। কিন্তু এ শহরে একজন ডেমন রানিয়ন আবির্ভূত হলে তেমন অবাক হবার কিছু নেই এবং সত্যি কোন ডেমন রানিয়ন এখানে এলে তিনি ব্রডওয়েের বদলে কোন্ রাস্তায় বিচরণ করতেন তাঁর নানা বিচিত্র চরিত্রের সন্ধানে? কোন্ রেস্তরাঁয় তাঁর স্থায়ী আস্তানা হত?

এমন হাইপথেটিক্যাল প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর আমি জানিনে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ডেমন রানিয়নের বিচরণের রাস্তা হত পার্ক স্ট্রিট আর তাঁর বসবার জায়গা হত ওই রাস্তারই উপর এথিনিয়া কাফে। এ দোকানটা পুরোপুরি সম্ভ্রান্ত নয়, কেননা আমি ওখানে মাঝে মাঝে যাই। পুরোপুরি অভদ্রও নয়, কেননা আমি আবার অনেক দিন যাইনে। কিন্তু ডেমন রানিয়ন যে কারণে সে দোকানে নিশ্চয়ই যেতেন, তা হচ্ছে এই যে, সপ্তাহের কয়েকটা দিন সেখানে রেসের জকি ও ট্রেনারের ভিড় অনিবার্য।

এ দোকানের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় দশ বছরের। দেখেছি, শনিবার ঘোড়দৌড় থাকলে ওখানে বুধবার হ্যাণ্ডিক্যাপ বেরুবার পর থেকে ভিড় শুরু হয় এবং শনিবার রেস শেষ হওয়ার পর পর্যন্ত ভিড় বজায় থাকে। জকিরা আসে, ট্রেনাররা আসে, আর আসে ঘোড়দৌড়ের পাণ্টাররা। শনিবার বিকেল পর্যন্ত আলোচনা চলে এই নিয়ে যে, কোন্ কোন্ ঘোড়া জিতবে; সেদিন সন্ধ্যায় আলোচনা চলে এই নিয়ে যে, কি কি কারণে ওরা জিতল না। রেসে জিতলে এথিনিয়ায় আসতে হয় আনন্দ বর্ধন করতে, হারলে আসতে হয় হারার দুঃখ সুরায় ডুবিয়ে দিতে।

হাসি-কান্নার এই নাটকের আমি কৌতূহলী দর্শক—যদিও ঘোড়া সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনে এবং জানতেও চাইনে। যে দু-একবার কলকাতার বা দার্জিলিঙের ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছি, সে শুধু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মজা দেখতে; ছোট বোনের সঙ্গে যেমন দু-একবার সার্কাস গেছি।

অনর্জিত অর্থে আমার লোভ নেই এমন দাবি করব না, কিন্তু ভাগ্য যে নেই, তা নিশ্চিত জানি। অন্তত এই মরীচিকার পশ্চাতে তাই কখনও ধাবন করিনে। যাঁরা করেন তাঁদের নিন্দা করিনে, এমনকি শুধু এ কারণে তাঁদের

আমার নিজের চাইতে অধঃপতিতও মনে করিনে, বরং কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঙ্গে তাঁদের দুর্মর আশাবাদিতা লক্ষ করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের জন্য শিক্ষা আহরণ করতে চেষ্টা করি।

সে শিক্ষা পাইনে, কিন্তু তবু আমার কৌতূহলের সীমা নেই এর্থিনিয়ার এই জনতা সম্বন্ধে। ওদের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনিনে, ওরাও কেউ আমায় চেনে না, কিন্তু কান পেতে ওদের কথা শুনতে শুনতে আজ জানি, কে ডেভিস, কে অ্যার্ডলি, কে পিকক—এবং কে কবে সবচেয়ে বেশী জয়ী ঘোড়া চড়েছে। প্রত্যেক শনিবার সেখানে একজন করে 'হিরো' হয়, সেদিন সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবন্ধ। তিনি দুটো, কি তিনটে, কি চারটে 'উইনার রাইড' করেছেন। আমার মত অশ্বাজ্ঞের পক্ষেও এই বীরকে সনাক্ত করা আদৌ শক্ত ছিল না। পরে আরও সহজ হয়েছে।

কিন্তু আগের কথা আগে।

বছর দু-এক আগেকার কথা। নভেম্বর মাস। উইণ্টার মিটিং চলছে। তাই নিয়ে এর্থিনিয়া সরগরম। শনিবার। কোথাও আর টেবিল রাখবার জায়গা নেই, কোন টেবিলে জায়গা নেই আর একটা গেলাস রাখবার। ভয়ানক গোলমাল নেই, কিন্তু এতজনের মিলিত গুঞ্জনের যোগফল নিশ্চয়ই নৈঃশব্দ্য নয়। বেয়ারারা এদিক থেকে ওদিকে ও ওদিক থেকে এদিকে যাওয়া-আসা করতে করতে ঘেমে উঠেছে। পায়ীদের মধ্যে কেউ অধৈর্য হয়ে চিৎকার করছে—বেয়ারা! বাইরের একটা কাগজওয়ালা এসেছে ব্লিৎস, কারেণ্ট, সাণ্ডে স্ট্যাণ্ডার্ড, স্ক্রীন ইত্যাদি কাগজ বিক্রি করতে। এক কোণে কুঞ্চিতকেশ মালিক বসে আছেন তাঁর টেবিলে। তার একটু দূরে বসে আছে সেই বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ ইংরেজটি—সঙ্গে একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে, যাকে প্রেমের বশে (হায় রে, এখন মনে হয় মোহবশে!) বিয়ে করে সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছে। তার পাশের টেবিলে এক শিখ, একা একা মদ খায় আর আপন মনে হাসে। তারপর আছেন সেই বৃদ্ধ উকিল ভদ্রলোক, এমন সন্ন্যাসী-জনোচিত নির্লিপ্ত মদ্যপ আমি দেখিনি—চোখ খুলে একবার কোন দিকে তাকান না। তারপর ওই সিলভিয়াকে ঘিরে আছে কয়েকটি মধ্যবয়স্ক ভারতীয়, আর সিলভিয়া যথারীতি তারস্বরে বলছে, সে এমন উদারহৃদয়া যে, ভারতীয়দের সঙ্গে সৌহার্দ্যে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ওইদিকে রয়েছে একটি বাচাল পাঞ্জাবী—কোথায় বুঝি একটা হেয়ার-কাটিং স্যালুন আছে। একেবারে দেয়াল ঘেঁষে, ঘড়িটার তলায়, রয়েছে কলকাতার জকিকুল আর তাদের অনুরাগীরা।

দক্ষিণের দেয়ালের বিরাট আয়নার সামনে বসে আছে একটি নিরীহ ফিরিঙ্গী যুবতী। বেচারী দৃশ্যতই এমন পরিবেশে অনভ্যস্ত। সামনের

আয়নায় নিজেকে দেখবার লোভ আছে, কিন্তু দেখলে আরও বেশী আত্ম-সচেতন হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে তার চেয়েও অপ্রস্তুত একটি ফিরিঙ্গী যুবক—চকচকে চুল, মুখে নির্বোধ হাসি। দাঁতের মধ্যে একটা আবার সোনা দিয়ে বাঁধানো।

আমি বসে ছিলুম আমার অভ্যস্ত কোণে। অহম-এর অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে আমি তখন বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে সহনশীল ও কৌতূহলী।

ঈষৎ পানান্তে মেয়েটি তার সঙ্গীকে হেসে বলল, “দেখলে তো, রেসিং সম্বন্ধে আমি তোমার চেয়ে কত বেশী জানি? তোমার তিন দিনের ঘর্মাক্ত হিসাব-নিকাশের ফল কোথায় উড়ে গেল ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয়। অথচ ট্রেবলের তিনটে রেসে আমার তিনটে ঘোড়াই এল। তা নইলে তো বাড়ি ফিরতে হত পায়ে হেঁটে। এথিনিয়ায় বসে বিয়ার খেতে পেতে না, বাড়ি গিয়ে এক গেলাস জল খেতে হত!”

মেয়েটি সশব্দে খিলখিল করে হাসছিল, ছেলেমানুষী হাসি।

তার সঙ্গী বেচারী আপন পরাজয়ে এমনিতেই নিরতিশয় বিমর্ষ হয়েছিল, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে সে আরও আহত হল। বলল, “জিতেছ বটে, কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, রেসিং সম্বন্ধে তুমি কিছু জান। অমন ভাগ্য একবার হয়, দু'বার নয়। ঘোড়দৌড় অত সোজা নয়!”

“তাই নাকি? তবে কাজ নেই আমার শিখে অত দুরূহ তত্ত্ব! সব ঘোড়ার মা-বাবার চোদ্দ পুরুষের হিসাব করবার পরেও যদি তোমার মত প্রতি শনিবার হারতে হয়, তার চেয়ে আমার কিছু না জেনে জিতে আসা অনেক ভাল।”

মেয়েটির উদ্দেশ্য সত্যি বোধ হয় কথা শোনানো ছিল না। সে শুধু নিজের অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তিতে এত আনন্দিত হয়েছিল যে, কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বের করে সস্নেহে তার উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, “এস আর একটা বিয়ার খাও। বেয়ারা, ঔর এক বিয়ার!”

সঙ্গী অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে এই দান গ্রহণ করল, পান করল, কিন্তু সে বারবার বলছিল, “চল জুন, এবার বাড়ি যাই। তোমার নেশা হয়ে গেছে। চল উঠি, এর পর আর উঠতে পারবে না।”

জুন কিন্তু একটার পর একটা শেরি খেয়েই চলছিল। চোখ দুটো ততক্ষণে আরও বড় হয়েছে। সোনালী চুলের কিছুটা ডান চোখে এসে পড়েছে, তবু সরাবার উৎসাহ নেই। আয়নায় তাকাবার লজ্জাও ততক্ষণে বহুল পরিমাণে কেটে গেছে। হাতের সিগারেটের ধোঁয়া তার মুখের চারদিকে কুয়াশা বিস্তার করেছে। যেন সাদা মেঘের কোলে একটি সুন্দরীর

মুখ ভেসে আছে। আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছিল। বোধ হয় জুনেরও।

ওদিকের টেবিলের একজন জকিরও ওই রকম কিছু মনে হয়ে থাকবে। সে উঠে এসে জুনের সঙ্গে আলাপ করতে চাইল, "গুড ইভনিং, আজ রেসে গিয়েছিলেন বুঝি?"

জুন মহানন্দে ব্যাগটা দেখিয়ে বলল, "গিয়েছিলুম মানে? জিতে এসেছি। একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে ঘোড়া ধরেছি শুধু একটিমাত্র পাঁচ টাকার ট্রেবল টিকিটে—তার তিনটেই জিতেছে!"

জকি কিছুক্ষণ আগে থেকেই জুনকে লক্ষ করে থাকবে। তার কথাও হয়ত শুনে থাকবে। কেননা, সে যখন জুনের ঘোষণায় বিস্ময় প্রকাশ করল, তা আমার কাছে অন্তত অত্যন্ত কপট মনে হল। কিন্তু জুনের বোধ হয় তা বোঝার মত অবসর ছিল না। সে মহা উৎসাহে তার নতুন পরিচিতকে তার জয়ের কথা বলতে লাগল। জকি তখন যথোচিত সমারোহে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাদমোয়াজেল, আমার নাম জন। আজকের ট্রেবলের তিনটে জয়ী ঘোড়াই আমি চড়েছি।"

"সত্যি?"

জুন বিশ্বাস করতে পারছে না। এ আজ জুনের কি সৌভাগ্য যে, শুধু সে ট্রেবলই জেতেনি আজকের রেসের সবচেয়ে সফল জকির সঙ্গেও তার দেখা হয়ে গেল! জুন তার সঙ্গীর সঙ্গে জনের পরিচয় করিয়ে দিল। আবার বেয়ারাকে চেঁচিয়ে বলল, "ঔর এক বিয়ার!" জনকে জিজ্ঞাসা করল, "প্লিজ হোআট আর য়ু হ্যাভিং? য়ু মাস্ট হ্যাভ এ ড্রিংক উইথ মি, য়ু মাস্ট, য়ু—" দ্বিতীয় বার পরের কথাটা হয়ে গেল—"মাশ্‌ট্‌!"

জন ব্র্যান্ডি চাইল। সবাই 'চিয়ার্‌স' বলে শুরু করবার পরে গেলাস নামালে জন জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আগেও জিতেছি, কিন্তু এমন পুরস্কার আগে কোনদিন পাইনি।"

জুন জড়ানো কণ্ঠে বললে, "আপনি জানেন না, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কি খুশী হয়েছি! বলুন, আর আপনাকে কি পুরস্কার দিতে পারি!"

জুনের সঙ্গীর জনের মত জকির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে ধন্য হবার কথা। এমন সুযোগ সে ভিক্ষা করে নিত, যদি পরের শনিবারের কোন টিপ্‌স্‌ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় তার জুনের জন্যে বিষম ক্রোধ ছাড়া আর কোন অনুভূতি ছিল বলে মনে হল না। তারপর জুনের দ্ব্যর্থবোধক পুরস্কার-প্রতিশ্রুতিতে সে আরও অপ্রীত হয়েছে। জুনকে নিয়ে যাবার শেষ চেষ্টা করে বেচারী বলল, "আমি উঠছি। অনেক দেরি হয়ে গেল। ওঠ, চল।"

জুন চেঁচিয়ে উত্তর দিল, "ওঠ, চল, মাই ফুট! তোমার যেতে হয়, যাও।

আমি এখানে থাকছি। আই অ্যাম উইথ দি উইনার টু-নাইট, য়ু উইল টেইক মি হোম জন ডিয়ার, ওণ্ট য়ু?” জুন তার একটা হাত জনের সবল হাতের উপর রাখল। কোমল হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সবল হাত জানিয়ে দিল যে, অমন অনুরোধ সে রক্ষা না করে কিছুতেই পারবে না।

পরাস্ত সঙ্গী অযথা বাক্যব্যয় না করে বিদায় নিল। সে করুণ দৃশ্যে আমি অন্য যে কোন সময় অভিভূত হতুম। হয়ত জুনের সঙ্গীটি বাঙলা জানলে তাকে বলতুম, “বন্ধু, আমি র'ব নিষ্ফলের হতাশের দলে।”

কিন্তু সে সন্ধ্যায় জুনের কীর্তি প্রত্যক্ষ করবার লোভ জয় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি একটা কাগজ পড়বার ভান করছিলুম, কিন্তু কান ছিল জন আর জুনের দিকে। চোখও কখনও তম্মুখিন হয়নি, এমন কথা শপথ করে বলতে পারব না।

জন বলল, “এবার তুমি আমার সঙ্গে একটা শেরি খাবে।”

জুন বলল, “না, না, সে হতেই পারে না। আমি তোমারই জন্যে আজ এতগুলি টাকা পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে আর একটা ব্র্যাণ্ডি খাবে।”

কি মীমাংসা হয়েছিল, মনে নেই। মনে আছে, দশটার কিছু আগে জন জুনকে নিয়ে এথিনিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মনে আছে, জুনের সাধ্য ছিল না কারও উপর ভর না দিয়ে স্বাধীনভাবে হাঁটবার; মনে আছে, জন সানন্দে তাকে সাহায্য করেছিল—যথাসাধ্য, যথাযোগ্য, বোধ হয় তার চেয়েও একটু বেশী। মনে আছে, বেরুবার আগে জন তার সহ-জকিদের দিকে চোখের ইশারায় জানিয়ে গিয়েছিল তার পরবর্তী কার্যপরিকল্পনার অনুমেয় একটা আভাস। জকিরা সহযোগীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে সরবে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কেন নয়? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। নারীও কিছু বলহীনের লভ্য নয়।

তারপর পর পর তিন-চারটে শনিবার জনকে দেখেছি জুনের সঙ্গে। সঙ্গে দেখেছি জুনের পরিবর্তন।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করবার বিরুদ্ধে নৈতিক যুক্তির মূল্য যতই সামান্য হোক, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পরপ্রভাতে যখন পূর্বরাত্রির আনন্দের মূল্য দিতে হয় তখন একবারও মনে হয় না যে, ঠকিনি। প্রাপ্ত আনন্দের চেয়ে দেয় মূল্যকে তখন মনে হয় সহস্রগুণ বেশী। মনে হয়, পেয়েছি যত, দিয়েছি তার বেশী।

এই মূল্যদানের হিসাবনিকাশ কোন এক অদৃশ্য হাত সর্বক্ষণ লিখে চলেছে আনন্দসন্ধানীর সর্বাঙ্গে। গায়ে লেখা মানে উল্কি মুছে ফেলবার

উপায় নেই। জুনের গায়ের লেখা আর কেউ পড়তে পেরেছে কিনা জানিনে। আমার ধারণা, আমি পেরেছি।

জুনকে যখন প্রথম দেখেছিলুম তখন তার রূপের যে গুণটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল তা ওর শিশুচিত নির্দোষিতা, অপরিমেয় বিস্ময়বোধ, অপরিসীম উচ্ছ্বাস। রেসে গিয়ে ওর একবারও মনে হয়নি যে, কিছু অন্যায় করেছে, এথিনিয়ায় এসে যেমন ওর একবারও সন্দেহ হয়নি যে, প্রকাশ্যে অত্যধিক মদ্যপান ঠিক সদাচারসঙ্গত নয়। কোন ঘোড়া সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনে অতগুলি টাকা পেয়ে ও নিজেই এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, তার সবগুলি টাকা সে রাত্রেই শেষ না করা পর্যন্ত ওর যেন শান্তি ছিল না। এর সবগুলি কাজ জুন এমন ছেলেমানুষী উদ্দামতার সঙ্গে করছিল যে, তখন কোন নীতিবাগীশ আপত্তি তোলাই অবান্তর হত।

মাত্র তিন-চারটে সপ্তাহের ব্যবধানে সেই জুন কোথায় অন্তর্হিতা হয়ে গেছে!

আজ তার চোখের চারদিকে অনেকগুলি কালো চাকা। কালো চশমা পরে সেগুলি ঢাকতে তার চেষ্টার অন্ত নেই। তাই অনেক সময় জুনকে মনে হয় অন্য কোন মেয়ে।

কে বিশ্বাস করবে, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে একজন লোকের এত পরিবর্তন হতে পারে? আজ তার কালো ফ্রকের বাহারের অন্ত নেই, অনাবৃত স্কন্ধে স্বচ্ছ অর্গ্যান্ডির ওড়না। চিবুকের উদ্ধত ভঙ্গিটি, যা সেই প্রথম দিন আমায় এমন আকর্ষণ করেছিল, আজ তা অনেকটা নত হয়েছে। চোখের উপর পেন্সিল দিয়ে দীর্ঘ ভ্রূ আঁকা হয়েছে, তবু ক্লান্তি লুকানো রয়নি।

আজ জুন এ টেবিল থেকে ও টেবিল প্রজাপতির মত উড়ে চলে; এথিনিয়ার প্রায় প্রত্যেক নিয়মিত গ্রাহকের সঙ্গে আজ তার পরিচয়; হাত তুলে সব পরিচিতকে সে হেসে অভিবাদন জানায়, মিষ্টি সুরে বলে, "হ্যালো"; প্রায় যে কোন লোক তাকে হুইস্কি অফার করলে সে তা সানন্দে গ্রহণ করে, সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ আলাপ করে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে: দশটায় এথিনিয়া বন্ধ হয়ে গেলে এমন কি অর্ধপরিচিতও কেউ যদি তাকে বলে ফিরপোয় নিয়ে যাবে, জুন তৎক্ষণাৎ রাজী হয়, ট্যাক্সিতে খুব দূরে সরে বসে না।

আমি জুনের এই দ্রুত বিবর্তন দিনের পর দিন লক্ষ করেছি, কখনও কখনও ব্যথিত হয়েছি। দেখেছি, জুন জনকে ছেড়ে ফিলিপের কাছে গেছে। কয়েক হপ্তা পরে স্মিথের কাছে।

তারও কয়েক হপ্তা পরে ক্যামিল্লোর কাছে।

একদিন গোল বাধল পরবর্তী পদক্ষেপে। অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ডার, ব্রিটিশ, আইরিশ ইত্যাদি জকিরা জুনকে নিয়ে খেলেছে; খেলা ফুরোলে

বসে থাকতে চায়নি। কিন্তু ডন ক্যামিল্লোর সঙ্গে জনকে যেন অনেক বেশী দিন দেখা গেল। শুধু তাই নয়, ইদানীং প্রায়ই এরা দুজনে এসে আলাদা একটা টেবিলে বসত। অন্যান্য জকিদের দূর থেকে দু-একটা কথা বলত, কিন্তু তাদের সঙ্গে গিয়ে তাদের দলে ভিড়ত না। শুধু তাই নয়, জনের চাঞ্চল্যও যেন বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে। আজকাল সে ক্যামিল্লোর সঙ্গে আসে, দুজনে দুটো বিয়ার খেয়ে বেরিয়ে চলে যায়। পানীয়ের উত্তেজনায় যেন আর প্রয়োজন নেই, কোথায় যেন তার চেয়েও মূল্যবান কিছু মিলেছে ওদের দুজনের।

বলা বাহুল্য, ওদের এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবহার এথিনিয়ার পৃষ্ঠ-পোষকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মন্তব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। জনের শান্তশীতল অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য তো আছেই, তা ছাড়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে ক্যামিল্লোর সাম্প্রতিক ব্যর্থতাও উল্লিখিত হয়েছে। সত্যি, বেচারী গত চার-পাঁচটা মিটিঙে একটাও প্লেস পর্যন্ত পায়নি। অন্তত আমার টেবিলের রেস-বিশেষজ্ঞ অংশীদার তাই বলছিলেন আমাকে।

আমি পাশের টেবিলে উপবিষ্ট জন আর ক্যামিল্লোকে দেখছিলুম। আমার অপরিচিত পানসঙ্গীর দৃষ্টিও সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল। সঙ্গী বললেন, "জনকে দেখে আপনার কি মনে হয়? বিশেষ করে আজকাল?"

অন্য সময় হলে আমি উত্তর এড়াতুম, অপরিচিতের প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতুম না। কিন্তু মোরারজী দেশাই যাই বলুন না কেন, মদ্যপানে হৃদ্যতা বাড়ে, মানুষ আর মানুষের মধ্যে বেড়াগুলি অন্তত সাময়িকভাবে ভেঙে যায়। আমি তাই বললুম, "জন এখন শান্ত।"

সঙ্গী বললেন, "কিন্তু এ শান্তি শুধু ঝড়ের পূর্বাভাস।"

আমি সঙ্গীর হীন নৈরাশ্যে বিরক্ত হলুম। কাউকে শান্তিতে দেখলে যেন এদের শান্তি নেই। জন মাঝে কিছুদিন জানা অজানা নির্বিশেষে সবায়ের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হয়েছিল, আজ সে শুধু ক্যামিল্লোর সঙ্গে এসে বেশীক্ষণ না থেকে চলে যায়, তাই নিয়ে এথিনিয়ার আর সকলের যেন অন্তর্দাহের শেষ নেই! সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, আবার কবে জন ক্যামিল্লো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বজনীন হবে।

আমি নিজেও জনের পরম অনুরাগী ছিলুম, কিন্তু শুধু দূর থেকে। আর সবাইকে সে হেসে যখন "হ্যালো" বলেছে, আমি তখন ঈর্ষিত হয়েছি, প্রলুব্ধ হয়েছি তাকে একটা ড্রিংক অফার করে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যে কাছে পেতে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। সাহস পাইনি। শুধু দূর থেকে জনের নির্দোষ সৌন্দর্য .প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছি, পরে তার ক্ষীয়মাণ সৌন্দর্য লক্ষ করে ঈষৎ ব্যথিত হয়েছি। এই আপেক্ষিক অন্তরঙ্গতার জন্যেই

তাকে ক্যামিল্লোর সঙ্গে সুখী দেখেও তার অমঙ্গল কামনা করবার কথা মনে হয়নি।

সঙ্গীর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই আমি খুশী হইনি। কিন্তু প্রতিবাদও করিনি। আমি নিঃশব্দে ওদের দুজনকে দেখছিলুম।

সত্যি মনে হল, সঙ্গী একেবারে মিথ্যা বলেনি হয়ত। কিন্তু এথিনিয়ায় সে অবস্থায় আমি অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলে নিজেকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিই যে, হয়ত দ্রষ্টব্যের পরিবর্তন ঘটেনি, হয়ত শুধু দৃষ্টির বিভ্রম হয়েছে। তাই আমি জন আর ক্যামিল্লোকে আরও ভাল করে দেখলুম।

জন গম্ভীর, অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর। সামনের বিয়ারের গ্লাসে কখনও এক চুমুক দিচ্ছে কি দিচ্ছে না।

অপর পক্ষে ক্যামিল্লোর উত্তেজনার অন্ত নেই। সে তার হাত-পা নেড়ে যত কথা বলছিল তার সব আমি শুনতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু কিছু কিছু কানে আসছিল বইকি! জন কোন কথার উত্তর দিচ্ছিল না, কোনটা বা ভাল করে শুনছিলও না।

ক্যামিল্লো বলল, "চল, তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও। আমি বড় ক্লান্ত।"

জন বলল, "কোথায়?"

"হোটেলে।"

"হোটেলে ভাড়া দেওয়া হয়নি!"

"ও কিছু নয়। আমি আর দু-এক হপ্তার মধ্যেই দিয়ে দেব।"

"কোত্থেকে?"

"যেখান থেকে এতদিন দিয়েছি!"

"হুঁঃ! যাক গে।" জন এক চুমুকে প্রায় পুরো এক গ্লাস বিয়ার শেষ করে যোগ করল, "বেয়ারা! ঔর এক বিয়ার!"

ক্যামিল্লো সভয়ে পকেটে হাত দিয়ে আস্তে বলল, "এই, আর বিয়ারে কাজ নেই। আমি আর টাকা আনিনি।"

"আনিনি, কারণ আনবার মত কিছু ছিল না। বেয়াবা—"

"বেশ, তাই। কিন্তু তা হলে আরও বিয়ার চাইছ কেন?"

জন চেঁচিয়ে বলল, "চাইছি—কেননা আমার চাই। বেয়ারা—এবং তোমার গ্লাস থেকেও খাব না।" জন তৎক্ষণাৎ সশব্দে তার সামনের শূন্য গ্লাসটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল।

সবাই আবার জনের দিকে তাকাল। আমিও। সঙ্গী ঠিকই বলেছে। শান্তি স্থান ছেড়ে দিয়েছে ঝড়ের জন্যে। আমার মনে পড়ে গেল এথিনিয়ায় প্রথম যেদিন জনকে দেখেছিলুম সেদিনের কথা। কি করে সে তার বন্ধুকে

বিদায় দিয়ে জনকে গ্রহণ করেছিল, সেই কথা। সত্যকার কোমলতা সত্ত্বেও জন যে উত্তেজিত হলে কিরকম নিষ্ঠুর ও কঠোর হতে পারে, সেদিন তা দেখেছিলুম। ফিরিঙ্গী বন্ধু নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছিল।

কিন্তু ক্যামিল্লো অত সহজে আসন ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে খুব মোলায়েম সুরে—যেন কোন অবুঝ শিশুকে ভোলাতে হচ্ছে, তেমনি সুরে—বলল, "জন ডিয়ার, তোমার নেশা হয়েছে। চল এবার।"

জনের উত্তেজনা তখন চরমে। স্বরও। সে বলল, "নেশা হয়েছে? হা—হা। আধ বোতল বিয়ার খেয়ে নেশা? এই দোকানের যে কোন লোককে জিজ্ঞেস কর না! এর বেশী খাওয়ার পয়সা নেই, সে কথা বলতে দ্বিধা কেন? গত পাঁচটা রেসে কিছু করতে পারনি, তাই তোমার কাছে কেউ আর টিপ্‌স্‌' নিতেও আসে না, তাই কেউ মদও খাওয়ায় না। লজ্জা করে না তার উপর আবার আমায় কথা শোনাতে যে, আমার নেশা হয়েছে? নেশা যেন এতই সস্তা, বিনি পয়সায় হয়, দোকানে এসে বসলেই নেশা হয়—না?"

জন এমনি তারস্বরে চিৎকার করে চলল। পুরোনো জন! কিন্তু প্রভেদ আছে। অমিতাচার তার পদচিহ্ন রেখে গেছে জনের সর্বাঙ্গে। তার যৌবনের সেই আগেকার আকর্ষণ আর নেই। তাই তার চিৎকারে কোন কোন লোক কৌতুক বোধ করল, কেউ কেউ বা একটু বিরক্তও হল।

ক্যামিল্লো অপমানিত হয়ে অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু জনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার সহ-জকিরা অন্য একটা টেবিলে বসে ছিল—জন, স্মিথ, ফিলিপ, সবাই। তাদের মধ্যে কে একজন ক্যামিল্লোর কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু তার সাহায্য গ্রহণ করলে ক্যামিল্লো আরও অপমানিত হত। তাই সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে ক্যামিল্লো জনের ঘাড়ে আস্তে একটা হাত রেখে বলল, "প্লি—জ, ডোণ্ট মেক এ সিন ডিয়ার, লেট্'স্ গো।"

"খবরদার, তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না!" জন চেঁচিয়ে উঠল। ক্যামিল্লোর হাত সরিয়ে দিয়ে সে তার সামনের বিয়ারের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিল। পঞ্চম গ্লাস।

ক্যামিল্লো বেচারী কি করবে ভেবে পেল না। অনুনয় পরিহার করে আদেশ দিয়ে জনকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। বলল, "জন, ওঠ, এক্ষনি চল আমার সঙ্গে। তা নইলে—"

"তা নইলে?"

জন প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্রূপের সঙ্গে ক্যামিল্লোর কথার পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্নাকারে।

ক্যামিল্লো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জনই তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, "তা নইলে আমায় ফেলে চলে যাবে, তাই নয়? সেভ য়োর ব্রেথ, মাই

ডিয়ার ডন। তুমি পায়ে ধরে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেও আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছিনে। আই হ্যাভ হ্যাড ইনাফ অব য়ু।”

“বেশ। আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি কখন, কার সঙ্গে ফিরছ?”

জন বলল, “আমি? আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে ভাব। নট এ উইনার ইন সিক্স উইক্‌স্‌, অ্যান্ড য়ু কল য়োরসেল্‌ফ্‌ এ জকি! হা—হা—। আই'ল টেল য়ু হোআট। বাই য়োরসেল্‌ফ্‌ এ পেয়ার অব বুল্‌স্‌। জোড়া বলদের গাড়ি চালিয়ে যদি দু পয়সা রোজগার করতে পার। হা—হা—”

জন তার নিজের রসিকতায় যে পরম প্রীত হয়েছিল তাতে সন্দেহ রইল না। কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা তখনও শেষ হয়নি। তাই আবার তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলল, “কার সঙ্গে যাব? ভেরি ওয়েল দেন, ইফ য়ু মাস্ট নো, আমি ব্র্যাডলির সঙ্গে যাব। ডোণ্ট য়ু নো, আই গো উইথ দি উইনার, অল্‌-ওয়েজ উইথ দি উইনার!”

ক্যামিল্লো আমি যে টেবিলে বসে ছিলুম তারই পাশ দিয়ে চলে গেল। যেমন জনের প্রথম ছেলেবন্ধু গিয়েছিল।

গত কয়েক সপ্তাহে ব্র্যাডলির চেয়ে বেশী উইনার কেউ চড়েনি। এখন সে তাই এথিনিয়ার ‘হিরো’। সে বসে ছিল অন্যান্য জকিদের সঙ্গে।

একটু পরে জন আস্তে আস্তে ওই জকিদের টেবিলের দিকে এগুতে থাকল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সবাই বেশ বিব্রত হচ্ছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যারা জনকে কাছে পেলে আর কিছু চাইত না, সানন্দে তাকে যত খুশি মদ খাওয়াত, আজ তারা সবাই কেমন যেন সন্ত্রস্ত হল জনের আসন্ন উপস্থিতির আশঙ্কায়। জন এত সব লক্ষ করেনি, সাদর অভ্যর্থনায় সে অভ্যস্ত।

জন বলল, “ব্র্যাডলি ডিয়ার, য়ু উইল টেক মি হোম, ওণ্ট য়ু?”

ব্র্যাডলি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, “সরি জন, আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে। শী উইল বি ম্যাড ইফ আই ডোণ্ট গো নাউ। গুড নাইট জন, গুড নাইট ফোক্‌স্‌।” ব্র্যাডলি বেরিয়ে গেল।

জন আবার চেষ্টা করল, “ফিলিপ ডিয়ার, য়ু উইল গিভ মি এ ড্রিংক, ওণ্ট য়ু?”

ফিলিপও ততক্ষণে ওঠবার আয়োজন করছিল। যাবার আগে শুধু বলল, “গুড নাইট জন, আই রিয়্যালি মাস্ট গো নাউ।”

“জন, য়ু?”

“সরি জন। গুড নাইট।”

“অ্যান্ড স্মিথ?”

"গ্ড নাইট জন্, আই শুড হ্যাভ বিন হোম অ্যান আওয়ার এগো।"

একে একে সবাই ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেল—এত জোরে ওরা ঘোড়ায় চড়েও কখনও চলেনি বোধ হয়।

প্রায় দশটা বাজছিল। প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল। জন্ ছিল জকিদের সেই শূন্য টেবিলে, সামনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে বিল নিয়ে।

আর আমি ছিলুম আমার টেবিলে। আমি অন্য একটা বেয়ারাকে ডেকে জেনে নিলুম জনের বিলের দাম। টাকাটা দিয়ে আরও চার টাকা যোগ করলুম, জনের জন্যে আরও একটা বিয়ারের জন্যে। বেরিয়ে আসবার আগে দেখলুম, জন্ টেবিলের উপর মাথা রেখে কাঁদছে। ওই অতিরিক্ত বিয়ারটায় প্রত্যাখ্যাত জনের প্রয়োজন ছিল সেই রাত্রে।

প্রে ম

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে যেন ছোট্ট একটি শ্যামল দ্বীপের উপর চুপচাপ একা বসে ছিল লোকটি। চার বছর হল কলকাতায় এসেছি, সুদূর বিদেশ থেকে এসেছি দেশে, দেখে দেখে চোখ এখনও ক্লান্ত হয়নি—পথে যেতে-আসতে কত লোকই ত চোখে পড়ে—কত বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন চেহারা—বিভিন্ন পোশাকের লোক! এক-একসময় মনে হয়, নানান দেশের নানান ধরনের লোককে একটা গন্ডীর মধ্যে রেখে আমরা "বাঙালী" নাম দিয়েছি বটে, কিন্তু কে যে কোন্ বিচিত্র পথে কোন্ বিচিত্র রক্তধারার মধ্য দিয়ে এসে এ-দেশের ভাষায় আজ কথা বলছে, এ-দেশের বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে, তা কে জানে! এর সংগে ওর মিল নেই। এর মুখ লম্বা, ওর মুখ গোল; এ ফর্সা, ও কালো; এর মাথার চুল বড় বড়, ওর কর্কশ—কোঁকড়ানো। এর চোখ টানা-টানা, ওর চোখ গোলাকার—ছোট্ট।

তিন দিক দিয়ে গর্জন তুলে ঘুরে ঘুরে আসছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাস বৈকালের অফিস-ফেরা ক্লান্তমুখ যাত্রিদল বোঝাই করে—মাঝখানে ত্রিকোণাকার ছোট্ট এক টুকরো শ্যামল মসৃণ ভূমিখণ্ড, তার ওপর বসে ছিল সে, একটা ছেঁড়া খাকির হাফপ্যাণ্ট পরা মাত্র, গায়ে কোনও জামা নেই। গায়ের রঙ হয়ত একদা ফর্সা ছিল—রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথার বড় বড় অবিন্যস্ত চুল অযত্নে আর ধুলোয় লালচে দেখাচ্ছে। মুখ-ভর্তি দাড়ি—তা-ও লালচে। ঘন কালো দুটি ভ্রূর নীচে দুটি অদ্ভুত চোখ—সামনে নিবিষ্ট দৃষ্টি। কত লোক, কত যান, কত কোলাহল—সব ছাড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি যেন কোনও এক উধাও অসীম স্মৃতিসমুদ্রের তরংগে তরংগে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পথ হাঁটতে হাঁটতে কেন যে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল লোকটির ওপরে, কেন যে অদূরে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখতে শুরু করেছিলাম লোকটাকে—কে জানে। ওকে দেখতে দেখতে আমার হঠাৎই মনে পড়ে গেল তাকে। এমনই দীঘল চেহারা—এমনই আজানুলম্বিত দুটি বাহু—এমনই তামাটে দেহের বর্ণ—এমনই অবিন্যস্ত লালচে মাথার চুল আর দাড়ি—এমনই জ্বলজ্বল-করা স্বপ্নিল নক্ষত্রের মত দুটি চোখ। এখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে—সেই সেখানে—বিষুবরেখার দক্ষিণে—৪°৩৫′ দক্ষিণ দ্রাঘিমারেখা এবং

৫৫°৪৬′ পূর্ব অক্ষরেখার সুনীল সমুদ্র-মেখলাবেষ্টিত সুনির্জন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে—যা এক শ' ছাপ্পান্ন ফিট উঁচু একটা টিলার মতন—মাত্র আধ মাইল যার বিস্তার—অসংখ্য নারিকেলকুঞ্জে যেখানে চারিদিক থেকে এসে লাগে অবাধ অগাধ হু-হু হাওয়া।

এখানে একা—একেবারেই একা থাকে সে। চারখানা ছোট্ট ঘর-ওয়ালা একটা টালি-ছাওয়া পুরনো বাড়ি। বাড়ির বাইরে সব দেয়ালগুলিই লতাপাতায় ঢেকে আছে—লাল টালির উপরে অসংখ্য সাপের মত নানান লতাপাতার কচি কচি ডগাগুলি এসে মাথা নুইয়ে পড়েছে।

ঘরের সামনে খুব বড় একটা উঠোনের মত—ঝকঝকে-পরিষ্কার, একটা ঝরা পাতাও পড়ে থাকতে দেয় না সে। এই উঠোনটাই একটু এগিয়ে নেমে এসেছে ধাপে ধাপে একেবারে নিস্তরঙ্গ একটা জলাশয়ের ধারে—অনেকটা জায়গা জুড়ে এখানে বালির রাশি—মাঝে মাঝে প্রহরীর মত প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু নারিকেল গাছ।

মরা নারিকেল গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে এখানেই চৌকোমতন একটা বালুকাময় জায়গাকে দেয়ালের মত কঠিন করে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারিকেলের গুঁড়ি চিরে চিরে পাতলা কাঠের মত করে ঘর তৈরী হয়েছে ছোট ছোট—আমাদের গাঁ অঞ্চলে হাঁসমুরগি যেমন ঘরে রাখে, তেমনি ঘর।

এই ঘর আর ঘরের জীবগুলিকে নিয়েই ওর সংসার। ছোট থেকে বড় নানান আকারের চকচকে ধারালো দায়ের মত সব অস্ত্র একটা প্রকাণ্ড ক্ষয়ে-আসা পাথরের গায়ে শান দিতে দিতে বীভৎস হাসিতে এক-একসময় ফেটে পড়ে লোকটা। বেড়ার ধারের কাকে যেন লক্ষ্য করে বলতে থাকে—চোখ মিটিমিটি করে চেয়ে আছিস কি! এবার তোর পালা। নির্ঘাত তোকে এবার কাটব।

যাকে বলা হল, দীর্ঘদিন এই মানুষটার সাহচর্যে থেকে সে বোধ হয় এর ধরন-ধারন একটু একটু বুঝতে আরম্ভ করেছে। বালিতে শুয়ে-বসে থাকার ফলে সর্বাঙ্গে বালি লেগে ধূলি-ধূসরিত। অতিকায় শক্ত খোলের মধ্য থেকে চারটি পা বার করে পোষা কুকুর বা বিড়ালের মত বসে ছিল খানিকটা বালি খুঁড়ে, বালির মধ্যে। ওর কথায় সরু মুখটা একটু একটু করে বাইরে এনে, হলদে-আভা-যুক্ত দুই বিন্দু পোখরাজ মণির মত দুই চক্ষু একবার ওর দিকে ফিরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বালির ওপর সরু মাথাটা রাখল নামিয়ে।

ঐভাবে বালি খুঁড়ে বালির মধ্যেই পড়ে থাকে; ওর ঘর নেই। এই মানুষটিও যেমন লাল টালির ঘর থাকতেও তার ঘরে না থেকে ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া টেনে তার ওপরে পড়ে থাকে সারা দিনরাত ঐ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ার নীচে, তেমনি এর নারিকেল-তক্তার ঘর থাকা সত্ত্বেও সারা দিনরাত পড়ে থাকে বাইরে। মানুষটির সঙ্গে তফাত এই—ঝড়বৃষ্টিতে তাকে আশ্রয় নিতে

হয় লাল টালির ঘরে, একে নিতে হয় না—ঝড়-বৃষ্টি-রোদ-ঠান্ডা সব চলে যায় ওর দেহের ঐ শক্ত খোলটার ওপর দিয়ে।

একটি-আধটি দিন নয়, এক এক করে দশ-দশটি বৎসর তাদের দুজনের এমনি করে কেটে গেছে।

হাতের চকচকে ধারালো দা-টা ফেলে দিয়ে হঠাৎই একসময় উঠে দাঁড়াল লোকটি, বললে, থাক তুই একা। আমি একটু ঘুরে আসি। সারা সকালটা তোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে আমার চলবে নাকি?

বলতে-না-বলতেই উঠে দাঁড়াল সে। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ চেহারা—পরনে খাকি রঙের একটা হাফপ্যান্ট শুধু—আপন মনে শিস দিতে দিতে তরতর করে উঠে গেল ওপরে—নিজের বাড়ির ঝকঝকে উঠোনে। কোথা থেকে উড়ে দুটো পাতা আর পাখির বাসার খড়কুটো পড়েছিল—সেগুলি তুলে ফেলতে ফেলতে অদূরের ঝাঁকড়া-মাথা নিষ্ফলা জামগাছটাতে আশ্রয় নেওয়া 'চিক্‌চিক্' করা চড়ুইয়ের মত পাখিগুলির উদ্দেশে অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল সে। তারপর একটা বাঁকা নারকেল গাছের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথটি ধরে আরও ওপরে উঠে গেল।

ওপরে—একেবারে কূর্মপৃষ্ঠের মত জলের উপর মাথা তুলে ওঠা পাহাড়টার মাথায়। অতিকায় কূর্মপৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের মত এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে আধ মাইল জুড়ে। যেদিকে দু চোখ যায়—জন নেই, যান নেই—শুধু নারিকেল গাছের মেলা, কিছু কিছু ঝাঁকড়া-মাথা জাম বা ঐ জাতীয় গাছ।

পর্বত-চূড়ার এক জায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে অদ্ভুত একটা পাথর দাঁড়িয়ে আছে—মিশকালো নয়, গাঢ় খয়েরী রঙের; অন্ধকারে তাকালে মনে হয়—ঠিক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—সরু, লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের একটা পাথর। তারই ঠিক পাশে চৌকোনা একটা পাথর—তিন কি সাড়ে তিন ফিট হবে দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে। আর আশ্চর্য, পাথরটা এমনভাবে রয়েছে যে, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মুহূর্তে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে ঐ কালো মসৃণ পাথরটার ওপরে; সেই আলো ঠিকরে পড়ে নীচে—তার উঠোনটির এক পাশে—তার লাল টালির ঘর-গুলির দাওয়ার ঠিক সামনে।

দাওয়ার সামনেকার সেই অদ্ভুত হলদে হলদে আলোর রেখা দেখে তার ঘুম ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় ওপরে, পাথরটার কাছে। আয়নার মত ঝিলমিল করতে থাকে পাথরটা, তখন ওকে জীবন্ত মনে হয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে প্রখর হতে থাকে সূর্যের আলো, পাথরের ঝিলমিল ভাবটা কমতে কমতে একসময়ে একেবারে মিলিয়ে যায়। তখন সেই লম্বা খাড়া পাথর আর এই চৌকো পাথরটা—দুটি মিলিয়ে মনে হয়, একটি মানুষ আয়না নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কার অভিশাপে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড়ের এই চূড়ায় বসে পশ্চিম দিগন্তে স্পষ্ট চোখে পড়ে 'তমালতালীবনরাজিনীলা'—একটি রেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে যেন। ভিক্টোরিয়া শহর এখান থেকে পনরো মাইল দূরে। আর পূর্ব দিগন্তে চোখে পড়ে শ্যামলী মেয়ের কপালে কালো একটা টিপের মত 'ফ্রিজেট দ্বীপ'—দূ দিকেই লোকালয়। আরও চোখে পড়ে শান্ত, প্রসন্ন দিনে অসংখ্য সাদা বিন্দুর মত পাল-তোলা মাছ-ধরা নৌকো। মানুষ। ওরা কি একবারও এসে ভিড়বে না এই ভূমিখণ্ডে?

ভিড়বে। প্রতিবারই ভেড়ে। মাসখানেক ধরে এই নিস্তব্ধ ভূমি হয়ে ওঠে কোলাহলমুখরিত। সেই একটি মাস লোকটি ভীরুর মত বাস করে ঘরের মধ্যে, ওর নিজের কাজও থাকে বন্ধ। লোকগুলি আসে নারকেল পাড়ার মরসুমে। এই ভূমিখণ্ড ইজারা নিয়েছেন যে বড়মানুষ, তাঁরই ভাড়া-করা শ্রমিক হিসাবে মানুষগুলি আসে। কেউ কেউ ওকে টেনে বার করতে চায় ঘর থেকে সন্ধ্যার উৎসবমুহূর্তে।

—এই, কি নাম তোমার?

—কোন্ দেশের লোক?

ও কোনও উত্তর দেয় না। প্রাণপণে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে—ঐ কূর্মকুলের মত। ওরা হাসে, ছেড়ে দিয়ে অবশেষে চলে যায়। ফিবে গিয়ে রঙ ফলিয়ে নানান গালগল্প রচনা করে লোকটিকে নিয়ে। এমনি করে কবে দশ-দশটি বছর।

কিন্তু বছরের আর বাকি এগারো মাস? আসে বইকি লোক! জোহার, জোনাথান আর বিশ্ব! আর ছোট্ট স্টীমলঞ্চটার জনকয়েক মাঝিমাল্লা। প্রকাণ্ড 'বার্জ'-টাকে লঞ্চের পাশে বেঁধে নিয়ে আসে ওরা। সমুদ্রের যে খাড়িটি সরো-বরের মত ভিতরে ঢুকে এসেছে, মুখের কাছে প্রকাণ্ড একটা পাথর থাকায় অশান্ত ঢেউগুলো তারই ওপরে গর্জে মরে, ভিতবে আসতে পারে না—সেই খাড়ি দিয়ে পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসে ওরা। শুরু হয় হাঁক-ডাক। 'বার্জ' থেকে দড়ি বেঁধে ওপরে তার সেই নারিকেল-কাঠের দেয়াল-ঘেরা প্রাঙ্গণে তোলা হয় চতুষ্পদ জলজ প্রাণীগুলিকে। আকারে খুব বড় নয়। বড় বড় ঢিপির মত জড়ো করা হয় ওদের। দু-তিন দিনের মধ্যে একটি ধারালো খাঁড়া দিয়ে সব সে শেষ করে দেয়। মাংসগুলি আলাদা আর খোলগুলি আলাদা করে নিয়ে আবার ওরা ফিরে যায়। বিরাট ব্যবসা। এও ইজারাদারকে একটা লভ্যাংশ দান করে। কিন্তু আর একটা যে ওদের গোপন ব্যবসা আছে, সেটা? অবশ্য খুব কমই দেখা দেয় সেই ঘটনা। বছর দশেকের মধ্যে গোটা দশেকের বেশী নয়। সবাইকে লুকিয়ে মোটা টাকার ব্যবসা নাকি। তখন ঐ লাল টালির সর্ব-দক্ষিণের তালা-দেওয়া ঘরখানা কাজে লাগে। বাকি ঘরগুলিতে ত আসর

জমায় জোনাথান-জোহাররা। সবাই শিসেলাস্ দ্বীপপুঞ্জের লোক, সবাই থাকে শহর ভিক্টোরিয়ায়, কিন্তু পরিচয় দেবার বেলায় বলে—'আমি ইহুদী,' 'আমি মিশরী', 'আমি ভারতীয়'। কিন্তু সে নিজে কি? ওরা ডাকে জো বলে—কি তার সত্যিকারের নাম? কোথা থেকে এসেছিল তার পূর্বপুরুষ—ইস্রায়েল, মিশর, না ভারত?

উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে দেখতে পেয়েই তরতর করে নেমে এল সে। এসে গেছে 'লঞ্চ'—অর্থাৎ জোনাথান-জোহার আর বিশ্ব, আর মাঝিমাল্লা। আর সেই 'বার্জ'। 'বার্জ' হচ্ছে মাল-বওয়া নৌকোর খোলের মত—লঞ্চ টেনে নিয়ে আসে। শুরু হয় দাঁড় দিয়ে বেঁধে তোলা সেই প্রাণীগুলিকে।

কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ওর। লঞ্চের ভিতর থেকে প্রথমে এল বাক্স-বিছানা, যেমন আসে। তারপরেই আশ্চর্য, জোনাথান আর বিশ্বের পাহারায় একটি মেয়ে।

প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল জোহার—এই জো, হচ্ছে কি? কাজ কর নিজের।

কাজ চলতে থাকে। দাঁড়ির ফাঁস বেঁধে ওদের শুধু ওঠানোই নয়, চকচকে ধারালো দা দিয়ে রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ডগুলি বার করে আনতে হয়।

দু দিন পরেই 'বার্জ'-বোঝাই 'মাংস আর 'খোল' নিয়ে চলে গেল ওরা। জোনাথান বললে—মেয়েটাকে রেখে গেলাম। তিন দিন পরে ফিরব। সাবধান।

এতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। বলে—ঠিক আছে।

এই ছোট্ট ভূমিখণ্ডে একা একা কোথায় ঘুরবে মেয়ে? কোথায় পালাবে? একটি মেয়ে সেই বহু বছর আগে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। অতি কষ্টে যখন তাকে তোলা হয়, ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে তখন বিপর্যস্ত, জ্ঞানহারা।

জোনাথানের 'সাবধানতা' এইখানে। নইলে সবাই জানে, গুমরে গুমরে শুধু কাঁদবে মেয়েগুলো, খেতেও চাইবে না, আর নয়ত উন্মত্তের মত এক-এক-সময় জো-কে বলবে—আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

মনে মনে হাসে জো। কে কাকে ছাড়বে? বেঁধেই বা রেখেছে কে কাকে? এই ত আধ মাইল পরিধির ছোট্ট জগৎ, এর মধ্যে সে নিজে আছে দশ বছর—একটি দিন, একটি মুহূর্তের জন্যও বাইরে যায়নি, যেতে পারেনি।

এক-একদিন রুদ্ধ এক দুর্বার আক্রোশ জমে উঠত মনে। সেই যে প্রথম মেয়েটিকে এনেছিল ওরা, তার দিকে কেন যেন অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি সে। অবশ্য সেবারে জোনাথান ছিল এখানে, তীক্ষ্ম চোখে পর্যবেক্ষণ করে গেছে তাদের এই জো-কে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মেয়েগুলির বেলায় জোনাথান আর থাকেনি, তারই

উপর দিয়ে গিয়েছিল সব ভার। ওকে তারা সর্বরকমে বিশ্বাসও করেছিল বোধ হয়। বিশ্বাসভঙ্গ সে করেনি, অর্থাৎ সাহায্য সে করেনি মেয়েগুলিকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু বিশ্বাসের অর্থ যদি অন্য কিছু হয়, ত সেখানে সে চরম আঘাত হেনেছিল ঐ মেয়েগুলির বেলায়।

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল মেয়েগুলি। এই ভূমিখণ্ডে পা দিয়েই ওরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, কি হবে ওদের অবস্থা। কেমন করে জোহার-জোনাথানদের খপ্পরে পড়ে মেয়েগুলি, কে জানে। লঞ্চে আসবার সময় কোনও চাঞ্চল্য নেই, এখানকার মাটিতে পা দিয়েই শুরু হয় কান্না আর কান্না!

ওরা তার পায়ে পড়ে যত কাঁদত অসহায়ের মত, তত পৈশাচিক দানবতায় উল্লসিত হয়ে উঠত ওর মন। শিসেলাস্-এরই মেয়ে ওরা, কিন্তু জোনাথানদের হাতে পড়েছে; এর পর কোন্ দূর দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ওদের স্থিতি হবে, কে জানে। এই দু-দিনের জন্য ওর আতিথ্যে আছে যখন, তখন সেই বা ছেড়ে দেবে কেন? নিরুদ্ধ, বঞ্চিত যৌবন যেন ক্ষুধিত বিষাক্ত কোনও সাপের মত ক্রূর হয়ে উঠত।

কিন্তু তারপর? পঞ্চম বৎসর থেকে শুরু হয়েছিল ওর ভাবান্তর। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম আর নবম মেয়েটির বেলায় তার কোনও কৌতূহলই জাগেনি। টালি-ছাওয়া বাড়িটার দক্ষিণের ঘরটা খুলে দিয়েছে, ভাঁড়ার দেখিয়ে দিয়েছে—ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত। চতুষ্পদ ও জলজ প্রাণীগুলিব মতই কোনও ভীরু প্রাণী যেন ওরা; কান্নাকাটি করেছে—চকচকে ধারালো ছুরি দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড বার করে আনার মুহূর্তে লম্বা মুখখানা যন্ত্রণায় বার করে নিষ্প্রাণ পাথরের চোখের মত ওরা যেমন তাকায়, কেঁদে-কেঁদে শেষ পর্যন্ত লঞ্চে ওঠবার মুহূর্তে ঠিক তেমনি চোখেই শেষবারের মত মেয়েগুলি তাকিয়ে গেছে তার দিকে।

সেই নারিকেল-তক্তা দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। তেমনি বালি খুঁড়ে সর্বাঙ্গে বালি মেখে শুয়ে আছে অতিকায় প্রাণীটা। জো ধীরে ধীরে এসে বসে পড়ল তার অনতিদূরে, বললে—জানিস, ওরা চলে গেল। দশ বছর ধরে এতগুলিকে কাটলাম, তোকে আর কাটা হল না।

ময়াল সাপের মাথার মত মাথাটা নুইয়ে রেখেছিল বালির ওপরে, ওর কথার উত্তরে মাথাটা একটু হেলাল, পোখরাজ মণির মত দুটি চোখ যেন নীরব হাসির আভায় মুহূর্তের জন্য উঠল ঝিলমিল করে।

—আচ্ছা, প্রাণীটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল জো—সবারই জুড়ি থাকে, তোর কোনও জুড়িও নেই রে?

মাথাটা সোজা করে চুপচাপ নিস্পৃহের মত পড়ে থাকে প্রাণীটা।

জো বলে—দশ বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন থেকেই তোকে

দেখছি। জবুথবু বুড়ো। তাড়া করলাম, তুই পালাতে পারলি না। হতভাগা! তোকে সেইদিনই কাটতাম, ঐ বিশ্ব এসে বাধা দিয়েছিল বলে তুই বেঁচে গেলি। বললে, এটা বুড়ো, একে মারিস না। ও আবার এসব জানে-টানে কিনা, তোকে ভাল করে উলটে-পালটে দেখে নিয়ে সেবারই বলেছিল, এটা থুত্থুরে বুড়ো—এক শ'রও বেশী বয়েস। তা হ্যাঁ রে, তোরা নাকি দেড় শ' বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকিস!

যাকে প্রশ্ন করা হল, সে নির্বিকার। একটা নারিকেল-খোলে কিছু জল নিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে ওর গা পরিষ্কার করতে বসল জো। ও একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে মুখটা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, শুধু পোখরাজ মণির মত দুটি চোখ আর মাথার অগ্রভাগটা রইল সামান্য একটু বেরিয়ে।

জো ওর গায়ের বালি পরিষ্কার করতে করতে বললে—ইস্! অমনি লজ্জায় মুখ লুকনো হল! গা ধুইয়ে দিচ্ছি কিনা! দেখ, আমাকে ওরা জো বলে ডাকে, আমার নামধাম সব ওরা ভুলিয়ে দিয়েছে; আমি তোরও নাম ভোলাব, তোকেও ডাকব 'জো' বলে, বুঝেছিস?

—এই, শোন! জো 'জো'কে ফিসফিস করে বলতে লাগল—এ মেয়েটা কাঁদে না রে! আমাকে বললে, বেশ স্বাস্থ্য ত তোমার! কত বয়স হল? আমি ত মনে মনে হেসে বাঁচি না' বয়স? বয়স আবার কি? তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ—যা কিছু একটা ধরে নাও না! অবশ্য মুখে কিছুই বলতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম তোর কাছে। ইস্! কি বালি মেখেছিস!

বলে জোরে জোরে ওর গা-টা ঘষতে থাকে ন্যাকড়া দিয়ে, বলে—তোকে রোজ কাটব বলি, তুই ত পালিয়েও যেতে পারিস চুপিচুপি সমুদ্রে! তোকে ত আর আমার মত এখানে কেউ লুকিয়ে রাখেনি! তোর মত অবস্থা হলে আমি ঠিক শহরে চলে যেতাম, নৌকো বানিয়ে নিতাম। কিন্তু যাব কোথায়? জোনাথান বলেছে, দেখতে পেলেই আমাকে ধরবে। তাই আছি পড়ে, খাই-দাই আর মজা করে ঘুরে বেড়াই।

আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিল জো, হঠাৎ একটা মেয়েলী চীৎকারে রীতিমত চমকে উঠল সে।

দেখে, সেই মেয়েটি। কাল-পরশুর মত গাউন পরা নয়—ভিক্টোরিয়ায় যে কয়েক ঘর ভারতবাসী আছে, তাদের মেয়েদের মত শাড়ি পরেছে আজ, পাতলা হলদে হলদে রঙের একটা শাড়ি। 'প্রাণী-জো'র দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে 'মানুষ-জো'কে বলছে—ওটা কি?

জো তাকিয়ে ছিল ওর দিকে অবাক হয়ে, কোনও কথা বলতে পারেনি।

মেয়েটি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ততক্ষণে, বললে—বাব্বাঃ! কি প্রকাণ্ড কচ্ছপ! ওটা তোমাকে কামড়ে দেয় না?

এবারেও উত্তর দেয় না জো—অচেনা মানুষের সামনে সত্যিই তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে, সহজে কথা ফোটে না। জোরে জোরে সে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষতে থাকে 'জো'র শক্ত পিঠ। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ছোট্ট ঘরগুলির দিকে। তক্তার ফাঁক দিয়ে বন্দী কূর্মকুলকে যত দূর লক্ষ করা যায়, দেখে এসে বলতে থাকে—ওটার মত বড় ত একটাও নেই, ওগুলো সব ছোট ছোট! জুড়ি নেই ওর?

জলদগম্ভীর স্বরে এবার বলে ওঠে জো—না।

তারপরেই উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে চলে আসে সীমানার বাইরে। তারপরে তরতর করে উঠে আসে ওপরে, নিজের ঘরের উঠোনে। ভাঁড়ার খোলা রয়েছে, জোনাথানদের দেওয়া খাদ্য-ভাণ্ডার। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার।

মেয়েটি তার পিছনে পিছনে এসে বসে পড়েছিল উঠোনেই—তার খাটিয়াটার উপরে।

—এই, শোন!

মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহারে ক্রমশই অবাক হচ্ছিল জো, উনোনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এল সে। তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বললে—কি?

সোজা ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটি, বললে—কতদিন আছ এখানে?

গর্জন করে উঠল জো, বললে—তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না বয়স, গায়ের রঙ ঠিক কালোও নয়, ফরসাও নয়, মুখখানা সুন্দর, টিকোলো নাক, টানা-টানা চোখে কালো দুটি চোখের তারা, মাথায় চুল বব্-করা নয়, লম্বা আর ঘন—পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। বেশ সপ্রতিভ, ঝকঝকে মুখের ভাব।

ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল নীরবে, তারপরে আপন মনেই বলে উঠল, কি লোক রে বাবা! কথা কইতে জানে না! খেঁকিয়েই আছে!

উনোনে হাঁড়ি বসিয়ে তার মুখে ঢাকা দিতে দিতে বোধ হয় কথাগুলি কানে গিয়েছিল জো-র—একটা অদ্ভুত অসহিষ্ণুতা আর অব্যক্ত জ্বালায় মনটা ভরে থাকলেও এগিয়ে এসে কথা বলতে পারল না সে, তাড়াতাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে গেল নীচে।

ওর 'জো' ততক্ষণে আবার কি করে যেন বালি মেখেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর কাছেই নারকেল-তক্তায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল জো বালির

ওপরে, বললে—কে রে মেয়েটা! কাঁদেও না! বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বলব নাকি?

ওর 'জো' ততক্ষণে চারটি আঁশওয়ালা পা ছড়িয়ে মুখটা নামিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে—নিঃসাড়।

—কি রে, ঘুমুলি নাকি? ওর দিকে তাকিয়ে জো বলে—ঘুমো ব্যাটা! যতদিন মাংস জুটছে, কিছু বলছি না; মাংস ফুরোলেই তোকে কাটব। তখন বুড়ো বলে মানব না।

—ও বুড়ো নাকি?

চমকে মুখ তুলল জো। মেয়েটা আবার কখন চুপচাপ নেমে এসেছে।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল জো, তেমনি তীব্র কণ্ঠেই বললে—তাতে তোমার কি?

—আমার আবার কি! মেয়েটি বললে—কিন্তু চলে এলে যে! আমি একা থাকব নাকি! কথা কইব কার সঙ্গে? আচ্ছা লোক রেখে গেছে খবরদারি করতে!

—করব না খবরদারি! বলে দুম্‌দুম্‌ করে পা ফেলে উপরে উঠে এল জো। বলা বাহুল্য, পিছনে পিছনে মেয়েটাও।

অব্যক্ত নিদারুণ একটা ক্রোধের জ্বালায় যেন দাউদাউ করে জ্বলছে জো—একটা অদ্ভুত অস্বস্তি' এ কি ধরনের মেয়ে এল এখানে! এ ত ঘরে বসে কাঁদেও না, ভয়ে আড়ষ্ট হয়েও যায় না!

আকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল জো, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুতীব্র কণ্ঠে বলে উঠল—জান না?

—কি!

জো উত্তেজিত. চাপা কণ্ঠে বললে—কেন তোমাকে আনা হয়েছে!

—কেন?

জো রুদ্ধনিশ্বাসে বললে—তিন দিন পরে ওরা ফিরে আসবে।

—জানি।

—জান? জো বললে—কোথায় তোমায় নিয়ে যাবে, সেটা জান?

—জানি। বিশ্ব আমাকে বলেছে। ইণ্ডিয়ায়।

চীৎকার করে উঠল জো—চুলোয়! তোমাকে ওরা দূরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে।

তবুও যেন ভয় পেল না মেয়েটি, ঠোঁট উলটে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—কে কাকে বেচে, দেখা যাবে!

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জো।

—কি! দেখছ কি! লীলায়িত ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে—তা দেখ যত খুশি, কারণে-অকারণে অমন খেঁকিয়ে উঠো না বাপু!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড ক্রোধের বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল দেহে; মুখ বিকৃত করে উন্মত্ত পশুর মত হঠাৎই একটা বিকট চীৎকার করে উঠল জো, তারপর লাফ দিয়ে একটা জন্তুর মতই ছুটতে ছুটতে সে উঠে গেল আরও ওপরে; মানুষের পাথর হয়ে যাবার মত সেই যে লম্বা পাথরটি দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশীর্ষে, একেবারে দু হাতে তাকে বেষ্টন করে বসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

কিছুক্ষণ ধরে দম নেবার পর তার মনে হল, তার পিছনে পিছনে এখানেও উঠে আসেনি ত মেয়েটা? না, তা আসেনি—যে খাড়া উৎরাই, সহজে উঠে আসা সম্ভবও নয়! কথাটা মনে হতেই কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে জো, তারপরে সেই আয়নার মত চৌকো পাথরটার মাথায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, তবুও মিষ্টি মিষ্টি লাগে। রোদ্দুর আর হু-হু হাওয়ার মধ্যেও যেন ঘুম-জড়ানো আদরের ছোঁয়া। নীল আকাশেব ওপর দিয়ে সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়ে যাচ্ছে—দেখতে দেখতে একসময় পাশ ফিরে দিগন্তের দিকে তাকাতে গিয়েই অতর্কিত বিস্ময়ে মুখ তোলে জো। কালো একটা রেখার মত ক্রমশ ঘন হল সেই রেখা। বাড়তে লাগল সেই কালিমা। সাদা পাল-তোলা নৌকোরা সব ফিরে গেছে। আসছে ঝড়—বুক দুরুদুরু করা ঝঞ্ঝার স্বেচ্ছাচার।

নীচে নামতে গিয়েও চট করে নামতে পারল না জো। কাকে গিয়ে আগে সামলাবে? মেয়েটাকে? না, সেই বালির ওপর হুমড়ি-খাওয়া বৃদ্ধ জীবনটাকে? বলবে—ভয় নেই, আমি আছি। বহু ঝড় কেটে গেছে এই দশ বছরে—কোনও ঝড়ই আমাকে টলাতে পারেনি, আজও পারবে না।

কিন্তু মেয়েটার ওপর সে অমন করে ক্ষেপে উঠল কেন হঠাৎ? কেন হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে উঠল সে অমন করে? মেয়েটা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে। মনে মনে হাসল জো—ভয় পাইয়ে দেওয়াই ভাল। ভয় একটু পাক। এই নির্জন ভূমিখণ্ড—এরও একটা ভয়ংকরী রূপ আছে। আজ দশ বছর প্রতিটি রাত্রি সে তা অনুভব করেছে মর্মে মর্মে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত একা থাকা যে কি কঠিন এমনি করে, তা যে না থেকেছে, সে বুঝতেই পারবে না!

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে নেমে এল জো। তার খাটিয়ার ওপরে তেমনি করেই বসে আছে মেয়েটি। পায়ের শব্দে মুখ তুলল। তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে জো বললে—ঝড় আসছে, ঘরে যাও।

মেয়েটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। পাহাড়ের চূড়াটার আড়ালে দিগন্ত ঢাকা পড়ছে; যেটুকু আকাশ তার চোখে পড়ল তা নীল—ঘন নীল; কালো মেঘের কোনও ছোঁয়াও নেই। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তেমনি চোখেই তার দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

জো-র মনে হল—এমনও হতে পারে, প্রচণ্ড ভয়ে ভিতরে ভিতরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটি এবং সে বিহ্বলতা এত বেশী যে, কথাই ফুটছে না তার মুখে।

মুহূর্তের জন্য মমতায় স্নিগ্ধ হল মন, মেয়েটির কাছে এসে সে বললে—ভয় পেয়েছ, না? আমি অমন চীৎকার করে উঠেছিলাম বলে ক্ষমা কর। দশ বছর আছি, কেমন যেন হয়ে গেছি! পাগলের মত!

মেয়েটি মুখ তুলে তেমনিই তাকিয়ে ছিল, বললে—একা একা এত বছর আছ—সঙ্গী নেই, সাথী নেই—মাথার গোলমাল ত একটু হতেই পারে!

—কি! মুহূর্তে রুখে দাঁড়াল জো—সত্যি সত্যিই আমি পাগল!

মেয়েটি একটু হাসল, বলল—তোমার খুব কষ্ট, না?

মনে হল, তার বুকে চকচকে ধারালো দা দিয়েই আঘাত করল কে যেন। ক্ষিপ্তের মত হাত-পা শক্ত করে আবার ইচ্ছা হল তেমনি চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু না, অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে, তারপরে ছুটে চলে এল নীচে।

সেই বালি-মাখা বৃদ্ধ 'জো'। বললে—মেয়েটা আমাকে পাগল করবে রে! এর চেয়ে ফাঁসির কাঠে লটকে মরাও ছিল ভাল।

বিড়বিড় করে আরও কি যেন সে বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল সে। কালো হয়ে গেছে আকাশটা, কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। আর হাওয়া? মনে হল, এখুনি উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে।

ছুটতে ছুটতে এল ওপরে। মেয়েটি উঠোন ছেড়ে নিজেই গেছে দক্ষিণের ঘরে। কবাটটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

শুধু ঝড় নয়, জলও। ঝরঝর ঝমঝম—অশ্রান্ত বৃষ্টি। নীচে বুড়ো জো-র ঘরটা খোলাই দেখে এসেছে, 'জো' আস্তে আস্তে নিজেই চলে যাবে, ওকে নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা এই মেয়েটিকে নিয়ে। জল নামবার আগেই মাংসের হাঁড়িটা ভিতরে নিয়ে এসেছিল জো, হয়েও গিয়েছিল রান্না। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। স্নান বোধ হয় ভোরেই সেরে নিয়েছে মেয়েটা। উঠোনের নীচে—বিপরীত দিকে—প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের

বুকেই পুকুরের মত হয়ে আছে, বৃষ্টির জলধারা থাকে তাতে। সেই জল বালতিতে উঠিয়ে স্নান, সেই জল ফুটিয়েই খাওয়া।

কোনক্রমে নিজের ঘরের কবাট খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ঘা দিল জো। বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। মেয়েটি দরজা খুলতেই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লে সে। কয়েকটা বাসন, বড় একটা বাটিতে মাংস—এইসব সে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে। বললে—খাবার।

মেয়েটা একটা লাল লাল ফুল ছাপানো ড্রেসিং গাউন পরেছে, বললে—তোমার ভাঁড়ার থেকে খাবার ত নিয়েই এসেছিলাম। এই দেখ, কত পাউরুটি, জ্যাম, জেলির শিশি। কুঁজো-ভর্তি জল ত রাখাই ছিল। আর, তোমার রান্না ঐ মাংস নিয়ে যাও। খাব না।

—কেন?

—কচ্ছপের মাংস আমি খাই না।

—কেন?

—বাবা রে বাবা, অত 'কেন'র উত্তর দিতে পারব না!

জো বললে—ভাল মাংস। 'হক্স্‌বিল্' কচ্ছপের মাংস বিষ—সে মাংস আমি ফেলে দেই। এ হচ্ছে ভাল জাতের কাছিমের মাংস। খাবে না?

একটু হেসে মেয়েটি বললে—না। আমি হিন্দু, তা জান? ভারতবর্ষে গুজরাট বলে একটা দেশ আছে, আমি সেই দেশের মেয়ে। বৈষ্ণব। আমাদের ওসব খেতে নেই।

হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জো। ওব সব কথা সে বুঝতেই পারল না।

মেয়েটি বললে—ব'সো না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি?

বলতে-না-বলতে, কি আশ্চর্য, মেয়েটি একেবারে ধরে ফেললে ওর হাত, একেবারে ডান হাতটা, যেটা দিয়ে ও কচ্ছপদের রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ডগুলি বার করে আনে। তারপরে বসিয়ে দিলে চেয়ারের ওপরে। নিজে বসল তার খাটে—বিছানার ওপরে। বুদ্ধিমতী মেয়ে জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিয়েছে নিজেই। কুলুঙ্গিতে জড়ো-করা অজস্র মোমবাতি, তার একটা জ্বালিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপরে।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসল, বললে—ভাবছ, শিসেলার্স্‌-এর মেয়ে হয়ে আমি জানলাম কি করে? জেনেছি। আমারই এক পূর্বপুরুষকে জলদস্যুরা ধরে এনেছিল ঐ দ্বীপে। তিনি বিয়ে করেছিলেন দ্বীপেরই এক মেয়েকে। সেই বংশেরই আমি মেয়ে, বংশ-পরম্পরায় আমরা শুনে আসছি আমরা কোথাকার। গুজরাট। বৈষ্ণব। হিংসে আমাদের করতে নেই।

—হিংসে?

—হ্যাঁ। মেয়েটি বলল—জীবজন্তু মারাটা আমাদের কাছে পাপ।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল জো—কিন্তু আমি ত গুজরাটের নই, আমার কাছে পাপ হবে কেন?

অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে মেয়েটি, বললে—কে বলেছে তোমার পাপ! আমি আমার কথা বলছি।

মোমবাতির স্বল্পালোকেই মনে হল, মেয়েটির দুটি চোখ যেন স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে; নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে যেন বলতে শুরু করল—ছোট থেকেই বাপ-মাকে হারিয়েছি। বাবার লেখা এক ডায়েরিখানা ছাড়া পিতৃ-সম্পত্তি কিছুই নেই। মানুষ হয়েছি এক কন্‌ভেণ্টের অনাথ আশ্রমে। তাও বড় হয়ে একবার দুষ্টুমি করেছিলাম বলে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কি আর করি? লেখাপড়া ত হল না—হোটেলে নাচবার কাজ নিলাম।

—নাচ?

—হ্যাঁ। অদ্ভুতভাবে ঠোঁট টিপে হাসল মেয়েটি—খাটো পোশাক পরে নানা রকমের নাচ। তখন মাংস-টাংস সবই খেতাম। অমন চমকে উঠো না, চৈতন্য মানুষের এক দিনেই আসে না। দিন যায়। একদিন বাক্স থেকে হঠাৎই বার করলাম বাবার লেখা ডায়েরিটা। পড়ে মনে হল—করেছি কি আমি? ঠিক ঐ সময়েই বিশ্বের সঙ্গে আলাপ।

—আমাদের বিশ্ব?

—হ্যাঁ, তোমাদেরই বিশ্ব। মেয়েটি বললে—ও বললে, ও ভারতীয়। আমাকে ভারতে নিয়ে যাবে। আমি ত লাফিয়ে উঠলুম। ও বললে, চল। আমিও বললাম, চল। এলাম। ওদের দলটাকে জানতুম। মেয়ে-চুরি ওদের যে ব্যবসা, এটা হোটেলের নাচিয়ে মেয়ে হয়ে আমি আর জানব না? অনেকের অনেক গোপন খবরই ত জানতাম!

দু হাতে মাথা চেপে বসে ছিল জো, হঠাৎই বলে উঠল—বড্ড ভুল করেছ!

—ভুল! খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি—না। করুক না আমাকে চুরি, নিয়ে যাক না যেখানে হোক—আমি ত দেখতে চাই, কি আছে আমার জীবনের শেষ!

বলেই ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ মেয়েটি; তারপর বললে—তোমার কথাও শুনেছি বিশ্বের কাছে। আমারই মত এক হোটেলের মেয়ের দিকে তুমি ঝুঁকেছিলে।

সোজা হয়ে বসে দুটি হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকাল জো—আবেগে আর উত্তেজনায় কণ্ঠ ওর রুদ্ধ। কিন্তু সেদিকে ভাল করে লক্ষ না করেই

বলে উঠল মেয়েটি—ঐ ব্যাপার নিয়ে হিংসেয় জ্বলে উঠে একটা মানুষকে তুমি মেরে ফেলেছিলে।

ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জো মেয়েটির ওপরে। ওর নরম পাখির মত গলাটা দুই হাতে টিপে ধরে বলতে লাগল—আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না।

কয়েক মুহূর্ত ঐভাবে কাটিয়ে দিয়ে শান্তভাবে ওর হাত দুটি গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললে—খুব বীরত্ব! একটা মেয়ের গলা টিপে····আচ্ছা পুরুষ যা হোক!

—তুমি চুপ করবে কি না!

মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ফিক করে হেসে ফেললে। বললে—অমন করে আচমকা ধরে! আমি ত শেষই হয়ে যেতাম! সেটা কি ভাল হত!

—বেশ হত! কে আমার কি করত!

মেয়েটি বললে—কিছুই না। যেমন তোমার বন্ধুরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছে এখানে, তুমি আর যেমন ভয়ে ফিরতে পারছ না ভিক্টোরিয়ায়, তেমনি লুকিয়ে থাকতে হত না কোথাও। তবে, তোমার মনে মনে খুব দুঃখ হত। হত না?

অসহ্য! মেয়েটা ওর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার খিল খুলে ও বাইরে বেরিয়ে গেল। অশান্ত ঝড়ের দাপাদাপি বাইরে। একটা বুড়ো জামগাছ বুঝি উপড়েই পড়ে গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে টুকরো পাথরও ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক।..

সারাটা দিন এমনি ভয়ংকর ঝড়ের তাণ্ডব। ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল জো। মেয়েটি বাইরে এসেছিল কিনা কে জানে। আর, সেই 'জো'? বৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল ত? না গেছে ত বয়ে গেছে! অত অভিমানের ধার ধারে না সে। এবারে কারও কথা সে শুনবে না, বুড়োটাকে সে কাটবেই কাটবে।

এল রাত। মেয়েটা ভয়-ডর পাবে না ত? পাক না, ভয়-ডর পেয়ে কেঁদে ওঠাই ত উচিত! ও কাঁদবে, আর বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে কিছুই শুনতে পাবে না জো, বেশ হবে!

রাতটাও কাটল। সকালে সামান্য একটু ধরেছিল বৃষ্টিটা। বাইরে এল জো। মেয়েটার ঘরের দরজা খোলা। স্নান করতে গেল নাকি? পাহাড়ী পুকুর জল পেয়ে এখন কানায় কানায় ভর্তি। পা পিছলে মেয়েটা যদি গিয়ে তাতে পড়ে? সাঁতার জানে ত? না জানুক, বয়েই গেল! ওরা

আসবে—মেয়েটা কই? জো বলবে—শেষ। তোমাদের হাত ফস্কে পাখি পালিয়েছে। ওরা রেগে বলবে—চল্ তোকে ভিক্টোরিয়া নিয়ে যাই। ও যাবে না। এখানকার সব-কিছুর সঙ্গে তার মন মিশে গেছে, আর যাওয়া চলে না এ জায়গা ছেড়ে।

বৃষ্টিতে বহু ঝর্নার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। ঝোপে-ঝাপে এধারে-ওধারে খুশী-হওয়া ঝর্নাদের ঝর্‌ঝর্। যেন একটি নয়, বহু মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে সারা পাহাড়টা জুড়ে। তরতর করে নেমে এল নীচে। বুড়ো 'জো' ঘরে যায়নি, শক্ত খোলের নীচে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পার করে দিয়েছে সব ঝড়, বৃষ্টি, বিপর্যয়।

—শুনছিস?

অনড়, অটল একটা প্রস্তরখণ্ড। সাড়ার লক্ষণও নেই।

—মেয়েটা আমার এই ডান হাতটা ধরেছিল, জানিস? কি রে? ও, ঘুমোচ্ছিস বুঝি? আচ্ছা, ঘুমো।

একটা ঝর্নার জলে নিজেও স্নান সেরে নিল জো, তারপরে লম্বা প্যাণ্টটা আবার পরে নিয়ে কম্বল জড়িয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি কম্বল জড়িয়েই ওপরে উঠে এল সে নিজের ঘরে। আশ্চর্য ঘটনা, তার নিজের খাটে—বিছানার ওপরে লাল একটা শাড়ি পরে বসে আছে মেয়েটি।

বললে—কথা কইব বলে বসে আছি।

জো বললে—পরশুই ত বিশ্ব আসছে!

—আসুক।

—চলেই ত যেতে হবে তোমাকে!

—যাব। বলেই মেয়েটি আবার হাসে, বলে—না-ও ত যেতে পারি!

—সে উপায় নেই। ওদের চেন না।

মেয়েটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বললে—দেখ, সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কোথাও যাব না। এখানেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবন। এটাকেই বানিয়ে নেব আমার স্বপ্নের গুজরাট।

—কেন?

মেয়েটি বললে—মানুষ ত অনেক দেখলাম। এবার নির্জনতাটাই ভাল করে অনুভব করে দেখি। থাকতে দেবে না আমাকে তুমি এখানে?

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে জো, বললে—কিন্তু ওরা দেবে কেন?

—ওদের সামলানোর ভার আমার ওপর। ভেবো না, ওদের পোষ মানাতে হয় কি করে, তা আমি জানি। জানি না তোমাকে। তুমি খাঁটি পুরুষ—মনের দিক থেকেও।

ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জো। কনভেণ্টে পড়া মেয়ে, কত কথা জানে, যার মানেও বোঝা যায় না সব সময়।

মেয়েটি বললে—মানুষ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। থেকে যাই এখানে। তুমি যা বলবে করব। তবে, তোমার ঐ কাছিম মারা আর চলবে না। কাজ যখন করতেই হবে, নারকেল পাড়ার কাজ ধর। সারা বছরের রুটির পয়সা ওতেই চলে আসবে। তারপরে দুটি-একটি খোকা-খুকু যদি আসে—

দুটি হাতে দুটি কান চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে আসে জো সেই ঝরঝর-ঝমঝম বৃষ্টিধারার মধ্যে।

—এই 'জো', শুনছিস?

সে কিন্তু তেমনি অনড়, অবিচল। বায়ু টেনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুম্ভক করে ওভাবে ওরা থাকতে পারে।

—এখনও ঘুমোচ্ছিস! সর্বনাশ হল যে এদিকে! মেয়েটি কি বলে জানিস?

বৃদ্ধ প্রাণীটি নির্বিকার। তার পাশে কম্বলে মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভিজতেই থাকে জো, বিড়বিড় করে বলতে থাকে—তোকে আর কাটা হবে না। কাউকেই আর কাটতে পারব না। নারকেল পাড়ার কাজ করতে হবে। তা আমি খুব পারি! কিন্তু জোনাথানরা যদি রাজী না হয়? রাজী না হয় ত খুন করব ওদের!····কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল জো। না, না—হিংসে করতে নেই। ঐ যে কাদের কথা বলল মেয়েটা—মাছমাংস খায় না, কাউকে হিংসেও করে না—সেই জাতের মত হবে সে।

পরদিনও অমনি ঝড়। বুড়ো 'জো'কে কোনক্রমে হটিয়ে হটিয়ে তার ঘরে উঠিয়ে রেখে এল জো। বললে—ঘরে থাক। আমিও ঘরে থাকব। মেয়েটা কি বলে, জানিস? বলে, লোক তুমি ভাল। সঙ্গী নেই, সাথী নেই—একা একা থাকতে থাকতে তোমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ রে, তোরও ত জুড়ি নেই, তোর মাথাটা আবার খারাপ হয়নি ত?

বলতে বলতে নিজেই হেসে উঠল জো, বললে—মাথা নেই, তার মাথাব্যথা! মাথা কই তোর? আছে ত দুটো জ্বলজ্বলে চোখ! আমারও আছে। মেয়েটি বলেছে, আমার চোখ দুটো নাকি সুন্দর!

পরদিন বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে থেমে গেল ঝড়। কিন্তু কোথায় জোনাথান, জোহার আর বিশ্ব? জো আবার নীচে এল, বুড়োর ঘরটা খুলে ওকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে—থেমেছে বৃষ্টি। আর কেন? এবার একটু ঘুরে বেড়া!

বৃদ্ধ 'জো' কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জায়গাটিতে এসে বসল মুখ বার করে বালি সরিয়ে।

—মেয়েটা মরেছে, জানিস! আমাকে ছাড়া থাকতে চাইছে না। বলছে, কোথাও আমি যাব না। মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। তা বিয়ে করে ফেলি, কি বলিস? ঐ যে পাহাড়ের ওপরের লম্বা পাথরটা, ওর উপরে একটা পাথর চাপিয়ে 'ক্রুশ' তৈরি করেছি। মেয়েটিকে বলেছি, ঐ আমাদের গির্জে। ওখানেই বিয়েটা হবে। ঐ জায়গাটার নাম কি দেব, জানিস? গুজরাট। কি, অমন করে চাইছিস কেন? কথাটা মনে ধরছে না? না, না—তোকেও দেখব রে, সমান যত্ন করব। মেয়েটাকেও পাঠাব তোর কাছে। দুজনে মিলে যত্ন করব।

ঠিক এর পরদিনই এল ওরা। সেই লঞ্চ, সেই 'বাজ''।

জো বললে—আমি আর কাছিম কাটব না।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা।

বিশ্ব গিয়েছিল ওপরে, মেয়েটির কাছে। সে হাসতে হাসতে নেমে এল ওদের কাছে, বললে—ওহে, পাহাড়ের মাথায় চার্চ হয়েছে। মেয়েটা বিয়ে করছে জো-কে।

জোনাথান আর জোহার হাসবে কি কাঁদবে, বুঝে পেল না। জোনাথানের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিশ্ব বললে—মেয়েটি আজীবন থাকবে এখানে জো-র কাছে।

এতক্ষণে কলরব করে উঠল ওরা—তা কি করে হবে?

—হোক! বিশ্ব বললে—জো আমাদের অনেক করেছে। ওর জন্য এটুকু স্বার্থত্যাগ আমাদের করতেই হবে! জয় হোক জো-র!

অতি সহজেই মিটে গেল ব্যাপারটা। জো-কে বাদ দিয়ে ওরা নিজেরাই কাটতে লাগল কাছিম। ওরা বললে—ওর বিয়ে দিয়ে তারপরে আমরা ফিরব।

জোনাথান বললে—বুড়ো কাছিমটাকে কাটতে হবে যে! ওর খোল না হলে ত বিয়ে হবে না! জান না বুঝি? আমাদের শিসেলিয়ানদের এই নিয়ম। ঐ খোলে কিছু মসলা আর শাকপাতা জল দিয়ে ঢেলে সিদ্ধ করতে হয় উনোনে। সেই জল না মুখে দিলে বিয়ে সিদ্ধ নয়। ছোট কাছিমের খোলে চলবে না, চাই একেবারে ঐ বুড়োটার মত "টেসটিডো এলিফেনটিয়া"র খোল।

পাঁচ-ছটা দিন কেটে গেল নিষ্ক্রিয়ভাবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে আপন মনে কি যেন ক্রমাগত ভাবছে সে।

জোনাথান ঠাট্টা করে বলে—হবু বর পালায় কোথায়?

যে মাংস কাটতে জো-র লাগত এক দিন, কি দু দিন, সে কাজে ওদের পাঁচ-

ছ দিনের বেশী লাগছে। হাত নিসপিস করে জো-র। অথচ, ওতে হাত দিলে ক্ষেপে যাবে গুজরাটের মেয়ে।

সারা রাত বিনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরবেলায় উঠে বসল জো। ওরা সবাই উঠোনে ঘুমে আচ্ছন্ন, মেয়েটির ঘরের দরজাও বন্ধ। তাড়াতাড়ি ও নেমে এল নীচে, বললে—শুনছিস? মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। নইলে আমাকে বিয়ে করতে চায়? না, না—আমি তা হতে দিতে পারি না! এখানে দিনের পর দিন একা থাকতে থাকতে ও মরেই যাবে। আমি থাকি, আমার আর কোথাও স্থান নেই, তাই। কোথা থেকে এসেছিল আমার পূর্বপুরুষ, আরব কি মিশর, তাও জানি না। ওর বাবার ডায়েরি থেকে ও ত জেনেছে, ও কোথাকার মেয়ে! ও চলেই যাক সেখানে!

কথাটা ভাবতে ভাবতে যেন মনে একটা মুক্তির হাওয়া এসে লাগে। সে আগের মত চকচকে 'দা' দিয়ে আবার কাটতে আরম্ভ করে কাছিমগুলো, রক্তাক্ত হৃদ্‌পিন্ডগুলি বার করে আনতে থাকে দু হাতে করে।

—এ কি করছ!

হলদে শাড়ি পরে তার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, বেদনার্ত দুটি চোখের দৃষ্টি, বললে—বারণ করেছিলাম না!

হেসে উঠল জো—শুনব কেন তোমার বারণ! তোমাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু এ আমি ছাড়তে পারব না!

ক্ষোভে-দুঃখে আরক্ত দেখায় মেয়েটির মুখ, দুটি চোখ যেন জ্বলতে থাকে। বলে—এই তোমার মনের কথা! উঠে এসো বলছি!

—না। তুমি যাও।

—না! যেন অসহ্য রাগে কাঁপতে থাকে মেয়েটি, তারপর বলে—আচ্ছা বেশ, তাই হবে।

চলে যায় মেয়েটি ওর কাছ থেকে। চকচকে ধারালো 'দা'টা ওর হাত থেকে কিন্তু পড়ে যায়। আর সে উঠিয়ে নেয় না সেই 'দা'টা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, নীচে নামে, এধারে-ওধারে উদাসীব মত ঘুরে ঘুরে কি যেন ভাবে সে। একসময় অন্য ঘুরপথে উঠে আসে সে পাহাড়ের মাথায়—তার 'গির্জে'র কাছে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুটি চোখ আপনিই বুঝি ভরে আসে জলে।

কেটে যায় দুটি দিন এমনি করে। বিশ্বের সঙ্গে মেয়েটি একান্তে কি আলাপ করে, কে জানে। জো থাকে ওদের থেকে পালিয়ে পালিয়ে।

দু দিন পরে জোনাথানরা শুনতে পায় কথাটা। জো নয়, বিশ্ব মেয়েটিকে

বিয়ে করছে। এখানেই, এই ভূমিখণ্ডেই। জো-র গির্জেতেই হবে বিয়ে। শুনে ওরা ঠাট্টা করে জো-কে—কি রে, ফস্কে গেল!

জো পশুর মত আবার দা-টা হাতে তুলে নিয়ে বাকি কাছিমগুলিকে কাটতে শুরু করে। চীৎকার করে ওঠে থেকে থেকে। সেই আগেকার মতই বৃদ্ধ 'জো'কে বলে—দেখছিস কি, এবার তোকে কাটব!

কথাটা সত্যিই হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। 'গির্জে' থেকে বর-কনে নেমে এসে বসেছে ঘরে, জোনাথান-জোহাররা জামার গায়ে ফুল লাগিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে। হাফপ্যাণ্ট-পরা, খালি গা—হিংস্র জন্তুর মতই গুঁড়ি মেরে মেরে বুড়ো জো-র কাছে এসে বসল চকচকে প্রকাণ্ড খাঁড়াটা নিয়ে। বললে—ওরে, সত্যিই তোকে দরকার। তোর খোল না হলে নাকি বিয়ে হবে না। দে, দে তোর খোলটা!

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠ—কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপরেই পশুর মত একটা হাঁক দিয়ে দু হাত দিয়ে সজোরেই উল্টে ফেলল বুড়ো 'জো'কে। তারপরে চাকচকে ধারালো খাঁড়াটা দিয়ে ওর হৃদ্‌পিণ্ডটা চিরতে গিয়ে অতর্কিত বিস্ময়ে থমকে থেমে গেল জো। কাকে সে কাটবে? তাকে যে সে সত্যিই একদিন কাটতে পারে, এটা দেখবার আগে বৃদ্ধ নিজেই চলে গেছে সব কাটা-ছেঁড়ার বাইরে। বোধ হয় অভিমানে—এক দুঃসহ, অব্যক্ত, নিদারুণ অভিমানে।

হাতের খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জো, জোনাথানকে উদ্দেশ করে কোনক্রমে বলে—নিয়ে যাও এই খোলটা, দাও গিয়ে বিয়ে।

সে নিজে আর দাঁড়ায় না, তরতর করে নেমে যায় নীচে, আরও নীচে—নিস্তরঙ্গ সরোবরটা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে।

ভিক্টোরিয়ায় জো-র একটা বিবর্ণ ছবি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে জো-র কাহিনী শেষ করল বিশ্ব, বললে—সেই থেকে জো-কে আর কেউ কখনও কোথাও দেখতে পায়নি।

আজও জনসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের ওপরে এতক্ষণে উঠে দাঁড়ানো সেই লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল—সত্যি কথা, ওদের সচরাচর দেখাও যায় না।

প লা শ

বিমল কর

ওখানে পলাশ ফুটেছে। ফাল্গুনের এই গোড়াতেই গাছগুলোর গা-মাথা লাল টুকটুক করছে। সকালের রোদে—শুধু সকাল কেন, একটু চড়া বেলার রোদে—দুপুরে, শেষ বিকেলেও যে কি সুন্দর দেখায়! তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তবু তো ওখানটা পলাশ-বন নয়; মাঠের মধ্যে এদিক-ওদিক দু-দশটা গাছ, এই যা। তা বলে ধুধু মাঠ নয়। ধান কাটার পর ফাঁকা ক্ষেত। কেমন যেন করুণ-করুণ চেহারা। আলের পর আল; আঁকাবাঁকা। তারই মধ্যে কোথাও একটা আমলকী গাছ দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও হরীতকী। পড়ো জমিতে জাম-জারুল। রেল-লাইনের পাশে টেলিগ্রাফ পোস্ট। তারের উপর ফিঙে। জল জমে জমে ডোবার মতন হয়েছে কোথাও, শেওলা-জমা সবুজ মতন জল, তার উপর তিরতিরে পাতা, জলশাক। ধবধবে বকগুলো এই এসে বসে, আবার উড়ে যায়। কোথায় যে যায়! আল ধরে ধরে খানিকটা গেলে ঝোপঝাড় কিছু আছে দূরে। ছায়া-ভরা গ্রাম-টাম হবে। 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।' উমা কৌতুকের সুরে হেসে উঠে রতিকান্তর বর্ণনায় ছেদ টেনে দেয়। বলে, 'আপনি কাজকর্ম কিছু করেন, না বসে বসে পলাশ গাছ আর মাঠ-বন দেখেন, সত্যি করে বলুন তো জামাইবাবু?'

রতিকান্তর পোশাক পরা শেষ হয়েছিল। সাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যাণ্ট। মোজা সমেত পাটা চটির মধ্যে গলিয়ে ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেটটা শেষ করে নিচ্ছিল। এখন সবে সাড়ে আটটা। এরই মধ্যে নাওয়া, খাওয়া, পোশাক পরা সব শেষ। বিনু একটা বড় মতন টিফিন-কৌটো ঝাড়নে বেঁধে এনে দেবে, আর চায়ের ফ্লাস্কটা; কাঠের ফ্রেমে আঁটা জলের কুঁজোও। চাপরাসী এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কৌটো, ফ্লাস্ক, কুঁজো নিয়ে চলে যাবে। তারপরই রতিকান্ত উঠে পড়বে। টেবিল থেকে সেই এক বিঘতটাক চওড়া নোটবই আর পেন্সিল পকেটে ফেলে, স্কেলটা বুকপকেটে গুঁজে, জুতো বদলে, চশমার উপর অ্যাটাচিটা এঁটে নিয়ে চলে যাবে রতিকান্ত।

'কাজকর্ম না করে কি উপায় আছে?' উমার কথার জবাবটা দিল রতিকান্ত। বিনু ফ্লাস্ক আর টিফিন-কৌটো হাতে ঘরে এসে পড়েছে ততক্ষণে। রতিকান্ত আবার বললে, 'তবে ফাঁকি মারতে ইচ্ছে হলে কেউ কি আর ঠেকাতে পারে!'

বিনু স্বামীর জন্যে কাচা পাট-করা রুমাল, ভাজা মসলা, এটা-সেটা গোছ করে দিতে দিতে বলল, 'রোজ রোজ তো শোনাচ্ছ, কি সুন্দর জায়গা, কি সুন্দর জায়গা—পলাশ ফুল ফুটছে, হাতিঘোড়া নাচছে—তা একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও না বেড়াতে।'

প্রস্তাবটা আগেও উঠেছে। উমা নিজেই বলেছে। আজ আবার। উমা ঠোঁট উলটে বললে, 'ও কথা আর বলিস না দিদি। জামাইবাবুর মাথা কাটা যাবে।'

'মাথা কাটা যাবে বলিনি তো।' রতিকান্ত সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। হাসিমুখ। বলল, 'চাকরিটা যাবে বলেছি।'

'ওই একই হল।' উমা দিদির ব্লাউজের হাতায় ফুল তুলছিল সুতো দিয়ে। দাঁত দিয়ে সুতো কাটল। নীচু মুখ। চোখ দুটো শুধু ভুরুছোঁয়া হয়ে রতিকান্তকে নজর করল।

বিনু বোনের হয়ে বললে, 'আর কারুর চাকরি যায় না, তোমার বেলাতেই যত অমুক সাহেব তমুক সাহেব দেখে ফেলবে।' কথাটা শেষ করতে করতে বিনু বাইরে চলে গেল। টিফিন, জলের কুঁজো চাপরাসীকে গছিয়ে দিতে।

রতিকান্ত ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠল। সামনেই ড্রয়ার দেওয়া টেবিল। তারই উপবে কাঠের টুকরো এঁটে আয়না বসানো। কাঁচটার রঙ কেমন একটু হলুদ-হলুদ। দু-চারটে চিড়ও আছে। রতিকান্তর নিজের হাতের মিস্ত্রীগিরি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের উপর চিরুনির কয়েকটা দ্রুত এবং অভ্যস্ত টান দিল রতিকান্ত। কাঁচের মধ্য দিয়েই উমার গোলগাল ফরসা মুখটা দেখা যাচ্ছিল। 'রেলের ট্রলির নিয়মকানুনটা আলাদা, বুঝলে উমা। এ তো আর তোমার দিদির কুড়িয়ে পাওয়া ঠেলাগাড়ি নয়।' বলে রতিকান্ত হেসে নিজেব বুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। 'এ ঠেলাগাড়িতে তোমার দিদি যা খুশি চাপাতে পারে। কিন্তু রেলের ট্রলিতে ওয়াইফকেও চাপানো যায় না।' রতিকান্ত হাসতে লাগল। সেই সঙ্গে নোটখাতা, পেন্সিল, রুমাল পকেটে পুরে নিচ্ছিল।

'আ—হা, কি কথা!' উমা জামাইবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসল। 'ওয়াইফের চেয়ে ওয়াইফ-সিস্টারের দাম বেশী মশাই। আপনার সাহেবকে সেটা বুঝিয়ে দেবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমিও তাই বলি। বিশেষ করে আমার যখন হারাধনের দশটি গিয়ে একটিতে ঠেকার মতন, সবেধন নীলমণি একটি মাত্র ওয়াইফ-সিস্টার।' রতিকান্ত মাথা নেড়ে নেড়ে বলল। তারপর দুজনের একসঙ্গে হাসি।

হাসি থামলে উমা বলল, 'আপনার সেই গোকুলবাবুর ওয়াইফ-সিস্টারের গল্পটা কাল রাত্রে যতবার মনে পড়েছে—ততবার হেসেছি জামাইবাবু।'

বিনু এল। রতিকান্ত তৈরী। শুধু জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ার বাকি।

ঘরের মধ্যে জানলার কাছে কাঠের দোলনায় রতিকান্তর মেয়ে ঘুমচ্ছে। দেড় বছরের মেয়ে। মেয়ের গালে আস্তে করে একটু আঙুল ঘষে হাসি-হাসি চোখে বললে রতিকান্ত, 'এ বেটী মাসীর মতনই তেজী হবে। এক ফোঁটা মেয়ের মুখের চেহারাটা দেখ! গাল ফোলানো, কপাল কোঁচকানো।'

বিনু স্বামীর সোলার হ্যাটটা পেরেক থেকে নামিয়ে এনেছে। জুতো পরা হয়ে গেলে এই টুপিটা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার যা বাকি। তারপর আর রতিকান্তর জন্যে করণীয় কিছু নেই।

'মাসীর মুখটা এমন কিছু ফেলনা নয়; বোনঝির তাতে জাত যাবে না।' উমা কৃত্রিম একটা ঝাঁজ দেখাল।

'তা ঠিক; তবে ফলাফলটাও খুব ভাল হবে বলে মনে হয় না—' রতিকান্ত খুব প্রচ্ছন্নভাবে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসিমুখে বাইরে চলে গেল।

বাইরে ঠিক নয়। ঘরের চৌকাঠের সামনে হেঁট হয়ে জুতো পরতে লাগল।

বিনুর সঙ্গে উমাও চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জুতোর ফিতে বেঁধে রতিকান্ত মুখ তুলল। বিনু টুপিটা দিল। উমা বললে, 'খুব যে মাসীর নিন্দে করে পালাচ্ছেন! আর আসছি না বাপু এখানে। এই প্রথম, এই শেষ।'

'ছি, ছি!' রতিকান্ত জিব কাটল, কানে আঙুল দিয়ে বলল, 'অমন কথা শুনতে নেই।'

'কেন বলবে না! সারা দিন তো নিজে ঘুরে বেড়াও—কিন্তু ওকে কবে একটু সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে গেছ?' বিনু বোনের হয়ে বললে, 'এসে পর্যন্ত তো মেয়েটার ঘরে বসে বসেই কাটছে।'

কথাটা রতিকান্তর কানে গেছে কি যায়নি বোঝা গেল না। জুতোর শব্দ তুলে ততক্ষণে সে এগিয়ে গেছে।

দুই বোনে একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। উমা দিদির কাঁধ থেকে খসে পড়া আঁচলটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'জামাইবাবু যেন কেমন হয়ে গেছে দিদি দেখছিস?'

'কেমন?' অন্যমনস্কভাবে শুধাল বিনু।

জবাবটা চট করে ঠোঁটে এল না উমার। কথাটা কেন বলল, কি দেখে,

কি ভেবে—উমাও তার হদিস পেল না। একটু থেমে যেন কিছু একটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বয়সেই কেমন যেন একটু বুড়ো-বুড়ো।'

বিনু মুখ ঘুরিয়ে বোনকে দেখল। তারপর কিছু না বলেই হাসল একটু।

দিন দুই যেতে না যেতেই এক সকালে উমার হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। রতিকান্ত কথা দিয়েছে, আজ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। না, না—চাঁদমারি কিংবা তিন-পাথরের গুহা থেকে চুঁইয়ে পড়া জল দেখতে নয়, নিয়ে যাবে ট্রলি করে, পাঁচ মাইল দূরের সেই পলাশ-ফোটা রোদ-ঝলমল মাঠে। রতিকান্তর মুখে শুনে শুনে সেই তেপান্তর সম্পর্কে উমার কেমন একটা কৌতূহল জেগেছিল। আর যদি সে কৌতূহল খুবই সাধারণ হয়, তাতেই বা কি! ট্রলির উপর বসে পাঁচ মাইল পথ, হাওয়ার দমকা খেতে খেতে হু হু করে এগিয়ে যাওয়া, ভাবতেই যে ভাল লাগে! ট্রলিতে কখনও চড়েনি উমা। দেখেছে। এই তো সেদিনও দেখল। লাইনের উপর দিয়ে যখন চলে যায়, এমন সুন্দর একটা গনগন আওয়াজ হয়! যেন একদল ভোমরা গুনগুন করছে। লাইন ধরে রাস্তাটাও—জামাইবাবু যেখানে কাজে যায়—নাকি চমৎকার। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ, ছোট ছোট দুটো নদী। উমার তো উৎসাহ খুব। কলকাতার অন্ধগলির বাসিন্দে সে। ট্রেনেই চড়েছে জীবনে হয়তো দু-চারবার। ফাঁকা মাঠঘাট, বন—এসব এক সিনেমার ছবিতে ছাড়া দেখেছেই বা কোথায়! আর দেখবেই বা কবে'

আসলে হয়তো এসব কিছুই না। শুধু একটা চঞ্চলতা, ঘর থেকে বাইরে বেরুবার; দু-পাঁচ ঘণ্টা কোথাও কোনও নতুন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসার।

অত সকালে কি স্নান সারা যায়, ভাতই কি খাওয়া যায়! তবু উমা স্নান সারল। ভিজে চুল শুকবে কি শুকবে না, বিনুনি দিলে নির্ঘাত জট; দরকার কি, এলোই থাক। ভাত দু-গরাস পেটে গেল। ওতেই হবে। 'বুঝলেন জামাইবাবু, লুচি আলুর দম সব বাপু বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সেই বেহালার মাঠে বেড়াতে যাওয়ার মতন। আমার আবার বাইরে বেরুলে খিদেটা বেশী পায়। দিদি, ক'টা পান দিবি? ও জামাইবাবু, যদি বলেন তো আমার সঞ্চয়িতাটা নিই; গাছের ছায়ায় বসে বসে পড়া যাবে।'

বিনু বোনের ছটফটানি দেখে বলে, 'তুই যেন হরিদ্বারে গঙ্গা চান করতে যাচ্ছিস উমি, এমনি করছিস। যা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিগে যা। ছাপা-শাড়িটাই পরে যাস, ভাল-টাল পরে দরকার নেই, জলে-কাদায় কাঁটার খোঁচায় তো একশা করে আনবি।'

যাবার মুখে কিছু না হোক উমা এক মুঠো এলাচ-দারচিনি নিয়ে বেরুল। রতিকান্ত হেসে বললে, 'তা ভাল, সারাটা পথ তোমার মুখ থেকে সুগন্ধ বাক্য শোনা যাবে।'

উমা ভ্রূভঙ্গ করে জামাইবাবুর হাতে চিমটি কেটে দিল। এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে জিব ভেঙিয়ে বললে মৃদু স্বরে, 'দয়া হলে এমনিতেই অনেক কিছু শোনাতে পারি মশাই।'

ট্রলিতে উঠে উমার মুখ যেন আর বন্ধ হয় না। একটার জবাব পেতে না-পেতে আর একটা। 'ও জামাইবাবু, মাথার উপর এ আবার কি? এ যে রাজছত্র! রঙটা সাদা কেন? পিছনের লোক দুটো যে লাইনের উপর দিয়ে ছুটছে—ও মা, পা পিছলে পড়ে যাবে না? আপনি ছুটতে পারেন লাইন দিয়ে? পারেন না!'

রতিকান্তর পাশে কাঠের বেঞ্চটায় বসে উমার যেন শান্তি হচ্ছিল না। একবার ডান দিকে, পরক্ষণেই বাঁ দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। সামনের জিনিসটা কখন যে হুস করে পিছনে পড়ে যাচ্ছে, ভাল করে ঠাওর করতেই পারছে না! তখন আবার ঘাড় ঘোরাও। দাঁড়িয়ে যেতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত উমা। কিন্তু সেখানে তার ভয় আছে।

একটা পুরো এলাচ মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগল উমা। 'ওটা কি জামাইবাবু? দেখুন, দেখুন—একপাল গরু কিভাবে নামছে ঢালু দিয়ে। যদি পা পিছলে পড়ে—'

রতিকান্ত প্রথম প্রথম জবাব দিয়েছিল; এখন আর সব কথার জবাব দিচ্ছে না। বুঝতে পেরেছে রতিকান্ত, উমার প্রশ্নগুলোর জবাব না দিলেও চলে।

খানিকটা এগিয়ে আসতে আশপাশের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। মাঠের পর মাঠ। উঁচুনীচু। ছোট ছোট শালঝোপ। জল-শুকনো বালি-কিচকিচ নালা। সামান্য দূরেই একটা পাহাড়ের ঢল নেমে এসেছে। গাছ আর ঝোপ সেই ঢালুর মুখে যেন কেউ গেঁথে বসিয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় পাথরের কালচে রঙ। একটা নীল মেঘ পাহাড়টার মাথার উপর চাঁদোয়ার মতন বসানো। দু-একটা লোক দেখা যায় কি যায় না।

পাহাড়টার নাম কি? কত দূর? ওখানে মন্দির আছে কি নেই? উমার বকবকানি শেষ পর্যন্ত থেমে এল।

পরিবেশটা আবার বদলাল। এবার দু-পাশে একটু তফাত থেকে বুনো ঝোপজঙ্গলের একটানা ছায়া-ছমছম চেহারা। ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, গাছের গা বেয়ে বেয়ে বুনো লতা। কতক পাখি। কাঠবেরালি।

উমা হঠাৎ কান খাড়া করে কি যেন শুনতে লাগল। 'ওটা কি ডাকছে জামাইবাবু?'

'ঘুঘু।' রতিকান্ত একটু অবাক হয়ে উমার দিকে চাইল।

'ইস, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল।' উমা আঁচল দিয়ে কপালটা চট করে মুছে নিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপটাও বেড়েছে।

রতিকান্ত রসিকতা করে বলল, 'ঘুঘুও কি কলকাতায় নেই নাকি উমা?'

'কি যে বলেন! তা নয়। কলকাতার ঘুঘুগুলো এমন সুন্দর করে ডাকতে পারে না। ওদের দম নেই।' উমা নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল।

রতিকান্তও হো হো করে হেসে ফেলল।

হাসি থামল। উমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এবার ঝুঁকে বসল। জানুর উপর কনুই, হাতের তালুতে মুখের ভার দিয়ে।

'আমরা কতটা এলাম জামাইবাবু?'

'অর্ধেকটা চলে এসেছি।' রতিকান্ত জবাব দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনার জলতেষ্টা পাচ্ছে না? আমার তো গলা শুকিয়ে এল।' সামনের রোদের দিকে চেয়ে চেয়ে উমা বলল।

তাতটা সত্যিই বেশ বেড়েছে। ফাল্গুনের গোড়াতেই এত ঝকঝকে রোদ এখন। লাইনগুলোতে যেন আঁচ লেগেছে, পাথরের টুকরোগুলোও বোধ হয় গরম।

'জলতেষ্টা পেয়েছে তো জল খাও।' রতিকান্ত কুঁজোটার জন্যে পিছন দিকে চাইল।

'থাক; এখন খাব না। বরং একটা পান খাই।' সত্যি-সত্যিই কাগজে মুড়ে গোটা চার-পাঁচ খিলি পান এনেছে উমা। রতিকান্ত পান খায় না। উমা জোর করে গুঁজে দিল মুখে। তারপর নিজে একটা খিলি মুখে পুরে বললে, 'আপনাকে বড় সাধ্যসাধনা করতে হয়। স্বভাবটা আজও তেমনি আছে। বদলাল না।'

ঠিক কি সূত্রে যে কথাটা, রতিকান্ত বুঝে উঠতে পারল না। অনুমান করতে পারল, কোনও একটা পুরনো প্রসঙ্গ আছে। বললে রহস্যভরেই, 'সাধ্যসাধনা আর করল কে? বলতে না-বলতেই চাকরির মায়া ছেড়ে এখানে বেড়াতে নিয়ে এলাম তোমায়।'

'যান, যান!' উমা মুখ না তুলে শুধু একটু ঘাড় ফেরাল, 'তাও যদি না সব কথা আমার মনে থাকত!' উমা চুপ করে গেল। ট্রলিটা লাইনের উপর সুন্দর একটানা শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে ঝলসানো রোদ। পাশের লাইন দিয়ে একটা মালগাড়ি আসছে এই মুখে। তার ইঞ্জিনের ধোঁয়া।

রতিকান্ত উমাকে দেখছিল। ফরসা মুখটা রোদের ঝাঁজে লালচে হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটি পানের রসে লাল। কাঁধে জড়ানো এলো চুল শুকিয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ছে কতকগুলো। কানের পাশে, কপালে। একটু যেন ঘাম জমেছে উমার কপালে।

নীরবতা কাটিয়ে উমা হঠাৎ বলল, 'আপনার বিয়ের পর এই আবার আপনার সঙ্গে দেখা। মধ্যে অবশ্য কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল—ঘণ্টাখানেকের জন্যে।'

কথাটা ঠিক। বিনুকে আনতে গিয়ে একবার দেখা হয়েছিল উমার সঙ্গে বিনুদের বাড়িতে। উমাই এসেছিল দেখা করতে শাঁখারীটোলার বাড়ি থেকে। বিনু তার মাসতুতো বোন। আলাদা আলাদা বাড়ি মা-মাসীর।

বাড়ি আলাদা হলেও মেয়েদের বিয়ের সময় একসঙ্গে পাত্র খোঁজা শুরু করেছিল মেয়ের মায়েরা। বিনুতে উমাতে এমন কিছু বয়সের তফাত নয়; বছর আড়াই-তিন বড় জোর। পাত্র হিসেবে রতিকান্তর সংবাদটা যোগাড় করেছিল উমার মা। বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল বিনুর সঙ্গে। তারপরে চারটে বছর কেটে গেছে, উমার বিয়ে হয়নি আজও। এই ক' বছরের মধ্যে উমাদের সংসারে ছোট-বড় অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে। উমার মা মারা গেছে। নানা কারণে ওর বিয়ের কথাটা চাপাই পড়ে আছে এখনও। আবার উঠবে। হয়তো উঠেছেও এর মধ্যে। নয়তো চার বছর পরে হঠাৎ এই শাল-পলাশের দেশে হাওয়া বদলাতে পাঠাবে কেন উমার বাবা এবং মাসী—বিনুর মা?

এসব পুরনো কথা আজ এখন উমা কিংবা রতিকান্তর মনে পড়ছিল কিনা, বলা মুশকিল। দেখা হবার কথায় হয়তো কিছু মনে পড়ে থাকতেও পারে।

'তুমি তো অনেক দিন থেকে এখানে আসব আসব করছিলে, এলেই পারতে!' রতিকান্তর গলার স্বর এমনিতেই একটু মৃদু, এখন আরও মৃদু এবং কোমল হল।

'আমার ইচ্ছাতেই যদি কাজ হত!' উমা সামনে-এসে-পড়া মালগাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

মালগাড়ির শব্দটা এতক্ষণ কথা ছাপিয়ে যাওয়ার মত ছিল না। এবার রীতিমত কর্কশ হয়ে উঠেছে। ঘটাং ঘটাং বিশ্রী একটা শব্দকে খাদে বেঁধে চাকা ঘষে যাওয়ার একটানা একটা আর্তনাদ। লাইনে, পাথরে, এই ফাঁকায় সেই শব্দটা যেন প্রতি মুহূর্তে আরও তীব্র হচ্ছিল।

উমার মনে হল, রতিকান্ত যেন কিছু একটা বলল। কি বলল, উমা শুনতে পেল না। শুধু একটা 'তুমি' ছাড়া।

দুজনেই চুপ। মালগাড়িটা পেরিয়ে গেল। শব্দটাও ডুবে আসতে লাগল।

একসময় আবার সব শান্ত। সেই ট্রলির চাকার শব্দ, সামনে ঝলসে-ওঠা রোদ, মাঠঘাট, টেলিগ্রাফ পোস্ট।

উমা মুখ তুলে রতিকান্তর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হাসল। 'আপনাকে আমি যত চিঠি দিয়েছি তার সিকির সিকিরও জবাব আপনি দেননি।'

রতিকান্ত কথাটায় যেন লজ্জা পেল। বললে, 'আমি ভাল চিঠি লিখতে পারি না, উমা। আর সেই একঘেয়ে আমরা ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ—এ লিখতেও ইচ্ছে করে না।' একটু থামল রতিকান্ত। যেন আরও কিছু বলার আছে এমন ধরনের একটা ভঙ্গি করে। শেষে বললে, 'তা বলে ভেবো না তোমার কথা মনে পড়ত না।'

উমা রতিকান্তর চোখের দিকে এক পলক চেয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল। নিজের পরনের ছাপা-শাড়িটার একটা ফিকে-হয়ে-যাওয়া ফুল দেখতে দেখতে বললে, 'চোখের সামনে কেউ থাকলে তাকে এসব কথা বলতে হয়, না জামাইবাবু?' কথার শেষে ম্লান একটু হাসি।

রতিকান্ত জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকল।

জায়গাটায় পৌঁছে উমা খুশী। রতিকান্ত যা বলেছে তার সঙ্গে যদি ফর্দ মেলানো যায়, কোথাও কমতি হবে না। সত্যিই সুন্দর এই জায়গাটা!

ট্রলি থেকে নেমে কিছুক্ষণ তো উমা চোখ ভরে সব দেখল। লাইনের এপাশটায় আল-তোলা ফাঁকা ক্ষেত। দৃষ্টির সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়—সবুজ একটা বনের মাথায় আকাশ যেখানে ছুঁয়ে যাচ্ছে, তত দূরে। মাঝে-মধ্যে একটি করে যেন কুঞ্জবন, অনেকগুলো গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশটায় পলাশ। ছাড়া ছাড়া, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় ঘেঁষাঘেঁষি। লাল টুকটুক করছে। সামনে কন্‌স্ট্রাক্‌শনের লাল-ইঁট-গাঁথা কেবিনের অসম্পূর্ণ চেহারাটা। চুন-সুরকির একটা ডাঁইও চোখে পড়ে। সামান্য কিছু মজুর, পাইপ, তারের বান্ডিল, রেল-লাইনও চোখে পড়ে।

রতিকান্ত বললে, 'তুমি ওখানটায় ছায়ায় বসে বসে জিরোও, আমি একটু কাজকর্ম দেখে আসি।'

উমা মাথা নেড়ে সায় জানাল। তারপর আস্তে আস্তে সামনের ছায়াটায় এসে বসল।

কি রোদ! আকাশটা যেন তার গা থেকে সমস্ত রোদের ঢেউ এই মাঠ আর ক্ষেত আর নিরিবিলি ফাঁকায় ছড়িয়ে দিয়েছে। অকৃপণভাবে। ফাল্গুনের হাওয়া। একটু তবু তপ্ত। কতকগুলো ফড়িং সামনের ঘাসে উড়ে উড়ে

ঘুরপাক খাচ্ছে। দু-একটা পাখি সামনে দূরে ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে আশেপাশে।

উমা মুখটা মুছে নিল। ট্রলিটা একপাশে ছায়ার নীচে রাখা রয়েছে। কাছেই। জলতেষ্টা পাচ্ছিল খুব। কুঁজোটা আনতে এগিয়ে গেল উমা।

জল খেয়ে, ছায়ার তলায় ঘাসে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে থাকল উমা। আশেপাশে কেউ নেই। পাখিদের খুব মৃদু একটা কিচিরমিচির ছাড়া কোনও শব্দ কানে আসে না। তাও এর মধ্যে ছেদ আছে—দীর্ঘ ছেদ। একটা ফড়িং উমার হাঁটুর উপর এসে বসল, ছাপা-শাড়ির ফুলের উপর। আবার উড়ে গেল। মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কখন যেন ঘোর লেগে যায় উমার।

রতিকান্ত কখন এসে পাশে বসেছে, উমার হুঁশ ছিল না। কিংবা হয়তো হুঁশ ছিল, তবু অন্যমনস্কতা কাটাতে পারেনি। রতিকান্ত জলের কুঁজো তুলে আলগোছে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

'কেমন লাগছে?' রতিকান্ত বেশ করে গা এলিয়ে বসল ঘাসের উপর।

'খুব সুন্দর।' উমা কোলের উপর জড় করা আঁচলটা পাশে ফেলে দিয়ে সুন্দর করে হাসল।

একটু চুপচাপ। উমাই বললে আবার, 'আমার যদি আপনার মতন কাজ হত, এখানে বসে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতুম।'

'একা একা?' রতিকান্ত পরিহাস করে শুধাল হাসিমুখে।

উমা রতিকান্তর দিকে আড়চোখে চাইল হাসিমুখেই। মাথা কাত করে জবাব দিল, 'দোকা যখন নেই, তখন একা একাই।'

রতিকান্ত সিগারেট ধরাল। আরও একটু আরাম করে বসল। বলল, 'তুমি কি কবিতা-টবিতা লেখ নাকি?'

'না। আপনার বিয়েতেই একটা যা লিখেছিলুম।' উমা রতিকান্তর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে থাকল।

'সেটা তো চুরি।' রতিকান্তর জবাব।

'কি?' একটা কৃত্রিম তিরস্কার, কিংবা প্রতিবাদ, 'আর একবার বলুন তো কি বললেন!'

'চমৎকার হয়েছিল কবিতাটা!' রতিকান্ত তাড়াতাড়ি তারিফ করার একটা ভঙ্গি করল, 'ফার্স্ট ক্লাস! কি ভাষা, কি ছন্দ! পড়লেই রবি ঠাকুরের সেই "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে" মনে পড়ে যায়।' হাসতে লাগল রতিকান্ত।

উমা চুপ। অন্য দিকে চেয়ে থাকল। বললে তারপর, খুব মৃদু গলায়, 'মিথ্যেই বা কি—বড় মাসীর বাড়ি তো আনন্দেই ছেয়ে গিয়েছিল।'

'আমি বোধ হয় আনন্দময়ী—সরি, আনন্দময় ছিলাম?' রতিকান্ত ধোঁয়া ছাড়ল।

উমা মাথা হেলাল।

রতিকান্ত হঠাৎ বললে, 'আর তুমি বেচারী বোধ হয় সেই দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে?'

রতিকান্ত হাসছিল। উমার মুখে হাসি ছিল না। এবার যেন একটু হাসি এল, রতিকান্তর কথা শোনার পর। বলল, 'আপনি যা ভাবেন।' উমা ঘাসের উপর থেকে আঁচলটা তুলে মুঠোর মধ্যে দুমড়োতে লাগল। আর বলব না বলব না করেও শেষে বলে ফেলল, 'আমার কবিতাটাই শুধু কি চুরি, আরও—' কথাটা শেষ করল না উমা।

ইঙ্গিতটা কিন্তু রতিকান্ত ধরতে পারল। উমার মার খোঁজ নেওয়া, দেখা পাত্র বিনুর মা চুরিই করেছে বলা যায়। পুরনো এই প্রসঙ্গটার জের না টেনে ব্যাপারটাকে লঘু করার চেষ্টা করলে রতিকান্ত। 'আমিও বোধ হয় কিছু চুরি-টুরি করেছিলাম, কি বল! নেহাত বেঁধে আনতে পারলাম না!'

একটু থেমে রতিকান্ত শালীর মুখের দিকে চাইল, 'সে কি আমার কম দুঃখ!' মুখে হাসিঠাট্টার একটা হায় হায় বেদনার ভাব ফোটাল রতিকান্ত।

উমার মুখে কোনও জবাব নেই। বেশ খানিকটা নীরবতার পর উমা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানে বসে বসেই কি দিন কাটাবেন নাকি! কই, উঠুন! বলেছিলেন না, যে দিকে দু চোখ যায়—বেড়াব!' বলতে বলতে উমা উঠে দাঁড়াল।

রতিকান্ত খানিকটা উঠে বসে রোদের দিকে চাইল। 'এই রোদে ঘুরবে? তারপর যদি মাথা ধরে?'

'আপনি টিপে দেবেন না-হয় একটু।' উমা হেসে উঠল। একটু আগের সেই গম্ভীর মুখের রেশ সবটুকু এখনও কাটেনি। তবু এই হাসি সুন্দর। রতিকান্তর ভাল লাগল।

উমা আবার তাগাদা দিল।

উঠল রতিকান্ত। শুধু ওঠা নয়। উমার কথামতন টিফিনের কৌটোটা পর্যন্ত হাতে ঝুলিয়ে নিল, চায়ের ফ্লাস্কটা কাঁধে। উমার ইচ্ছে, দূরের ওই ছায়াঘন কোনও কুঞ্জে বসে চা খাবে। বিকেলের আগে এ দিক আর মাড়াচ্ছে না।

হয়তো এমনিই হয়। একটা বাঁধা সীমানা ছাড়িয়ে চলে আসতে পারলে অনেক কিছু ভুলে যাওয়া যায়। শাঁখারীটোলার অন্ধ গলির মেয়ে অনেক কিছু ভুলল। ভুলে গেল যে, জুতো হাতে ঝুলিয়ে আল দিয়ে খালি পায়ে ছোটা দৃষ্টিকটু; ভুলে গেল যে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে বলে চোর-

কাঁটার ভয়ে গোড়ালির অনেকটা উ'চু পর্যন্ত কাপড় তুলে নেওয়া অসভ্যতা। শাড়ির তলায় খানিকটা সায়া যে বেরিয়ে রয়েছে পায়ের কাছে, এটা অভব্যতা। এবং হোক রতিকান্ত জামাইবাবু, তবু যখন-তখন তার হাত ধরে টানা, উঠতে-পড়তে তাকে জড়িয়ে ধরা, তার সঙ্গে অজস্র কথা বলা এবং ওর সঙ্গে অট্টরোলে সারাক্ষণ হাসাহাসিটা তার উচিত নয়। এ সবই অনুচিত।

রতিকান্ত ভুলে যাচ্ছিল। বিনুর স্বামী হিসেবে তার যেসব কর্তব্য, সেই কর্তব্যগুলো কি বজায় থাকছিল এখানে—এই রোদ-ভরা মাঠে আর ফাঁকায় আর ফাল্গুনের হঠাৎ মধুর দুপুরে? বোধ হয় থাকছিল না। উমার ফরসা রোদের ঝাঁজ-লাগা মুখখানা এত মুগ্ধ হয়ে তবে কেন সে দেখবে? মাথার উপরকার তাতটুকু বাঁচাবার জন্যে উমা আলগা কবে যে ঘোমটাটুকু তুলে দিয়েছিল, সেই ঘোমটাটুকু বা রতিকান্তর এত ভাল লাগবে কেন? কেন মনে হবে, তার পাশে পাশে মাথায় কাপড় তুলে দেওয়া যে মেয়েটি চলেছে এর সঙ্গে বিনুকে অনায়াসেই কল্পনা করা যায়?

উমার চঞ্চলতা, তার উচ্ছ্বাস, খোলা-মেলা রঙ্গ-রসিকতা রতিকান্তকে মুগ্ধ করছিল। শাঁখারীটোলার মেয়ে এত জীবন্ত—রতিকান্ত যেন জানত না। বুঝতে পারেনি, উমার মধ্যে এত সুন্দর এক আকর্ষণ এবং মাধুর্য লুকিয়ে আছে। এখন বুঝছে রতিকান্ত। উমার ছায়ায় নিজের ছায়াকে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে এই নির্জনে হাঁটতে হাঁটতে।

ওরা ফুল পাড়ল। একরাশ পলাশ ফুল। 'ইস, কি লাল' ইচ্ছে হচ্ছে, সব নিয়ে যাই।' দিন তো একটা ছোট্টমতন ফুল জামাইবাবু! মাথায় দিই। দূর ছাই, এলো চুলে কি আর ফুল থাকে?'

'কই, দাও, আমায় দাও। আহা, অত ছটফট ক'বো না। ফার্স্ট ক্লাস!' রতিকান্ত সুতোর মত দুটি চুলের গুচ্ছে ফাঁস দিয়ে পলাশ ফুলটা গুঁজে দেয়।

'আমি কিরকম ঘেমেছি, দেখছেন জামাইবাবু' কপাল গলা বুক ভিজে টসটস করছে।'

রতিকান্ত উমার ঘামের বিন্দু তোলা মুখ-গলা দেখল। উমার রঙটা রোদের তাতে তাতে আরও লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি বড় সুন্দর উমার। বেশ ঢলটলে। গলায় একটা তিল। আলতা-লাল ব্লাউজটা যেন জ্বলজ্বল করছে। রতিকান্তর ঘোর লাগে।

উমার আঁচল-ভর্তি পলাশ, ছাপা বাসন্তীরঙ শাড়িটায় কেমন একটা স্নিগ্ধতা।

'চলুন, এবার ওই পুকুরটার কাছে গিয়ে বসি। খুব ছায়া আছে।'

পুকুরের পাড়ে এসে বসল দুজন। ছায়া এখানে ঘন। গাছ, লতা-পাতা, বুনো মিষ্টি গন্ধ। জলটা কালো। ঘুঘু ডাকছে মাথার উপর। ক'টা শালিক ঘাস খুঁটছে।

টিফিন, চা শেষ করে ক্লান্ত দুটি মানুষ বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝে মাঝে উমা মাটির ছোট ছোট ঢেলা ছুঁড়ছে পুকুরের জলে।

'ক'টা বাজল জামাইবাবু?'

'তিনটে প্রায়।' রতিকান্ত ঘড়ি দেখে বলল।

'আর ঘণ্টাখানেক, তারপরেই ফিরব, কেমন?'

'না ফিরলেই বা কি!' রতিকান্ত হাসে। কিন্তু এ হাসি যেন শুধুই তরল পরিহাস নয়।

'ও বাবা, খুব যে আটখানা প্রাণ দেখি!' উমা দাঁতে করে ঘাসের শিষ কাটছিল। আড়চোখে চেয়ে বলল।

'আটখানা নয়, তবে দুখানা।' রতিকান্ত আমগাছের ডালপাতায় চোখ রেখে জবাব দিল।

উমা পা দুটো টান-টান করে ছড়িয়ে দিয়ে আবাম পেল। 'আমি কলকাতায় ফিরে গেলে টুকরো দুটো আবার জুড়ে যাবে, না জামাইবাবু?' সরলভাবে হাসছিল উমা।

রতিকান্ত জবাব দিল না। ভাবছিল কিছু।

মধ্যাহ্নের খর উজ্জ্বলতা এবার ম্লান হয়ে আসছিল। অন্তত এখানে। পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু পুকুরপাড়ের সবুজের উপর এসে পড়েছে তার তীব্রতা এখন আর তত নেই। এ যেন মরা আলো। যে পাশে রতিকান্তরা বসে আছে সে পাশটায় ছায়া আরও গাঢ় ঘন হয়ে আসছে। আবহাওয়াটা কেমন ক্লান্ত, অলস, তন্দ্রা জড়ানো। টুপটাপ দু-একটা পাতা খসে পড়ছিল পুকুরের জলে। একটা কাঠবেরালি আমগাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে। ঘুঘুর ডাকও আর শোনা যায় না। বোধ হয় উড়ে গেছে।

চুপচাপ দুটি মানুষ। কেউ কারুর দিকে চাইছে না। তবু দুজনেই অনুভব করতে পারছে, এখন একের মনে অন্যজন এই নিস্তব্ধ পরিবেশটির মতন ছড়ানো, মাখানো।

উমা আঁচলে জড় করা পলাশ ফুল মাঝে মাঝে তুলছিল আর রাখছিল। কখনও ফুলের নরম পাপড়ি গালে-গলায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে কোমল অথচ অন্যরকম এক স্পর্শ নিচ্ছিল।

তারপর একসময় উমা নিজের তন্ময়তার মধ্যে গুনগুন শুরু করল। সুরটা যখন কথায় ফুটল, তখন দিন আর মধ্য নেই, তবু তার কথাগুলো

বাতাসে যেন শব্দ ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যেতে লাগল। ঘরোয়া মেয়ের ঘরোয়া গলার গান। হয়তো সুরের হেরফের আছে। তবু, এ গান, এখন—এই পরিবেশে নিজের মতন করে জগৎ গড়ে নিতে পারে। 'মধ্যাদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি—হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।'

পাখিরা গান বন্ধ করেছিল, কিন্তু কোনও রাখাল বেণু বাজাল না। না বাজাক, রতিকান্তর মন দূর-বাঁশির সুর শোনার মতন আনমনা। উমার মনও।

গান থামল। ছায়া যেন আরও বিষণ্ণ হল এখানে। একটা দমকা হাওয়া এল। গাছ-পাতা নড়ল। হাওয়ার শব্দটা অবুঝ দীর্ঘনিশ্বাসের মতন খানিকক্ষণ ছটফট করে মিলিয়ে গেল।

রতিকান্তর চোখ নাকি সব সময়ে হাসি দিয়ে মাখানো। এখন মনে হচ্ছিল, কথাটা ভুল; ভীষণ এক অন্যমনস্কতা এবং বিষণ্ণতা মাখানো। সেই চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে উমাকে মাঝে মাঝে দেখছিল রতিকান্ত। উমার ঠোঁটে পানের লাল দাগ শুকিয়ে গেছে। চোখের তারার তলায় তেমনি একটা শুষ্কতা।

চারটে বেজে গেছে কখন। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। রতিকান্তর যেন হুঁশ হল। বলল, 'চল উমা, ওঠা যাক।'

উমা উঠে দাঁড়াল। পা বাড়িয়ে বললে, 'আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মাঝে মাঝেই একটা পুকুর দেখি। জল-টলটলে। এটা বোধ হয় সেই পুকুর, না জামাইবাবু?'

'বোধ হয়।' রতিকান্ত হাঁটতে শুরু করে বলল, 'এবার থেকে আমিও বোধ হয় দেখব।'

পুকুরের উঁচুটুকু পার হয়ে আসতেই একটা গাছে উমার আঁচল জড়িয়ে গেল। আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে গাছটা একটু দেখল উমা। হঠাৎ বললে, 'এটা কি গাছ, জানেন?'

গাছটা চিনত রতিকান্ত। বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলল না। মাথা নাড়ল, 'জানি না।'

অথচ মাঠে নেমে রতিকান্ত কিছুতেই বুঝতে পারল না, কামরাঙা নামটা কেন তার ঠোঁটে আটকে গেল? কেন? আর কেনই বা এখন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে তার?

পড়ে-আসা বিকেলের আলো দিয়ে ফিরে চলল রতিকান্ত আর উমা।

·

পাঁচটা নাগাদ ট্রলি ফেরার কথা। ফিরল না। মাঝখানে কোথায় প্যাসেঞ্জার-ট্রেনটা আটকে গেছে লাইনের গোলমাল হয়ে, খানিক দেরি হবে।

দেরি বলে দেরি! প্রায় একটা ঘণ্টা আটকে থাকতে হল। প্যাসেঞ্জার-ট্রেনটা চলে গেলে রতিকান্তরা যখন ট্রলিতে উঠল তখন সামনের মাঠে গোধূলি সবটুকু আলো ঢেলে দিয়ে মাটির তলায় চলে গেছে।

এবার ফেরার পালা। ট্রলিম্যানরা জোর কদমে ছুটেছে। ট্রলিটাও যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। উমা পায়ের কাপড় হাঁটু দিয়ে চেপে বসল। আঁচলে জড়ানো একরাশ পলাশ।

'দিনটা বেশ কাটল, না জামাইবাবু?' উমা বললে।

'হ্যাঁ। বেশ।'

'আমি তো ভুলতেই পারব না!' উমার এলো চুলের একটা গুচ্ছ হাওয়ায় তার চোখের উপর এসে পড়ল। চুল সরাতে লাগল উমা।

রতিকান্ত কোনও কথা বলল না।

চাঁদ উঠল। শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ। কেউ জানত না, খেয়ালও করেনি। হঠাৎ যেন চোখে পড়ল। পূব আকাশ ধবধব করছে। গোল চাঁদটা ওদের মুখোমুখি।

আর সেই চাঁদের আলো রেল-লাইনের দু-পাশে, সামনে মাঠে, গাছে, জঙ্গলে ছড়িয়ে গেছে। ডুবে গেছে বলা যায়। সবই স্পষ্ট, লাইন দেখা যাচ্ছে, পাথব, সিগন্যালের তার পর্যন্ত। পাশের মাঠঘাটও যেন সকালের ফরসায় স্পষ্ট। একটা ছুঁচ পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া সহজ।

উমা দু-চারটে কথা বলছিল এতক্ষণ, এবার চুপ করে গেল। রতিকান্ত একেবারেই অন্য মানুষ। কথা তো বলছেই না, উমার দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। ট্রলির চাকায় সেই সুন্দর একটানা শব্দ। ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়াটা দিচ্ছে। কি যে সুন্দর গন্ধ!

রতিকান্ত কথা বলছিল না। কিন্তু ভাবছিল। ভাবছিল, হঠাৎ এ কি হয়ে গেল তার? কেন হল? এমনিই হয় নাকি!

বিনুকে বারবার জোর করে মনের সামনে টেনে আনছে রতিকান্ত। এ যেন ঝুটো কি আসলেব বিচার। এতকাল—চারটে বছর বিনু কি ঝুটো ছিল? আবিষ্কার করার কারণটা আজই ঘটল রতিকান্তর। আজই। আজকের সকাল-দুপুর-বিকেলের অভিজ্ঞতার পর।

বিনু যে ঝুটো—এ কথাটা রতিকান্ত নানাভাবে ভেবেও স্থির করতে পারছে না। প্রথমত, তাকে স্ত্রী হিসেবে না ধরে একটি মেয়ে হিসেবেই ধরা যাক। পুরুষের চোখে খারাপ লাগবে এমন মেয়ে বিনু নয়। এ কথা ঠিক, বিনু ডানা-কাটা পরী নয়। কিন্তু এও তো ঠিক, বিনু কুৎসিত নয়। বিনুর রঙ ফরসা, উমার মতনই প্রায়। বিনুর মুখের গড়ন ভাল; উমার চেয়েও ভাল। বিনুর ঠোঁট দুটি সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। তার চুল আরও কালো।

দেহের গড়নে খুঁত যেসব আছে, সেসব খুঁত সকলের থাকে—লক্ষতে একটি-দুটি বাদে। উমার চেয়ে বিনু রূপের বিচারে হীন নয়, বরং ভাল। আর তাই তো রতিকান্তর বিয়েটা বিনুর সঙ্গেই হল। দিদি মেয়ে দেখে বিনুকেই সেরা ভেবেছিল।

রতিকান্ত এর পর বিনুকে স্ত্রী হিসেবে যাচাই করতে লাগল। ভাল লাগে না, এমন স্ত্রী তো বিনু নয়! যা চায় মানুষ স্ত্রীর কাছে—যেসব সহজ, সাধারণ প্রত্যাশা—বিনু তার কোনটাই মেটাতে পারে না এমন নয়। বিনু ভাল ঘরনী। স্বামীর জন্যে, সংসারের জন্যে তার দিনরাত্তির এক হয়ে গেছে। যদি বল সেবা—বিনু আর দশটা বাঙালী ঘরের মেয়ের মতন সেবাময়ী। তার মন নরম, কোমলতায় স্নিগ্ধ। স্বামীর পান-চুন হাতে হাতে যোগায়। রুমাল, গেঞ্জি, মোজা কাচে। আবার সর্দি হলে তেল মালিশ করে দেয়।

'বিনু আমায় ভালবাসে। আমি বিনুকে ভালবাসি। আমার মেয়েকে। আমার সংসারকে।' রতিকান্ত মনে মনে কথাটা বলে ফেলে অনেকটা স্বস্তি পেল।

কিন্তু? রতিকান্ত এতক্ষণ পরে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে উমাকে দেখল। উমা ভাবুকের মতন গালে হাত দিয়ে দিগন্ত-ধোয়া জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছে। ফাল্গুনের হাওয়ায় তার এলোমেলো চুল আরও আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

উমাকেও যেন বড় ভাল লাগছে। রতিকান্ত পুরনো কথাটা আবার মনে টেনে আনল। মনে হচ্ছে, এইভাবে যদি ট্রলিটা রাতের পর রাত জ্যোৎস্না-ডোবা মাঠঘাটের মধ্যে লাইন দিয়ে ছুটে যায়—রতিকান্তর ইচ্ছে হবে না, ওটা থামুক; রাত শেষ হোক।

কিন্তু এ কল্পনার অর্থ হয় না। রাত ফুরবে। চাঁদ ডুববে। ট্রলিও থামবে। তার চেয়ে বাস্তব একটা কল্পনা করা যাক। উমা যদি এখানে থেকে যায়, তার কাছে? যদি এমনি মাঝে মাঝে ওরা দুটিতে ফাঁকায় বেড়াতে বেরোয়? সেটা তো অসম্ভব নয়! তখন কি ভাল লাগবে না উমাকে? লাগবে, লাগবে, লাগবে।

রতিকান্তর মনে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি জুড়ে বসছিল। বেশ বুঝতে পারল রতিকান্ত, উমাকে তার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। একটা পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ বাইশ বছরের এক মেয়েকে যেমন করে ভালবাসতে চায়, যেমনভাবে।

.....আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে—এদের ভালবাসার পরও আমি কি করে উমাকে ভালবাসতে পারি? এটা সম্ভব নয়।......

সম্ভব যে কেন নয়, রতিকান্ত ভেবে ভেবেও তার কোনও সুসংগত কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। যেসব কারণ সকলেই জানে, রতিকান্তও—তারও, বাস্তবিক তার কোনও কিছুরই মাথামুণ্ডু রতিকান্ত বুঝতে পারছে না এখন।

ইচ্ছে করাটা এক, আর ইচ্ছে করতে নিষেধ করাটা অন্য জিনিস। ইচ্ছেটা মনের, নিষেধটা অন্যের।

ভালবাসার এই ইচ্ছের সঙ্গে কি আর কিছু নেই? কিচ্ছু না? রতিকান্ত মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে টেনে টেনে স্নায়ুগুলোকে একটু পরিষ্কার করতে লাগল।

কিন্তু কিছুই হল না। রতিকান্ত অনুভব করতে পারল, তার আবার নতুন করে ত্রিশের আগে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। যখন তার বিয়ে হয়নি, যখন যে-কোনও মেয়েকে ভালবাসা যেতে পারত, অন্তত সেটুকু নিষ্কলুষ স্বাধীনতা তার ছিল।

··এখন আমার আর সে স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছে থাকলেও। মন চাইলেও। ভালবাসার জন্যে মন কাঁদলেও।. . . .

কেন?

কেনর জবাবটা সত্যিই রতিকান্ত জানে না। অথচ বিনুকে জানে, এবং কেনর কথায় বিনু, বিনুর মেয়ে আসে। তারা আসবেই। রতিকান্ত তাদের সরাতেও চায় না।

ট্রলিটা প্রায় রতিকান্তদের স্টেশনটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তেমনি খই-ছড়ানো জ্যোৎস্না, দক্ষিণের হাওয়া, উমার লাবণ্য-ভবা মুখ।

রতিকান্তর মনে হঠাৎ অন্য একটা কথা কিভাবে যেন এসে যায়। ঢেউয়ের একটা ধাক্কার মতন। আর কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেকেই তার পাগল মনে হয়।

তবু কথাটা না ভেবেও পারে না রতিকান্ত। তার মনে হয়, ভালবাসাটা একটা গুণ। গুণ। কোয়ালিটি। নিজের মনের কাছে নিজের মুখ রেখেই রতিকান্ত তার এই সহসা-আবেগ প্রকাশ করে ফেলে। যেমন দয়া, যেমন সততা—রতিকান্ত বলছিল এবং বেদনা অনুভব করছিল—তেমনি আমার, আমাদের এ ভালবাসা, এই ভালবাসার ইচ্ছাটা একটা গুণ। আমাকে—আমাদের এই ভালবাসাকে সংখ্যায় বেঁধে ফেলতে বলছ! বেশ তো, বাঁধছি। আমার স্ত্রীকেই আমি ভালবাসব; একটি শুধু মেয়েকে। কিন্তু ভালবাসতে ইচ্ছে করছে উমাকে—এই ইচ্ছেকে তুমি নষ্ট করে দিতে চাও? পারবে? পারবে না।

একটা শব্দ উঠছিল। ট্রলি ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। স্টেশন এসে গেল।

ট্রলি থেকে নামবার সময় উমা হঠাৎ বললে, 'ও জামাইবাবু, আমি কি এমনিভাবে পুঁটলি বেঁধে রাস্তা দিয়ে যাব নাকি? ফুলগুলো আপনি নিন।' উমা আঁচল খুলে ধরল।

রতিকান্ত থমকে চেয়ে থাকল একটু। টকটকে রোদে পলাশগুলো কত লাল ছিল, আর এখন চাঁদের এমন আলোতেও যেন সেই লাল মরে ক্ষয়ে কেমন পাংশু রঙের হয়ে গেছে।

'তাই দাও।' রতিকান্ত ম্লান হাসি হেসে বলল, 'ওগুলো এখন আমার হাতেই ভাল মানাবে।' ফুলগুলো তুলে রুমালে বাঁধতে লাগল ও।

'মানে?' উমা তাকাল।

'মানে আর কি? ওদের অবস্থা এখন আমারই মতন।'

উমা জামাইবাবুর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বললে, 'ছি, ও কথা বলবেন না! বলতে নেই!'

উমার চোখে বড় সুন্দর একটু হাসি ছিল।

ঈর্ষা

রমাপদ চৌধুরী

একসময় শান্তনুকে আমরা উপহাস করতাম। উপহাস করবার মতই একটা কাজ তখন করে বসেছে শান্তনু। বি· এ· পাস করার আগেই বিয়ে করে বসেছে। তাও একেবারে ডল-পুতুলের মত একটা গ্রাম্য মেয়েকে। গ্রাম্য, অশিক্ষিত, তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে গলা অবধি ঘোমটা টেনে যেদিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন না হেসে পারি নি। মনে হয়েছিল, নাকে মুক্তোর নাকছাবি না থেকে নথ থাকলেই যেন বেশী মানাত।

সহপাঠীদের সকলকে অবশ্য বরযাত্রী যাবার জন্যে বলে নি শান্তনু। খবরটা সকলের জানবার কথাও নয়। কিন্তু দেখা গেল, সারা কলেজে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, শান্তনু বিয়ে করছে।

গোলগাল ফরসা নাদুসনুদুস চেহারার শান্তনুর মুখে-চোখে এমনিতেই কেমন একটা বোকা-বোকা ভাব ছিল। দুলে দুলে ঘাড় কাত করে হাঁটত সে, দুলে দুলে ঘাড় কাত করে ক্লাসে ঢুকত। আর তা দেখে মেয়েরা, যারা আড়াআড়ি করে পাতা কয়েকটা বেঞ্চিতে আমাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে বসত, তারা পরস্পরের সঙ্গে চোখের ইশারায় কি যেন বলাবলি করে ঠোঁট টিপে টিপে হাসত।

তাদের সেই চাপা হাসিটা কিন্তু সশব্দে খিলখিল করে উঠল শান্তনু যেদিন হলদে চিঠির তাড়া নিয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে এল।

অন্য কেউ হলে হয়তো চেপে যেত। কিন্তু শান্তনু বলে ফেলল, বউ তার গ্রামের মেয়ে, ইস্কুলে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বয়েস তেরো কি চোদ্দ। আর সবশেষে বললে, মা বলেছে, দেখতে কিন্তু সুন্দর।

খবরটা আমার কাছ থেকে শুনল নীলিমা, নীলিমার কাছ থেকে সমস্ত মেয়েমহল। হাসির হুল্লোড় উঠল তাদের মধ্যে।

ওঠবারই কথা। কারণ এ কলেজে কোন ছাত্র তখন পর্যন্ত বিয়ের কল্পনাও করে নি। ছাত্রীদের মধ্যে দু-দশজনের সিঁথিতে যদি বা সিঁদুর উঠেছিল, তবু তারা সিঁথির পাশের চুলগুলো ফাঁপিয়ে কিভাবে যেন সিঁদুরের রেখাটুকু ঢাকবার চেষ্টা করত। অর্থাৎ তখন কি ছাত্র, কি ছাত্রী, আমাদের সকলের মনেই একটা রঙিন না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁয়া স্বপ্ন কুয়াশার মত জমে আছে। চোখে চোখে কত কি কল্পনা! হৃদয়ে অনেক রোমাঞ্চ!

নাকে নথ পরলে যাকে ভাল মানাত, শান্তনুর সেই জড় পদার্থের মত বউটিকে দেখে তার সঙ্গে নীলিমাকে তুলনা করে মনে মনে আমি গর্বিত না হয়ে পারি নি। নীলিমার মত মেয়ে আমাদের কলেজে আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। নীলিমার চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল যার জন্যে সকলের চোখ গিয়ে পড়ত তারই ওপর। রূপসী ছিল না নীলিমা, কিন্তু রূপে তার শ্রী ছিল। তার চেয়েও বেশী ছিল মুখে-চোখে সপ্রতিভ ভাব। মুখের পেশীতে কোন কুঞ্চন না ফেলেও শুধু চোখ-জোড়া তার এত মধুরভাবে হাসত, এত স্নিগ্ধ ছিল তার গলার স্বর যে, তার সঙ্গে শুধু কথা বলার জন্যে অনেকেই লুব্ধ ছিল।

সেদিনই ক্লাস পালিয়ে প্রতিদিনের মত নিরুদ্দেশভাবে এ-গলি সে-গলি বেড়াতে বেড়াতে একসময় নীলিমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, রসগোল্লার বউকে দেখে এলেন?

শান্তনুর গোলগাল চেহারার জন্যে মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করে 'রসগোল্লা' নাম দিয়েছিল।

বললাম, হ্যাঁ, দেখে এলাম।

—কেমন দেখতে? পান্তুয়া, না লেডিগিনি? বলে আবার হেসে উঠল নীলিমা।

বললাম, লেডিগিনিই বলা চলে, যেমন কালো তেমনি গোলগাল।

নীলিমা হেসে বললে, এইবার আপনিও একটা বিয়ে করে ফেলুন, অমনি একটা গেঁয়ো মেয়ে দেখে। দিব্যি রান্নাবান্না করে দেবে, কলেজে আসার আগে পান সেজে দেবে—

সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আর দিব্যি একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে—

কথা শেষ করার আগেই হয়তো হেসে লুটিয়ে পড়ত নীলিমা, কোনরকমে আমার কাঁধে হাত রেখে সামলে নিল বটে, কিন্তু তার বুকের কাছে ধরা বই-খাতার স্তূপ ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর। সেগুলো কুড়িয়ে দিতে দিতে লক্ষ করলাম, গলির মোড়ের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি বয়স্কা গৃহিণী সকৌতুকে কি যেন বলাবলি করছে আমাদের সম্বন্ধে।

তাড়াতাড়ি দুজনেই পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। কারণ, লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে বড় অস্বস্তি বোধ করতাম তখন। আর বুঝতে পারতাম না, কেন ষাট বছরের বুড়োও ফিরে তাকাত আমাদের দিকে, খোঁড়া ভিখিরীটাও কেন ড্যাবড্যাব করে তাকাত। আর মিষ্টির দোকানের সামনে উনুনের ঠান্ডা ছাইয়ের গাদায় কুস্তি লড়তে লড়তে রাস্তার ল্যাংপেঙে ছেলেগুলো কেন ছুটে এসে নীলিমার কাছে পয়সা চাইত।

এখন বুঝতে পারি। কতই বা বয়স তখন আমাদের! কুড়িও পার

হয় নি। নীলিমার বয়স কিছু কম। আর তখন আমি যদিও একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে কলেজে আসি, নীলিমা কিন্তু আসত একরাশ বই-খাতা দু হাতে আড়াআড়ি করে বুকে চেপে। তাই সকলে হয়তো বুঝতে পারত, আমরা কলেজ পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ক্রমশ নেশাটা আমাদের দুজনকেই এমনভাবে পেয়ে বসল যে, বলা চলে, কলেজ পালাবার জন্যেই আমরা কলেজে আসতাম। দুপুরের রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম কোনদিন, কখনও বা নির্জন কোন চায়ের দোকানে। যেদিন সময় বেশী পেতাম, চলে যেতাম চিড়িয়াখানায়, মিউজিয়মে, চাঁদপাল ঘাটে। ইডেন গার্ডেনের সবুজ ঘাস কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গাছের ছায়ায় বসে বসে কিভাবে যে সন্ধ্যে হয়ে যেত, টের পেতাম না। কখনও অনর্গল আজেবাজে অর্থহীন কথায়, কখনও নিশ্চুপ স্তব্ধতায় শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু উপভোগ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত।

পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েক মাস বাকি। তবু পরীক্ষার কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়িয়ে দিল শান্তনু।

হঠাৎ একদিন এসে বললে, পরীক্ষা দেওয়া আর হল না, কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

শান্তনুর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, এ কলেজে পড়ার এত ইচ্ছে ছিল আমার—

বললাম, পড়লি না কেন? কে বাধা দিচ্ছে?

শান্তনু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, এখানে মেয়েরাও পড়ে জানতে পেরে মা বললে, বিয়ে না করলে পড়া চলবে না। এখন বলছে, চাকরি না করলে, রোজগার না করলে বউকে এনে রাখা চলবে না। কি করি বল্? তোরা কিন্তু বেশ আছিস ভাই।

না হেসে পারি নি তার দুর্দশায়। তারপর যখন শুনলাম কোন একটা আপিসে চাকরি পেয়েছে সে, পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তাকে রীতিমত নির্বোধ মনে হয়েছিল। চাকরি কি পালিয়ে যাচ্ছে? পড়া শেষ করে করা যেত না?

নীলিমা শুনে হেসে উঠল : হরিপদ কেরানী এবার আকবর বাদশা হবে। আপনিও একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে কলেজ ছেড়ে দিন না!

বললাম, দেব—এখন নয়, কয়েক বছর বাদে। আর তখন যদি বেগম পাই, বাদশা হতে বাধবে না।

নীলিমার সুন্দর শরীরটা উজ্জ্বল হাসির তোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। শাড়ির আঁচলটায় ডান হাতখানা মুড়ে দাঁতে তার প্রান্তটুকু চেপে বললে,

কলেজে-পড়া মেয়ে তো আর বেগম হবে না, তার চেয়ে লেডিগিনি খুঁজতে শুরু করুন।

কিন্তু আমি জানতাম, স্পষ্ট করে ভালবাসার কথা কোনদিন উচ্চারণ না করলেও, ভবিষ্যতে একটি শান্ত সংসারের ছবি আমাদের কারও মনে উদয় না হলেও আমরা পরস্পরের ওপর একটা অস্বাক্ষরিত স্থির বিশ্বাসের দাবি মেনে নিয়েছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম বলেই সে কথাটা কোনদিন প্রকাশ করে বলি নি, সে কথাটা শোনবার জন্যে কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করি নি।

শুধু পরীক্ষা পাস করে নীলিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এবার?

—চাকরি নাও।

পরীক্ষা পাস করে নীলিমা এসে প্রশ্ন করেছিল, এবার?

—আবার পড়।

অর্থাৎ তখন আমরা পরস্পরের উপদেষ্টা।

সুযোগ পেয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়লাম সেই সময়ে। আর ভাবলাম, এইবার বলি নীলিমাকে নতুন সংসারের কথা। যদিও তখন মনে মনে বেশ একটা সন্দেহ ছিল, এই রোজগারে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতা কিনা! কিন্তু তা যে এতখানি নির্বুদ্ধিতা, বুঝতে পারতাম না, যদি না সিনেমা-হল থেকে বেরিয়ে এসেই শান্তনুর সঙ্গে দেখা হত।

শান্তনুকে দেখতে পেয়েই আমার হাতে একটা চিমটি কেটে কৌতুকে হেসে উঠল নীলিমা। যেন শান্তনুর চেহারাটাই হাস্যকর। বললে, এই, রসগোল্লা! তোমার বন্ধু।

শান্তনু তখন ফিরে তাকিয়েছে।

বললাম, কি রে, কি খবর?

নীলিমা আঁচলে হাসি ঢেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার দিকে তাকিয়ে শান্তনুর মুখে কেমন একটা অস্বস্তির ছাপ পড়ল।

তবু কিন্তু-কিন্তু করে বললে, বেশ আছিস তোরা। আমি ভাই নাজেহাল হয়ে গেলাম। এক শো টাকা মাইনে, এদিকে দুটো বাচ্চা। ছোটটা—মেয়েটা ভুগছে ক' মাস থেকে, ডাক্তারের খরচ দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

আরও অনেক দুঃখের কথা বলল শান্তনু। শেষে জিজ্ঞেস করল, বিয়ে করেছিস?

বললাম, না।

শান্তনু হেসে বললে, তোর কি, শিক্ষিত শহুরে মেয়ে বিয়ে করবি, দরকার হয় দুজনেই চাকরি করে দিব্যি সংসার চালাতে পারবি। যাক, চলি ভাই, ছেলেটার জন্যে আবার ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।

শান্তনু চলে গেল। আর তার দুর্দশার কথা শুনে নীলিমা হেসে কুটিকুটি।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আমি বাবা ওসবের মধ্যে নেই। চাকরি-বাকরি একটা না করে—

আমারও মনে হল, কথাটা মোটেই যুক্তিহীন নয়। স্বপ্ন দেখা এক জিনিস, আর তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অন্য। অর্থই পরমার্থ এ যুগে, তার অভাবে কত সুখের সংসারও বিস্বাদ হয়ে যায়। কত উন্মাদ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়।

এ কথাটা বোধ হয় আমার চেয়েও ভাল করে বুঝত নীলিমা। তাই পড়া শেষ করেই একটা চাকরির জন্যে উঠে-পড়ে লাগল সে। আর শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েদের ইস্কুলে চাকরি পেয়েও গেল।

তারপর একটা বিশেষ দিন দেখে আমাদের পরস্পরের স্থিরবিশ্বাসকে স্বাক্ষরিত রূপ দিলাম। উঠে এলাম এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

এতদিন শান্ত সংযত ছিল নীলিমা। বাস্তবের মাটি থেকে এতটুকু পা তুলতে রাজী হত না। কিন্তু এই নতুন ঘরের হাওয়ায় কি যেন এক নেশা ছিল। উচ্ছল উন্মাদনায় নেচে উঠল ওর চোখের তারা। এই প্রথম বোধ হয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

কোত্থেকে একটা বাচ্চা চাকর যোগাড় করে আনল, তাকেই রান্নার কাজ শিখিয়ে নেবে। চল, একটা কুকার কিনে নিয়ে আসি; কমলাদি বলছিল, রান্নার খুব সুবিধে। খাট কি হবে, একটা তক্তাপোশ হলেই চলবে। রেণুদি—ভূগোলের টিচার—বলছিলেন যে, চেয়ার-টেবিল নিলামে কিনলে অনেক সস্তা। জানলার পর্দাটা পালটে আনবে, সবুজ রঙ আমার বিষ লাগে। চল, তোমার সঙ্গে আমিও বাজার যাব। এই যা, তালা কেনা হয় নি যে! না, না—কেনা তোশকে শুতে পারব না! মড়া নিয়ে যাওয়ার কিনা কে জানে! তার চেয়ে নতুন তৈরি করিয়ে নাও। দু-দিন কি মাদুরে শোয়া যাবে না! একটা ফুল-দানি কিনে আনব ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়, কেমন!

সত্যি, দেখে দেখে বিস্মিত হতাম। দু-দিনেই ছোট ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর কি সুন্দর করে সাজিয়ে তুলল নীলিমা! জীবনের কোথাও যেন যতি নেই, ছেদ নেই। কোথাও যেন কুশ্রীতা রাখবে না, গ্লানি রাখবে না।

আনন্দের স্রোতে, রোমাঞ্চের মত্ততায় গা ভাসিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আশা করেছিলাম, এমনি করেই বুঝি সমস্ত জীবনটা কেটে যাবে। কিংবা কে জানে, জীবনের কথাই হয়তো তখন ভাবতাম না। জীবন যে এত দীর্ঘ তা জানতাম না।

আমাদের দুজনের মনেই তখন একটি নেশা। পরস্পরকে চমকে দেবার

নেশা। কোন-কোনদিন তাই আপিসের ছুটি হওয়ার অনেক আগেই ফিরে আসতাম। কোনদিন নীলিমা ফিরে আসত অনেক দেরিতে। তার প্রতীক্ষায় বসে বিরক্ত-হয়ে-ওঠা আমার মুখটা দেখতে নাকি বেশ মজা লাগে। বলত নীলিমা।

এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিল। শুধু দুঃসহ লাগত মাঝে মাঝে যখন নাইট ডিউটি দিতে হত। অথচ সেটুকু সহ্য না করেও উপায় ছিল না। খবরের কাগজের আপিসে বার্তা বিভাগের চাকরি, সে কেন জানতে চাইবে একটি নতুন-বাঁধা হৃদয়ের বার্তা!

নীলিমা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত, ও চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

বলতাম, দেব, তার আগে অন্য একটা জুটিয়ে নিয়ে।

কিন্তু জুটিয়ে নেব বললেই কি জোটে? নাকি চাকরি করতে করতে সে উদ্যম সকলের থাকে?

তবু তারই মাঝে রোমাঞ্চ বুনে নিতাম। চেষ্টা করতাম, যাতে পরস্পরকে চমকে দেওয়ার নেশাটা না কেটে যায়।

তাই সেদিন নাইট ডিউটি সত্ত্বেও শরীর খারাপের নাম করে ফিরে এলাম। গলির চৌকো ধোঁয়াটে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

ঘরে ঢুকেই বললাম, আজকের এমন সুন্দর রাতটা তোমাকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে হল না; চল, ছাদে গিয়ে বসি।

চোখ কপালে তুলল নীলিমা। বিছানার ওপর স্তূপীকৃত খাতার রাশি দেখিয়ে বললে, বেশ! আর ওই পরীক্ষার খাতাগুলো কে দেখবে? কালকেই শেষ দিন, ফেরত দিতে হবে।

সারা রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম, ঘুমবার চেষ্টা করলাম। আর হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলাম, নীলিমা তখনও টেবিল-ল্যাম্পের নীচে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষার খাতা দেখছে। নিজেকে শান্ত করলাম এই ভেবে যে, প্রতিদিনই তো আর পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে না নীলিমাকে।

এদিকে ক্রমশ টের পাচ্ছিলাম, একটা সংসারকে সচল রাখতে দুটো রোজ-গারের চাকাও যথেষ্ট নয়। তাই উপরি-আয়ের চেষ্টা করতে হত। আর সেই উপরি-আয়ের আশাতেই সুযোগ পেলে দু-চারটে প্রবন্ধ লিখতাম। দু-চার-খানা বই আর পত্রিকা উল্টেপাল্টে 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতি' বা 'স্বাধীনতা ও মহাত্মাজী' ধরনের প্রবন্ধ লেখা তো কিছু শক্ত নয়। দু-দশ টাকা যদি আসে তো মন্দ কি!

ভোরবেলায় উঠে খাতা-কলম নিয়ে হয়তো লিখতে শুরু করেছি অমনি নীলিমা এসে বললে, এই, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—চল, আজ রেণুদি আমাদের দুজনকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।

—কিন্তু প্রবন্ধটা যে আজকেই চাই!

মুখ থমথম করে উঠত নীলিমার : তা বলে সামাজিকতা মানবে না? নেমন্তন্ন করেছেন—

বাধ্য হয়েই উঠতে হত। কিন্তু তখন বোধ হয় বুঝতে পারতাম না যে, ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে নীলিমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছি।

সংসারের চাকাকে সচল রাখতে হলে কিছু উপরি-আয় যে প্রয়োজন তা নীলিমাও যে বুঝত, তার প্রমাণ পেলাম দিন কয়েক পরেই।

সারা দিন আপিস করে ভিড় ঠেলে বাসে উঠে বাসায় ফিরতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। বাসায় ঢোকার আগেই নীলিমার গলা শুনলাম। বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, এতবার বললাম, মনে থাকছে না কেন? চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হলেন কেন? কি দেখে অনুশোচনা হল তাঁর?

কি ব্যাপার? ঢুকেই দেখি, একটি বছর বারো বয়সের মেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে, আর নীলিমা পড়াচ্ছে তাকে।

পাশের ঘরে এসে বসলাম, মন বিরক্ত হয়ে উঠল। কানের কাছে তখনও নীলিমার গলা ভেসে আসছে : কলিঙ্গ যুদ্ধজয়ের পর শত শত সহস্র সহস্র মৃতদেহ দেখিয়া সম্রাট অশোক—

ন'টা বাজার পর ছাত্রীকে বিদায় দিয়ে উঠে এল নীলিমা। মৃদু হেসে বলল, আজ থেকেই শুরু করলাম। বলি নি তোমাকে, মাসে পঁচিশ টাকা করে দেবে, শুধু সন্ধ্যের সময়টা পড়াতে হবে।

সমস্ত মন যেন বিষিয়ে উঠছিল নীলিমার বিরুদ্ধে, নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, কখন থেকে যেন অদৃষ্ট মানতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

আমার মুখের ভাবে বোধ হয় মনের ঝড়টা টের পেল নীলিমা। কৌতুকের হাসি হেসে এসে দাঁড়াল আমার পিছনে। ওর নরম সরু সরু আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে কাঁকুইয়ের মত টানতে টানতে বললে, রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি! দুটো টাকা যদি পাওয়া যায়—রাণুদি, কমলাদিও তো ট্যুইশনি করেন। তা ছাড়া তোমার খাটুনি তো কত বেশী—আমার মোটেই কষ্ট হয় না।

মন নরম হয়ে গেল মুহূর্তে। বেচারী! আমার জন্যেই তো—

সব বুঝতাম। কিন্তু সব বুঝেও নীলিমার বিরুদ্ধে এভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠব একদিন, আমি নিজেও কল্পনা করি নি।

মাস কয়েক পরের কথা। নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরে এলাম ভোরবেলায়। খিদেয় পেট জ্বলছে, ক্লান্ত শরীর, অথচ—

বাড়ি পৌঁছেই দেখলাম, নীলিমা সেজেগুজে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্লেটে ঢেলে চা খাচ্ছে। বেশ একটা তাড়াহুড়োর ভাব মুখে-চোখে।

বললাম, কি ব্যাপার?

হাসল নীলিমা: মর্নিং স্কুল শুরু হল যে! স্টোভে জল চড়িয়ে দিয়েছি, চা-টা তুমিই করে নিয়ো, আর কিছু খাও তো চাকরটাকে ব'লো—

বলেই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সে।

সে এক দুঃসহ জ্বালা। দিনের পর দিন। ভোরবেলায় ফিরে আসি, আর নীলিমা ছুটতে ছুটতে চলে যায় মর্নিং স্কুলে। রাত জাগতে হবে বলে এগারোটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি, নীলিমা কখন ফেরে টেরও পাই না। সন্ধ্যের সময় ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, নীলিমার ছাত্রী এসে হাজির হয়েছে। কানের পাশে পাঠ্যপুস্তকের ঘ্যানঘ্যানানি ভাল লাগত না, বেরিয়ে পড়তাম। একা একা ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায়, পার্কে, যেখানে খুশি।

ন'টার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আপিসে বেরিয়ে যেতাম। বাড়িতে একা বসে থাকার চেয়ে যেন বাইরে একা থাকাও অনেক রমণীয়। নীলিমাকে পেয়ে নীলিমার সান্নিধ্যের লোভে যে বন্ধুদের ভুলে গিয়েছিলাম, তাদেরই খুঁজে বেড়াতাম, খুঁজে বের করতাম কখনও কখনও।

তবু এক-একদিন হঠাৎ মনে রোমাঞ্চ জাগত। মনে হত, নীলিমার উপর যেন অবিচার করছি।

সেদিন দুপুরের শিফ্‌ট শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মনে হল, বহুদিন সিনেমা দেখি নি। নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখি নি বহুদিন।

একেবারে দুখানা টিকিট কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রবিবার, সুতরাং নীলিমার ছাত্রী থাকবে না আজ।

এসে বললাম, চল, সিনেমা দেখে আসি—টিকিট কেটে এনেছি।

চোখ কপালে তুলল নীলিমা: না জিজ্ঞেস করেই টিকিট কাটলে?

—কেন? ছাত্রী তো নেই আজ!

নীলিমা হাসল, বিমর্ষ হাসি: ছাত্রী নেই, কিন্তু আমিই ছাত্রী এখন। সামনের হপ্তায় পরীক্ষা দিতে হবে, পাস করলে মাইনে বাড়বে কিছু।

বললাম, তা হলেই বা! পরীক্ষা তো আজ নয়!

—বাঃ রে! সব তো ভুলে গেছি, ঝালিয়ে নিতে হবে না একটু!

অনুরোধ করলাম, বললাম, টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তবু শুনল না নীলিমা। বললে, আহা, শুধু টাকার জন্যেই নাকি! ইস্কুলের

সব টিচার দিচ্ছে, সবাই পাস করবে আর আমি যদি ফেল করি? প্রেস্টিজ বলে তো একটা কথা আছে!

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। টাকা, প্রেস্টিজ, ইস্কুল, ট্যুইশনি, পরীক্ষার খাতা! সারা শরীর রি-রি করে উঠল। না, প্রয়োজন নেই নীলিমায়। দেখি, রাস্তায় ঘাটে পার্কে কোথাও কোন চেনা লোক পাওয়া যায় কিনা! তাকে নিয়েই সিনেমা দেখে আসব।

ভাগ্যক্রমে দেখাও হয়ে গেল। হাতে ছাতা, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, পিঠটা কুঁজো হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা চিনতে পারি নি।

সামনাসামনি হতেই থমকে দাঁড়ালাম: শান্তনু না?

শান্তনু হাসল: কি খবর? বিয়ে-টিয়ে করেছিস?

বললাম, করেছি। নীলিমাকে। তুই তো দেখেছিস তাকে! কিন্তু তাকে বিয়ে করেই এই দুর্দশা, একা একা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। চল্ তুইও।

খুশীই হল শান্তনু। বেশ বুঝলাম, অর্থাভাবে বেচারা সিনেমা দেখতে পায় নি বহুদিন।

সিনেমা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে শুধু বলে, বাঃ! বেশ ছবিটা! বউকে নিয়ে এলে হত। একা একা দেখলাম, শুনে এত চটবে!

সিনেমা থেকে ফিবতে ফিরতে শান্তনু হঠাৎ বললে, চল্, একটু চা খেয়ে যাবি আমার বাসায়।

বললাম, চল্। তোর বউয়ের সঙ্গেও আলাপ হবে।

শান্তনু ঠিক সেই আগেকার মতই বোকা-বোকা লজ্জার হাসি হাসল, সংকোচের সঙ্গে বললে, আলাপ করবি? কি আলাপ করবি, গেঁয়ো বউ তো আমার।

সেই একতলার একখানা ঘর, একফালি বারান্দা। পুরনো বাড়ি, দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে কোথাও কোথাও। আর সারা ঘরখানা জিনিসপত্রে ঠাসা। তক্তাপোশ, তোরঙ্গ, একটা মোড়া, দেওয়ালে-ঝোলানো একটা কাপড়ের টিয়াপাখি, মা কালীর একখানা বাঁধানো ছবি, তিনটে ক্যালেন্ডার। একসময় এ ঘরে দু মিনিট থাকতে হলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু কেন জানি না, বেশ ভালই লাগল।

বিছানার উপর একটা রোগা মেয়ে ঘুমচ্ছিল। আর ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে এল শান্তনু। ফিসফিস করে কি যেন বলে এল ওদিকের বারান্দায়। বুঝলাম, শান্তনুর স্ত্রী রান্না করছে।

বিছানার উপর থেকে তালপাতার পাখাটা নিয়ে গেল শান্তনু। দরজার এ-পাশ থেকে যেটুকু দেখা যায়, দেখলাম শান্তনু বসে বসে উনুনে হাওয়া করছে।

একটু পরেই একটা প্লেটে করে কিছু ফল নিয়ে এসে দাঁড়াল শান্তনুর স্ত্রী। একটু রোগা হয়েছে, কালো হয়েছে আগের চেয়ে। ঘোমটা কমেছে তার। তবে সেই লাজুক হাসিটা আছে এখনও।

বললাম, এসব কি হবে! আমি ফল খাই না—চা দিন বরং।

শান্তনুর স্ত্রী হেসে বললে, গরিবের ঘরে আম কলা ছাড়া আর কি দেব বলুন! এসেছেন যখন, খেতে হবে।

খেলাম, তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম।

শান্তনুর স্ত্রী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এল, কথা বলল, একবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে পাখা করতে করতে গায়ে হাত দিয়ে বললে, জ্বর ছেড়েছে বোধ হয়।

শান্তনু বলল, মেয়েটা বড় ভুগছে। একটা সারে তো আর একটা হয়।

শান্তনুর স্ত্রী বলল, আজ তো দক্ষিণেশ্বর যাব ভেবেছিলাম, ওর জ্বরটার জন্যেই যাওয়া হল না।

দক্ষিণেশ্বর! বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

শান্তনুর স্ত্রী হাসল। বললে, বেড়াতে। আমরা তো রবিবারে রবিবারে বেড়াতে যাই! কখনও বেলুড়, কখনও দক্ষিণেশ্বর। একটু পরে সশব্দে হেসে উঠে বলল, কিন্তু সবচেয়ে মজা হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে। বলব?

বলে কৌতুকের চোখে তাকাল সে শান্তনুর দিকে। শান্তনু হাসল, ইশারায় নিষেধ জানাল।

বললাম, আর অন্য দিনগুলো কি করিস?

শান্তনু হাসল। স্ত্রীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে হেসে বলল, উনি আসার পর থেকে কিছু করবার সময় কই? সকালে বাজার যাই, দাড়ি কামাই, আপিস যাই। আর বিকেলে দু মিনিট ফিরতে দেরি হলে ও দরজা খুলবে না। তাই ফিরে এসে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখি একটু—ও রান্না করে।

—বাস্? আর কিছু না? প্রশ্ন করলাম সবিস্ময়ে।

শান্তনু হেসে বললে, এই উনুনে পাখা-টাখা করে দিই, কয়লা ভেঙে দিই —ও বেচারী একা আর কত করবে বল্! তারপর লাজুক হাসি হেসে শান্তনু বললে, তোরা তো বেশ আছিস—অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস—

বিদায় নিয়ে চলে এলাম আর একা একা আমার নির্জন নিঃসঙ্গ বাসার পথ ধরে আসতে আসতে মনে মনে বললাম, শান্তনুকে আমি ঈর্ষা করি।

নীলিমা তখনও গুনগুন করে কি যেন মুখস্থ করছে। পরীক্ষার পড়া, প্রেস্টিজের পড়া, মাইনে বাড়ানোর পড়া।

বললাম, পড়া রাখ তোমার—শোন, আজ রসগোল্লার বাড়ি গিয়েছিলাম। অভাবের সংসার হলেও—

খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা : লেডিগিনিকে দেখলে?

—দেখলাম। এত সামান্য রোজগার, তায় একটা ছেলে একটা মেয়ে, কিন্তু—

নীলিমা হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, ওভাবে অভাব-অনটনে সংসার করার শখ যে কেন হয় ওদের!

বললে বটে, কিন্তু মনে হয়, নীলিমাও যেন লেডিগিনিকে ঈর্ষা করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে. কেন জানি না, শান্তনুর কথাটা মনে পড়ল—তোরা তো বেশ আছিস—অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস—

কথাটা যেন সমস্ত দেহমনে সান্ত্বনার প্রলেপ দিল। সান্ত্বনা এইটুকুই যে, শান্তনুও আমাদের ঈর্ষা করে।

ভাঙা কপাট

সমরেশ বসু

এক, দুই, তিন, চার—চার কাঁটা উল্টো। এক, দুই, তিন, চার—চার কাঁটা সোজা। সামনে সুতো, একটা ঘোরানো প্যাঁচ, জোড়া বোনা··এবং আবার। আবার। আবার আবর্তন সেই চার কাঁটা উল্টো, চার কাঁটা সোজা, সামনে সুতো, জোড়া ফেলায়; এবং একটা প্যাটার্ন ফুটছে। রূপ নিচ্ছে গাঢ় নীল উলে, সূচিমুখ কাঁটার খোঁচায় খোঁচায়, দুটি হাতের নিঃশব্দ মুদ্রায়, দ্রুত, প্রায় একটা অভ্যাসের বশে। দুটি হাত, প্রায় একটা আলাদা অস্তিত্বেব মতোই, যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ—আর সব কিছু বাদ দিয়ে। যেন একটা সঙ্গীতের মতো। তালে মানে লয়ে, স্বরলিপির ওপর নিখুঁত অঙ্গুলিচালনে, তরঙ্গায়িত গানের মতো একটা প্যাটার্ন ফুটছে।

হয়তো গোটা মানুষটির অস্তিত্বের মধ্যে কোথাও নিঃশব্দে টিকটিক করছে ঘড়ির মতো এক, দুই, তিন, চার—চার কাঁটা··। এবং দুটি স্বর্ণবলয়, যাকে বলা চলে, দুটি পুষ্ট নিটোল হাতকে জড়িয়ে চিকচিক করছে। প্রতি মুহূর্তে, একটা যান্ত্রিকতায়, দ্রুত, প্রায় কাঁপছে যেন আঙুলগুলি, আর ছিলে-কাটা বালা চিকচিক করছে। আর একটি ছোট হীরে বসানো আংটি কোন একটা আঙুলে ঝিলিক হেনে উঠছে থেকে থেকে। কিন্তু দুটি আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টি অন্যত্র স্থাপিত। কাজল নেই, তবু কাজল পরার মতোই কালো চোখের তারায় যেন একটা উৎকণ্ঠা। কাছাকাছি সাপ অথবা আতঙ্ক-জনক কিছু দেখে, একটা ভয়-পাওয়া উত্তেজনায়, দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ মেঝের ওপর। কিংবা ছোট টেবিলের কোণের দিকে। কিংবা তারই কাছাকাছি আর কোথাও। বোঝা যাচ্ছে না। আসলে অন্তরাবদ্ধ দৃষ্টি, এবং অন্তর যে জগতে বিচরণ করছে দৃষ্টি সেখানেই।

অথচ হাত চলছে। এক, দুই, তিন, চার—চার কাঁটা··। আসলে চলছে না। একটা অস্থিরতায় কাঁপছে পুনরাবৃত্তির আবর্তনে এবং নিয়তির মতো পূর্বনির্ধারিত একটা প্যাটার্ন ফুটছে। বরং বলা যায়, হাতের এ কম্পনও অন্তরাবদ্ধ। সেখানেই বুনন চলেছে ঝংকৃত তন্ত্রীতে। আর সেখান থেকেই তপতীর এ প্যাটার্নটা রূপ নিচ্ছে যে, ওর ঠোঁটে ঠোঁট টেপা। যেন প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে আছে। রুদ্ধশ্বাস এবং উত্তেজিত আর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ। আড়ষ্টতায় থমকানো শক্ত শরীর, শাড়ির আঁচল স্খলিত। ডিভানের

নীচে লুটানো। ব্লাউজে ক্ষীণ কটির সবটুকু ঢাকা পড়ে নি। তাই লাল শাড়ির বন্ধনী আর নীল জামার মাঝখানে রৌদ্র-ঝলকের মতো শরীরের ফর্সা অংশ দেখা যাচ্ছে। একই বিস্রস্ততা ঈষৎ নম্র আর স্বাস্থ্যোদ্ধত বুকের উচ্ছ্রিত জামার খুলে যাওয়া একটা টিপকলে। যেটা লাগাতে ওর ভুল হবার কথা নয়। অথচ তাই হয়েছে এবং স্তনান্তরের অন্ধকারে যে আলো ফুটে উঠেছে, সেটা তপতীর উদ্দীপ্ত চোখের আতঙ্কের—ওর শ্বাসরুদ্ধ আড়ষ্টতা এবং ভীরু অসহায়তারই একটা ঝলক যেন। এর সঙ্গেই ধরা পড়ছে ওর তেলহীন রুক্ষ স্নান, ভেজা চুলের গোছা এলো খোঁপায় জড়ানো। সিঁথেয় বাসী সিঁদুরের অস্পষ্টতা। এবং খাওয়া ও বিশ্রামের পুষ্ট রক্তৌষ্ঠের পরিবর্তে বিবর্ণ শুষ্কতা।

ঠিক আঙ্কিক নিয়মের মতোই তপতীর বহিরঙ্গ জুড়ে এই ভঙ্গি। অন্তহীন সুতোর সমুদ্র থেকে, উল্টো কাঁটা সোজা কাঁটা বুননের একটা নিশ্চিত পরিণতির মতো তপতীর ঝংকৃত তন্ত্রীতে একটা নিঃশব্দ বুনন চলেছে—আজ শুক্রবার, এখন বেলা দুটো বাজে।··আজ শুক্রবার, প্রায় দুটো বাজে। ··আজ··। বাজে।····

আর টেবিলের ওপর টাইমপিসটা তাল দিচ্ছে—টিক টিক টিক।··বড় কাঁটাটা বারোর ঘর ছোঁয়-ছোঁয়। বুনন আরও দ্রুত চলেছে, ভিতরের অদৃশ্য বুনন-যন্ত্রটা কাঁপছে থরথর করে। ভয়ের একটা শক্ত থাবা ওকে আরও পিষে ধরছে এবং সেই সঙ্গেই মুক্তির একটি ক্ষীণ আশা যেন মরিয়া হয়ে উঠছে। আর তাই, আরও শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে উঠছে তপতী। ঘাম দেখা দিচ্ছে বিন্দু বিন্দু। তবু একটা ক্ষীণ আশা। এবং সেই আশা ঢলে-যাওয়া বেলার রোদ হয়ে জানালায় পড়ছে। ভরসা দেবার জন্যেই যেন বাতাস-আন্দোলিত বকুল গাছের ডাল জানালায় মাথা দোলাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় শুকনো ঝরাপাতারা চৈত্র-বাতাসে খরখরিয়ে ছুটোছুটি খেলছে। আর শালিকেরা যেন ডাইনীর মতো দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব ভবিষ্যৎবাণী করে চলেছে।

তবু হাত চলছে। বুক কাঁপছে, আর, আজ শুক্রবার··দুটো বাজে·· একই নিঃশব্দ বুননের মধ্য দিয়ে আতঙ্কটা দূর হবার শেষ মুহূর্তে পরম আশায় রুদ্ধশ্বাস করে তুলছে।

আর ঠিক এই মুহূর্তেই আর্ত চীৎকারটা বেজে উঠল। ক্রিং··ক্রিং··ক্রিং·· ক্রিং··। হাত থেমে গেল তপতীর। স্তব্ধ অনড় নিশ্চল যন্ত্রের মতো একই ভঙ্গিতে বসে রইল সে। আর তীব্র চীৎকারের মতো শব্দটা টেলিফোনে বাজতে লাগল বিলম্বিত লয়ে।

আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ল তপতীর। চোখের আতঙ্ক অপসৃত। এখন মৃত্যুর শূন্যতা দুই চোখে। যেন শেষ রক্ষা হল না। তার প্রাণদণ্ডাদেশ

বেজে উঠেছে। তাই এবার আড়ষ্টতা গেল। ভয়ের শেষ-সীমার বোধ-শূন্যতায় পৌঁছুল সে। উঠে দাঁড়াল। উল, কাঁটা, বোনা পড়ে গেল মেঝেয়। আঁচল তুলল না। মেঝেয় লুটোতে লুটোতে পায়ে পায়ে গিয়ে সে দাঁড়াল ফোনের কাছে। রিসিভারটা তুলতেই টেলিফোনের তীব্র চীৎকার স্তব্ধ হল।

রিসিভার তুলে কানে নিল, কিন্তু কোনও কথা বলতে পারল না। ওপার থেকেও একই স্তব্ধতা। কোনও কথা নেই। শব্দ নেই। এবং এই নীরবতাই যেন নিঃশব্দ তারের তরঙ্গে পরস্পরের পরিচয়কে নিশ্চিত করল। তবু ঠোঁট খুলল তপতী। বলতে গেল, হ্যালো!

তার আগেই ওপার থেকে চাপা মোটা পুরুষ-গলা ভেসে এল, আমি ভবতোষ।

জানত তপতী। তবু শোনা মাত্রই তার মৃত ফ্যাকাশে মুখে রাগের রক্তচ্ছটা দেখা দিল। অপরিসীম ঘৃণা ফুটে উঠল দুই চোখে। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, জানি। আমি তোমাকে তো—

ওপারের চাপা এবং তীব্র গলা বাধা দিয়ে বলে উঠল, পাঁচটা থেকে সোয়া পাঁচটা অবধি আমি সেখানেই থাকব।

অসহ্য রাগে ও ঘৃণায় তপতীব রিসিভার-ধরা হাত কাঁপছে। চাপা উত্তে-জিত গলায় সে ছুঁড়ে দিল, আমি যাব না।

ওপারের গলা অনেক শান্ত শোনাল, সে তোমার ইচ্ছে। আমি থাকব·· সেইখানেই··সোয়া পাঁচটা অবধি।

তপতী রাগে, ভয়ে এবং ঘৃণায় প্রায় চীৎকার করে উঠতে গেল, কিন্তু তার আগেই ওপারের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। আর একটা চাপা গর্জন বাজতে লাগল গর্‌গর্‌ শব্দে। তপতী রিসিভারটা স্বস্থানে রাখল। তারপর মুখ ঢাকল দু হাতে। কান্নার থেকেও বেশী একটা যন্ত্রণা ও ঘৃণার বেগ ঠেলে উঠতে লাগল তার ভিতর থেকে। যন্ত্রণা আর ঘৃণাই তপ্ত লবণাক্ত জল হয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে লাগল। নির্দয় অভিশাপ ফুঁসতে লাগল বুকের ভিতরে।

এক পাল ডাইনীর মতো শালিকেরা তখনও দুর্বোধ্য কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে। ঝরাপাতারা খরখর শব্দে ছুটোছুটি করছে বারান্দায়। এবং শেষ পর্যন্ত এই চৈত্রের দ্বিপ্রহর প্রকৃতি নির্দয় প্রমাণিত হল। পশ্চিমের জানালায় রোদ আরও এগিয়ে এল। কিন্তু তপতীর আশা গিয়েছে। বকুলের ডাল জানালায় এখনও মাথা দোলাচ্ছে। কিন্তু ভরসা শেষ হয়েছে। যেন ওরা তপতীর ঘৃণা-ভয়-গ্লানির তালেই তান ধরেছে। আর কাছাকাছি কোন্‌ একটা বাড়ির রেডিওতে প্রায় নাচের ছন্দে গান বাজছে।

ঠিক পাঁচটা দশে সেইখানে এসে ট্যাক্‌সিটা দাঁড়াল। ট্যাক্‌সির ভিতরে

বসেই ড্রাইভারের ভাড়া দিয়ে তপতী নেমে এল। এখন স্বভাবতই সে বাইরে আসার মতো সেজে এসেছে। মর্যাদা এবং রুচি অনুযায়ী নীলাভ শাড়ি-ব্লাউজে তার রৌদ্রদীপ্ত দেহের দ্যুতিতে যেন একটি শালীনতা আর হাসি মাখানো গাম্ভীর্য। বাঁ হাতের বালা খুলে ঘড়ি বেঁধেছে। চুলও বাঁধতে হয়েছে এবং চোখে ও ঠোঁটে ও মুখে একটি প্রায় অব্যক্ত প্রসাধনের ঈষৎ স্পর্শও স্বভাবতই ছোঁয়ানো। এবং হাতে ছোট একটি ব্যাগ। যদিও স্ফুরিত নাসারন্ধ্রের পাশে, ঠোঁটের কোণে রাগ এবং বিতৃষ্ণা একেবারে চেপে রাখতে পারে নি।

গাড়ি থেকে নেমে সে চোখ তোলবার আগেই মস্‌মস্‌ শব্দে কাবুলী চপ্পল এগিয়ে এল। তপতী চোখ তুলল, আর নিঃশব্দ ঘৃণার দ্যুতি ঝিলিক হানল তার চোখে। ভবতোষ। প্রথমেই মনে হল, বড় বড় চোখে মানুষকে কোনও কোনও সময় কি বীভৎস দেখায়! আর বড় বড় চোখের, আপাত-শান্ত চোখের ওই দৃষ্টিকে লাম্পট্য বলে, না লালসা—তপতী জানে না। এবং চওড়া বুকে পাঞ্জাবির সব বোতাম লাগানো নেই। চুল অবিন্যস্ত। সর্বাঙ্গে একটা ক্লান্তি ও বিস্রস্ততা। হঠাৎ দেখলে কেউ লোকটাকে বিষণ্ণ এবং ভাবুক মনে করতে পারে। কারণ, গোঁফদাড়িও কামানো নেই। কিন্তু এ লোকটার, এই ভবতোষের প্রতিটি রন্ধ্র তপতী জানে। জানে বলেই ভবতোষের ঠোঁটের কোণে প্রতি-হিংসাপরায়ণ নোংরা হাসিটা সে ঠিক দেখতে পায়। ওর এই শক্ত স্বাস্থ্যবান শরীরের প্রতিটি রেখায় ক্লেদাক্ত থাবাগুলি তপতী চিনতে পারে। ওর চওড়া কপালের বুদ্ধির দীপ্তিতে হীন ষড়যন্ত্রের প্রতিটি রেখা আবিষ্কার করতে পারে সে।

ভবতোষ বলল, এস।

তপতীর কানের মধ্যে যেন গরম শিকের খোঁচা লাগল। তবু যেতে হবে। এবং এটা রাস্তা। যদিও মধ্য কলকাতার এই অল্পপরিসর রাস্তাটা তেমন জনবহুল নয়। দোকান প্রায় নেই। অধিকাংশই বিদেশী চালচলনের হোটেল। কিন্তু পানশালা এবং নাচঘর যুক্ত নয়। নানান দেশের অস্থায়ী বাসিন্দাদের বাসস্থান। তাই অনেকটা নিরালা। কেউ কাউকে প্রায় চেনে না। পরস্পরের সম্পর্কে কৌতূহল কম।

ভবতোষের পিছনে পিছনে তপতী ঢুকল। দরোয়ান সেলাম করল। তপতীর টেপা ঠোঁট ক্রমেই শক্ত হচ্ছে আরও। উঠোন পেরিয়ে নীচের তলার বারান্দার শেষাংশে দোতলার সিঁড়ি। আবার দোতলার বারান্দা। বারান্দার মোড় ফেরা। একজন বেয়ারা এগিয়ে এসে পর্দা তুলে ধরল একটি ঘরের। সেই ঘর, সেই একই। তপতীর চেনা। ডিভান, সোফা, ড্রেসিং টেবিল, দরজা, বন্ধ বাথরুম, আর বয়-এর সেই একই প্রশ্ন, আভি চা?

ভবতোষের সেই একই প্রশ্ন তপতীকে, এখন চা দেবে?

তপতীরও সেই একই জবাব, আমি চা খাব না।

এবং ভবতোষের সেই স্বরহীন গলা, এখন চা চাই না।

তারপরেও বয়-এর সেই নিয়মানুগ প্রশ্নেরই পুনরুক্তি, ডিনার কেয় বাজে?

ভবতোষের একই জবাব, সাতটায়।

পরমুহূর্তেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বয়-এর বিদায়। ভবতোষের সেই একই ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে ল্যাচ্ আটকে দেওয়া। ক্যাচ্। সেই এক যেন কুৎসিত ইঙ্গিতময় শব্দ। তারপর সেই স্তব্ধতা।

সেই একই রাগে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় তপতীর বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল। দপদপ করতে লাগল। বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল থরথর করে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। এবং ভবতোষের সেই একই ভঙ্গি ও সুরে শোনা গেল, ব'সো।

তপতী তেমনি স্থির শক্ত। এও পুনরাবৃত্তি। আর পুনরাবৃত্তির পথ ধরেই ভবতোষ তপতীর হাত ধরে বলল, এস, বসবে এস।

তপতী সজোরে ঝট্‌কা দিয়ে বলল, থাক, গায়ে হাত দিও না!

বিদ্বেষে ও রাগে আরক্ত কঠিন হয়ে উঠল তপতীর মুখ।

ভবতোষের হাসিহীন গাম্ভীর্য থমথমে হয়ে উঠল। বলল, যেদিন আস, সেদিনই এ কথা বল!

—তুমিও এ কথাই বল!

—এবং তবু তোমাকে বসতে হয়!

—কারণ, তোমার মতো একটা নোংরা লোকের সঙ্গে আমি পেরে উঠি না বলে। তোমার ইতরামির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি না বলে।

তপতীর রুদ্ধ উত্তেজিত গলা কেঁপে উঠল প্রায় এবং ভিতরে একটা হিংস্র খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল তার। দেখল, গালাগালের অপমানে ভবতোষের চোখেও রুদ্ধ বহ্নির রক্তচ্ছটা ফুটে উঠেছে।

কিন্তু ভবতোষ তেমনি চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা গলায় বলল, পার না, তবু পাল্লা দাও! কেন দাও?

—দিতে হয়! কারণ, আমি মানুষ আর··একটা পশুকে নিরস্ত করতে দিতে হয়!

ভবতোষের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চোখ রক্তবর্ণ। কিন্তু গলার স্বর তার আরও খাদে নেমে গেল। বলল, তবু নিরস্ত করতে পার না! পারবে না কোনদিন। কারণ—

ভবতোষ হাত ধরল তপতীর। তপতী আবার ঝট্‌কা দিয়ে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু এবার পারল না। ভবতোষ বলল, কারণ, আমি পশু।

তপতী শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ল, পশু, পশুই তো!

কথা শেষ করবার আগেই ভবতোষ দুই ঠোঁট নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তপতীর ঠোঁটের ওপর। তপতীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কথা চাপা পড়ে গেল। সে দু হাতে ধাক্কা দিয়ে ভবতোষকে ঠেলে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। পারল না। ভবতোষের কঠিন আলিঙ্গনের মধ্যে অগাধ জলরাশিতে ডুবন্ত মানুষের মতো ছটফট করতে লাগল। ব্যাগ পড়ে গেল হাত থেকে। আঁচল স্খলিত। উচ্ছ্রিত দেহের ক্ষুব্ধ তরঙ্গে দেহের রৌদ্রবর্ণ দ্যুতি চলকে উঠল।

মুক্তি পাওয়া মাত্র তপতী অনেক দূরে ছিটকে গেল। আঁচল তোলা হল না। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। বুক ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠল। মুখ রক্তবর্ণ। চোখ দু খণ্ড অঙ্গার। রুদ্ধশ্বাস অস্ফুটে কেবল উচ্চারণ করতে পারল, নির্লজ্জ.... ঘৃণ্য....!

কিন্তু ভবতোষ নিশ্চুপ। পাথরের মতো নিশ্চল। যেন নিশ্বাসও পড়ছে না। কিন্তু ঢোঁক গিলল। ঠোঁট খোলা। স্থিরনিবদ্ধ চোখের দৃষ্টি প্রায় মাতালের মতো। মুখ সম্পূর্ণ যেন ভাবলেশহীন।

কয়েক মুহূর্তে দুজনে একইভাবে রইল। তারপরে ভবতোষের শরীর দুলে উঠতে দেখল তপতী। ভবতোষ অন্য দিকে ফিরল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ডিভানের কাছে। জানালার দিকে মুখ করে বসল।

তপতী এক টানে আঁচলটা তুলে নিয়ে এল। টেনে দিল বুকের ওপর। পাথরখচিত হার ঢাকা পড়ল খানিকটা। নিশ্বাস তখনও দ্রুত। ঠোঁটের রং উপেছে কিন্তু রক্ত ফেটে পড়ছে যেন। সারা মুখেই। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

অস্বাভাবিক খাদে নামা মোটা স্বর শোনা গেল আবার ভবতোষের, আমি পশু' ..বলতে বলতে তপতীর দিকে ফিরল সে। বলল, কিন্তু তুমিই করেছ!

ফুঁসে উঠল তপতী, আমি?

—নয়?

—মিথ্যুক! ফেবল্‌সের বাঘের গল্প শোনাচ্ছ? জল কেন ঘোলা...? ছল কোথাকার! প্রায় চীৎকার করে উঠল তপতী।

ভবতোষ উঠে দাঁড়াল আবার। দরজার কাছে গিয়ে ফ্যান-এর সুইচ খুলে দিল। ফুল স্পিডে পাখা ঘুরতে লাগল। বাতিটাও জ্বালিয়ে দিল ভবতোষ। তাতে সমস্ত পরিবেশটা যেন আরও নিষ্ঠুর নির্লজ্জ হয়ে উঠল।

তপতী এগিয়ে এসে একটা একক সোফা ধরে দাঁড়াল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে চোখ বুজল সে। অসহায়। আর বুকের মধ্যে একটা কষ্ট বোধ করছে!

বসতে ইচ্ছে করছে না। তবু তাকে বসতে হল। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার। টের পেল, কাছেই ডিভানের দিকে এগিয়ে আসছে ভবতোষ। এগিয়ে এসে বসল সে। তপতী মুখ তুলল। চোখাচোখি হল ভবতোষের সঙ্গে।

ভবতোষ বলল, ছলনা কি আমি একলাই করেছি!

শ্লেষে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল তপতী, না, আমিও তোমার সঙ্গে দল বেঁধেছি!

—বাঁধ নি? কর নি ছলনা?

—কার সঙ্গে?

—আমারই সঙ্গে?

মনের সে অবস্থা থাকলে তপতী হা হা করে হেসে উঠত ভবতোষের মুখের ওপরে। কিন্তু হাসি তার এল না। বলল, কাপুরুষদের দেখছি কোন কথা মুখে আটকায় না! একটু লজ্জা করছে না এ কথা বলতে?

—না। কাপুরুষও আমি নই। আমি যখন দিশেহারা হয়ে মনে মনে পথ হাতড়াচ্ছি, তখনই তুমি সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বসলে।

—বিয়ে আমি করি নি। আমাকে দেওয়া হয়েছে।

—এবং তাতে তুমি সুখীই হয়েছ!

—নিশ্চয়ই! আইবুড়ো মেয়ে হয়ে তোমার সেবাদাসীবৃত্তির থেকে তা অনেক সুন্দর, অনেক ভাল, আর সব দিক দিয়েই—

—তিনি, মানে তোমার স্বামী রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ!

—একটি শিশু দেখলেও তাই বলবে।

—আমিও তাই বলছি; এবং ধনে, রত্নে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতেও।

স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে উত্তেজিত গলায় বলল তপতী, অনেক, অনেক গুণে!

ভবতোষ সুরহীন সেই একই গলায় বলল, আমি তাই বলছি। বড় ফার্ম, বড় তার পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্তা, তার যৌবন, তার বিত্ত-বৈভব, সবই অনেক বেশী।

তপতী প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এবং তিনি লম্পট নন!

ভবতোষ নিশ্চুপ। তার চোখে আবার রক্তচ্ছটা দেখা দিল।

অন্তত আর একবার আঘাত হানতে পেরেছে ভেবে তপতীর মনের মধ্যে হিংস্র খুশি ঝিলিক হেনে উঠল।

ভবতোষ বলল, জানি, সে একজন নিটোল সুখী ভদ্রলোক, আর তুমি সুযোগ পাওয়া মাত্র ফাঁকতাল্লায় তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

—চুরি করে নয়। তিনি আমাকে অগ্নিসাক্ষী করে গ্রহণ করেছেন।

—যেহেতু, তিনি জানেন না, তুমি····তুমি····

উচ্চারণ করতে গিয়েও গলার স্বরটা যেন টিপে ধরল কেউ।

তপতীও রুদ্ধশ্বাস চুপিচুপি গলায় অসহ্য ঘৃণায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলল, হ্যাঁ, আমি····। আর সেই সুযোগ নিয়ে তুমি একটা মেয়েকে যা খুশি তাই করছ! ব্ল্যাকমেলার! ভাইপার!

বলতে বলতে তপতী দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। তার চোখে জল এসে পড়ছে। কিন্তু কঠিন পণ, এখানে এক ফোঁটা চোখের জল সে ফেলবে না।

ভবতোষ বলল, হ্যাঁ, এখন তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেলার বলতে পার। কিন্তু তুমি আমাকে ঠকিয়েছিলে।

—এমন ঘৃণ্য মিথ্যে কথা তুমিই বলতে পার! অথচ তোমাকে কত বিশ্বাস করেছিলাম, কত নির্ভর করেছিলাম····।

—আমি তার অমর্যাদা করি নি।

—আজ তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

—আজকের কথা নয়। সেই যখন মা পর্যন্ত সন্দেহ করল, আর তোমাকে নার্সিং হোম থেকে—

—থাক, থাক! ওসব কথা আমি তোমার মুখ থেকে আর শুনতে চাই নে!

ভবতোষ মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তপতীর মনের পটে সেই না শুনতে চাওয়া ইতিবৃত্ত এক বিচিত্র বর্ণলেখায় ফুটে উঠল।··দিনাজপুর থেকে ও এল কলকাতায়—আত্মীয়তার এক ক্ষীণ সূত্র ধরে। এই ভবতোষদের ভবানীপুরের বাড়িতে। তপতীর বাবা ডাক্তার। দাদা বিবাহিত এবং প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র মেয়েকে ভাল করে শিক্ষা দেবার উদার ইচ্ছে ছিল বাবার। তাই আই এ-তে যখন ও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম স্থান অধিকার কবল, বাবা স্থির করলেন, কলকাতায় পড়াবেন। খোঁজ পড়ল, কলকাতায় আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে। হোস্টেল সম্পর্কে একটা অমূলক ভয় ছিল মা-বাবা দুজনেরই। শেষ পর্যন্ত অমুকের অমুকের অমুক বলরাম লাহিড়িকে পাওয়া গেল, ভবতোষের বাবাকে। সব দিক দিয়েই ভাল লাগার মতো বাড়ি। ভবতোষের এক দিদি আর এক বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে বছরই ভবতোষ ইকনমিক্‌সে এম এ পাস করে বেরিয়েছে। ওর বাবা তখনও রিটায়ার করেন নি, বছর খানেক মেয়াদ ছিল। মা একটি বইয়ের পোকা। রান্নার দায়িত্ব ঠাকুরের ওপর। নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি বাড়ি। তা ছাড়া, তপতীকে পেয়ে ভবতোষের বাবা-মাও খুশী হয়েছিলেন। বাড়িতে একটি মেয়ে তাঁদের দরকার ছিল। একটি মেয়ে বাড়িতে ঘুরবে, বেড়াবে, পড়বে; তাঁরা স্নেহ করে কৃতার্থ হবেন।··আর এই ভবতোষ। হোটেলের এই ঘরে, এই পরিবেশে যাকে দেখে আগের সেই ছায়ার একটি রেখাও যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ভবতোষ তখন প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশি ছেলে। একটু বেশী মাত্রায়। তপতীর মনে হত, ছেলেটা ছেলেমানুষ। হাসতে পারে, হাসাতে পারে

তার থেকে বেশী। খেলাধুলোয় ঝোঁক। মনে মনে একটু জেদী। আর সেটাই ওকে মানাত। তপতীর অনার্স ছিল বাংলায়। সেজন্যে ক্ষেপিয়ে মারত ভবতোষ। বাংলা আবার কেউ পড়ে! কিন্তু বাংলা ভাষায় কি আশ্চর্য দখলই না ছিল মহা-আঙ্কিক ভবতোষের! কত ভালই না বাসত বাংলা ভাষাকে! কিন্তু ওর ভালবাসার প্রকাশটা ছিল অমনিধারা। বলত, মেয়েদের বড় বড় চোখ, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকানো দেখলেই আমার জ্বলুনি লাগে।····সেই তো প্রথম বুকের মধ্যেটা কেমন কেঁপে উঠল তপতীর। ও যে অমনি করেই বলে! তপতীর বড় চোখের নিন্দে ভবতোষ প্রথম থেকেই করেছে। তপতী নিজেও কি জানত, তার অবাক মুগ্ধ চোখ সর্বক্ষণ ভবতোষের দিকে? আর সেটা ধরা পড়েছে ভবতোষের কাছে এবং ওর বিরাগের ছোঁড়া কথায় অনুরাগটাও বড় বেশী করে ধরা পড়ল তপতীর কাছে।

বি এ পাস করা পর্যন্ত জীবনটা কাটল নানান হাসিঠাট্টার খেলায়। ময়দানের খেলা দেখা, ম্যাটিনিতে সিনেমায় যাওয়া, নানান কিছুতে। কিন্তু গোপন করার কোথাও কিছু ছিল না। ভবতোষের মা বলতেন, ভব, মেয়েটাকে তুই পাস করতে দিবি নে! ওর বাবা-মা আমাকে দুষবেন।

ভবতোষ বলত, একটু-আধটু ঘুরলে বেড়ালে যদি ফেল করতে হয়, তবে অমন পরীক্ষা দিয়ে দরকার নেই।

তবু পাস করল তপতী, এবং অনার্স নিয়েই। তারপরে দিনাজপুর থেকে ঘুরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ভবতোষ পেল চাকরি। তার সঙ্গেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়া চলল রাতে।

কিন্তু নানান হাসিঠাট্টার হালকা খেলাটা ওদের ছেড়ে গেল। একটা মধুর গাম্ভীর্য নেমে এল ওদের ঘিরে। ওরা ধরা পড়ল দুজনে। বাইরে ছেড়ে অন্দরে একান্ত হওয়াটাকে ভাল লাগল। আর এই একান্ত হওয়াটাকে লুকোতে চাইল। লুকোতে ভাল লাগল। লুকোনোর দরকার হল। নইলে ভবতোষের শ্যাম-স্নিগ্ধ পেশল উদ্ধত বুকে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায় কেমন করে! নিষ্পাপ প্রেমান্ধ ভবতোষের সেই চোখ····। আর এই সেই ভবতোষ!

তারপর ষষ্ঠ বর্ষের মাঝামাঝি সেই দিন। উঃ, সেই দিনটা! তপতীর মনে হল, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। হাত-পা কেঁপে পঙ্গু হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে। মাসের বিশেষ একটি দিন অতিক্রম করে গেল। আর তারপরে ক্যালেন্ডারের প্রত্যেকটি তারিখ যেন তাকে ছুরির ঘায়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। পড়া গেল, ঘুম গেল, কালি পড়ল চোখের কোলে। আর ছেলেটা যে ছেলেমানুষ, সেটা ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠল, যখন বিমূঢ় আতঙ্কে ভবতোষ দিশেহারা হয়ে পড়ল।

তপতী জিজ্ঞেস করল, স্বীকার করতে পারবে না?

যেন কোণঠাসা ভয়ে বলে উঠল ভবতোষ, না, পারব না তপতী।

সেই দুরবস্থার মধ্যেও ভবতোষের ভয় দেখে ওর জন্যে কষ্ট হল তপতীর। ভয়টা যে আসলে আজন্ম সংস্কারের, লজ্জার, সেটা বুঝল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। এবং ভবতোষ যে নিষ্পাপ এবং এরকম একটা ঘটনায় একেবারে হক-চকিয়ে গিয়েছে, সেটা তপতী ঠিকই বুঝল। তবু তপতীর বুকের মধ্যে একটি অসহ্য যন্ত্রণার কাঁটা আমূল বিঁধল। মেয়ে-প্রাণের একটা স্বাভাবিক ধিক্কার নিঃশব্দে হানল ভবতোষকে।

কিন্তু উপায় নেই। ভবতোষের দেওয়া যে অভিশাপ তখন তপতীর রক্তকোষে দ্বিতীয় প্রাণের সঞ্চার কবেছে, তাকে বিদায় করার দায়িত্ব ভবতোষকেই নিতে হল। ব্যবস্থা হল কয়েকদিনের মধ্যেই। কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যাবার নাম করে নার্সিং হোম। কয়েক ঘণ্টার অজ্ঞান অবস্থা এবং জ্ঞান হওয়ার পর ভবতোষের বুকে পড়ে অনেক কান্না কাঁদল তপতী। সেটা বোধ হয় অচৈতন্য করার অ্যানেসথেসিয়ারই ক্রিয়া। তপতী কাঁদল, ধিক্কার দিল, তবু বারে বারে আঁকড়ে ধরল ভবতোষকে।

তারপর চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল তপতীর। স্তব্ধ, শান্ত, গম্ভীর। কিন্তু আশ্চর্য! ভবতোষের সেই একই আবেগমন্থিত দৃষ্টি! ওর চোখের প্রেম এবং কামনার প্রদীপ তেমনি দীপ্ত। কেন? জীবনটাকে কি এই নিয়মেই পুনরাবৃত্তির আবর্ত বলে ভাবল নাকি ও? তপতী গুটিয়ে নিল নিজেকে আরও। যতই গুটিয়ে নিল, ভবতোষের মধ্যে একটা অপরাধবোধ ছায়া ফেলল তত। কিন্তু ওর চোখে, ওর স্পর্শের মধ্যে সেই তৃষ্ণা তেমনি জাগ্রত। ও হাসাতে চাইল তপতীকে। কিন্তু তপতী হাসল না।

তিন দিন পরে নার্সিং হোম থেকে একটা হোটেলে দুজনে আত্মগোপন করল। সাত দিন বাদে ফিরে গেল বাড়িতে। তপতী সুস্থ, কিন্তু আগের সেই মেয়েটা যেন নেই আর। রং ফ্যাকাশে, চেহারায় কেমন রুগ্নতা। ভবতোষের মা সন্দিগ্ধ ভয়ে নানান কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তপতীর পড়ার দিকে ঝোঁক দেখে চুপ করে রইলেন। তবু সন্দেহের ছায়া গেল না। কারণ, তপতীর পড়ার ঘরের বন্ধ দরজা আর ভবতোষের জন্যেও খোলে না। ভবতোষের অপরাধ ভাবটা ঢাকা পড়ল না। কেমন যেন পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

পরীক্ষা দিয়েই দিনাজপুরে পালাল তপতী। সেখানে গিয়ে শুনল, তার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির। আর সেটা কলকাতাতেই। পাত্র কেশব রায়, চীফ পাবলিসিটি অফিসার। পৈতৃক বাড়ি। নিজের গাড়ি, কলকাতার আদি বাসিন্দা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। এক ছেলে, বয়স বত্রিশ, আর বিধবা মা আছেন সংসারে।

অতএব, আবার সদলে বাবা-মার সঙ্গে কলকাতা। এবং ভবতোষদের বাড়িতেই। পরীক্ষায়ও পাস করল তপতী। সব ঠিক, কোথাও কোনও গোল-মাল নেই। তবু তপতীর ভিতরটা কেমন থমকে রইল। ভবতোষকে সে যত এড়িয়ে যেতে লাগল, ওর অপরাধী আবেগমন্থিত চোখ ততই তপতীকে বেষ্টন করতে লাগল। যত বেষ্টন, ততই তপতীর ছিন্ন করার চেষ্টা। আর এই ছেঁড়াছিঁড়ি তার বুকের মধ্যে অনুক্ষণ রক্ত ঝরাতে লাগল। সে জপ করতে লাগল, না, না, না····।

ইতিমধ্যে কেশব তপতীকে দেখে গেল। পছন্দ হল। বিয়ের কেনাকাটা শুরু হল পূর্ণোদ্যমে। নতুন বাসা পছন্দ করে বাড়ি-বদলের পালা এল ঘনিয়ে। বিয়েটা অন্য বাড়ি থেকে হওয়াই সাব্যস্ত হল। কারণ, তপতীর দাদা-বউদি শুধু নয়, আরও অনেক আত্মীয়স্বজন আসবে।

কিন্তু তার আর ভবতোষের মাঝখানে লুকোচুরি খেলাটা যেন ধরা পড়ব পড়ব হয়ে উঠল। রুদ্ধশ্বাস, প্রাণান্তকর হয়ে উঠল। এই লুকোচুরি খেলা যিনি কিছুটা আঁচ করতে পারলেন, তিনি ভবতোষের মা। কতখানি আঁচ করেছেন, কত দূর, তপতী আজও জানে না। দিনাজপুর থেকে ফিরে আসার পর বললেন, যাক, বাঁচিয়েছিস তপতী! পরীক্ষার আগে যা ছিরি হয়েছিল, দেখে ভয়ে বাঁচি নে। দু মাসেই দেখছি রূপ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিস। আমরা, মেয়েমানুষেরা, ঠিক জলের মধ্যে বলের মতো। সংসারের নানান বিপদে-আপদে যতই ডুবি, আবার ভেসে উঠি ঠিক।

কথাটা আজও রহস্যময় মনে হয়। কেন বলেছিলেন এ কথা? ভাল-মন্দ যেমন খুশি মানে করা যায়। আর একদিন বললেন, তোর আর ভবর কি হল রে তপতী! আজ বাদে কাল তোর বিয়ে—ঝগড়া হয়ে থাকলে এই বেলা ভাব করে নে!

কিন্তু ভাব করবে বলে নয়, আচমকাই নিরালা ছাদের অন্ধকারে ধরা পড়তে হল ভবতোষের কাছে। বহুদিন পরে এই পরিবেশে দুজন। অথচ যেন একেবারে নতুন দেখা হওয়ার মতো। কিন্তু ভবতোষ ঠিক আগের মতোই তপতীর হাত টেনে ধরল। আর সেই স্বচ্ছন্দ দাবির ভাবটাই যেন কেমন আড়ষ্ট করে তুলল তপতীকে। সে বলল, কি?

ভবতোষ প্রথমেই উচ্চারণ করল, বিয়ে ক'রো না তপু!

তপতী যেন অবাক হয়ে জবাব দিতে গিয়ে বোবা হয়ে গেল। অন্ধকারেও ভবতোষের বিভ্রান্ত ব্যাকুল দুই চোখ সে দেখল। সেই চোখও এই ভবতোষের। এই হোটেলের ঘরের ওই অপরিচিত হীন ব্যক্তিটির, ক্রূর সাপের মতো যার চোখ তপতীর ওপর স্থিরনিবদ্ধ।

ছাদের অন্ধকারে তখন কি মনে হল তপতীর, সে জানে না। তার

চোখে জল এসে পড়ল। আর ভবতোষ তাকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল। এবং তপতী যেন দারুণ ত্রাসে বারবার বলে উঠল, না, না, না, ভবতোষ, পায়ে পড়ি, এরকম ক'রো না!

কিন্তু ভবতোষ শুনল না। আর তপতীর মনে হল, সেই নার্সিং হোমের মতোই একটা প্রচণ্ড কান্নার বেগ তার ফেটে পড়তে চাইছে। মনে হল, ভবতোষের বুকে পড়ে দাপিয়ে চীৎকার করে সে কাঁদবে। ভবতোষকে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করবে, এবং তারপরে ও চিরদিন ওর বুকে পড়ে থাকবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তুহিন-ঠাণ্ডা সরীসৃপের মতো একটা ভয়ার্ত, ব্যথিত এবং হতাশার অনুভূতি তাকে গ্রাস করল। কেন, তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না সে। শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে উঠল শরীর। ভবতোষ বারেবারে বলল, তুমি বিয়ে ক'রো না তপতী!

তবু কোনও প্রশ্ন করতে পারল না সে। নিজেকেই অচেনা এবং রহস্যাবৃত মনে হল। বলল, আমায় যেতে দাও ভবতোষ!

ভবতোষ বলল, কিন্তু আমার কথার জবাব দিলে না?

—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

—ভাববার কি আছে তপতী? তার সময়ই বা কোথায়?

—আছে সময়। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

পালিয়ে এল তপতী। কিন্তু ভাবতে কিছুই পারল না। নিয়তি-নির্ধারিত একটা স্রোতের মধ্য দিয়ে, একটি আচ্ছন্ন, অচৈতন্য বেগের ভিতর দিয়ে কেশবের সংসারে গিয়ে সে উঠল। একটি নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি, স্তব্ধ, শান্ত সংসার। অবাধ কিন্তু বেগহীন গড়িয়ে চলা সংসার। বিবাহ এবং বিবাহজনিত যা কিছু, সবই একটা প্রশ্নহীন মসৃণতার ভিতর দিয়ে বয়ে চলল। তপতীর মনে হল, যেন সে অনেকদিন বিবাহিতা। এবং আবিষ্কার করল, সে অত্যন্ত নিদ্রাকাতর মেয়ে। এত ঘুম তার আজন্মকাল থেকে কোথায় ছিল? এবং আরও আবিষ্কার করল, তার ব্যক্তিত্ব বলেও কিছু নেই। কেশব যা বলে, তাই। যা করতে বলে, তাই। আর ভবতোষের কথা তার মনেই পড়ে না যেন। একা হলেই সে ঘুমোয়। বই পড়া? আঃ, কি আলিস্যি যে লাগে!

এরকম কতদিন যেত, বলা যায় না। একদিন, প্রায় দু বছর আগে একদিন দুপুরবেলা ঝি এসে তার দিবানিদ্রা ভাঙাল। বলল, জরুরী ফোন, একজন ভদ্রলোক ডেকে দিতে বললেন।

একজন ভদ্রলোক? সে আবার কে? আঃ, কি বিরক্তি! তাকে আবার কে ডাকে?

কিন্তু তার এই চকিত নিদ্রাভঙ্গ যে এক চিরদুঃস্বপ্নের মধ্যে চিরদিন

জেগে থাকবার জন্যে, তা জানত না। সে রিসিভার ধরে জিজ্ঞেস করল, কে?

—আমি ভবতোষ।

এক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না তপতী। পরমুহূর্তেই বলল, হ্যাঁ, ও! কি ব্যাপার?

—এমন কিছু না! কেমন আছ?

—ভালই।

—হুঁ!

একটু নীরবতা। তপতী বলল, মাসীমা-মেসোমশাই ভাল আছেন তো?

—আছেন। হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম! ভবতোষের গলা যেন কেমন বিকৃত মোটা শোনাল।

তপতী বলল, কি?

—কেশববাবু, মানে তোমার স্বামী, উনি তো প্রতি শুক্রবারেই ক্লাবে যান, রাত দশটার আগে ফেরেন না!

—হ্যাঁ। কেন?

—তাই বলছিলাম, '—' রাস্তায় '—' হোটেলের সামনে পাঁচটা থেকে সোয়া পাঁচটা অবধি আমি অপেক্ষা করব। তুমি এস।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি। রাস্তা, জায়গা এবং সময়টা মনে রেখো। কেশব বাড়ি আসবার আগেই তুমি বাড়ি পেঁাছুতে পারবে।

কি বিশ্রী শোনাল ভবতোষের গলা! যেন হুকুম করছে।

সে রুষ্ট গলায় বলে উঠল, কিন্তু আমি তো যেতে পারব না!

—রাগ করে বলছ নাকি?

—তা, তুমি যেভাবে বলছ, সেটা খুব শোভনীয় বলে মনে হচ্ছে না।

—আমি জানি, শোভনতা তোমারই একচেটিয়া। কিন্তু না আসাটা সব দিক থেকেই আরও ভীষণ অশোভনতা হবে, এটা মনে রেখে তুমি এস।

সেই মুহূর্তে মনে হল, গলিত আগুন কেউ কানে ঢেলে দিল তপতীর। এবং মর্মমূল পর্যন্ত পুড়িয়ে তাকে যেন শবে পরিণত করল। সে কোনরকমে উচ্চারণ করল, মানে?

—মানে, নার্সিং হোমের একটা পুরনো কেস তা হলে কেশব রায়কে জানাতে হয়।

কোনরকমে টেবিলটা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাল তপতী। ওপারের কঠিন কুশ্রী গলার নির্দেশ আবার শোনা গেল, আমি অপেক্ষা করব, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এস।....বলেই ছেড়ে দিল।

তারপর থেকে এই ভয়ংকর অভিশাপের শুরু।

সহসা গায়ে স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠল তপতী। দেখল, ভবতোষ কখন এসে তার সোফার কাছে জানু পেতে বসে তার কোলের ওপর হাত তুলে দিয়েছে। আর সেই চোখ! বিবেকহীন, ভাবলেশহীন, রক্তাভ স্থির চোখ! প্রথম প্রথম সন্দেহ হত, মদ খেয়েছে ভবতোষ। কিন্তু দেখা গেল, বিনা মদেই এই নির্দয় উন্মত্ততা।

তপতী শক্ত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াতে চাইল সে।—কি? কি চাও তুমি আমার কাছে?

ভবতোষ মাতালের মতো গলায় বলল, এ কথার জবাব অনেক দিয়েছি। বৃথা তর্ক তুমি করতে চাও, এলেই কর। নতুন করে তুমি ভাবতে চাও। ভাববার আর কিছু নেই তোমার।

তবু তপতী জোর করে ভবতোষের হাত সরিয়ে দিতে চাইল। যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে চাইল। বিকৃত মুখ লাল হযে উঠল তার।

ভবতোষ বলল, জোর ক'রো না' বলতে বলতে তপতীকে টেনে নিল সে নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে।

স্খলিত, বিস্রস্ত তপতী যেন ব্যাধের কঠিন ফাঁদের বন্ধনে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

ভবতোষ শ্বাসরুদ্ধ মোটা গলায় বলল, আমি তো তোমার অচেনা নই! তবে? আমিই তো তোমার আদি, অবশ্য তোমার কথানুযায়ীই! তারপরেও তো আর একটা লোকের সঙ্গে রাতারাতি শুতে পেরেছিলে! স্পর্শে তোমার এত ছটফটানি কেন?

এবং পরমুহূর্তেই, তপতী কিছু বলবার আগেই, সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত তপতীকে তুলে নিয়ে ডিভানের গদির ওপর এনে ফেলল ভবতোষ। নিষ্পিষ্ট করল পাশবিক উন্মাদ শক্তিতে।

মুক্তি পেয়েই তপতী চীৎকার করে উঠল, পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও।

ভবতোষ বলল, চীৎকার ক'রো না! জানাজানি করতে চাও, আমার আপত্তি নেই। আমি রাজী। কিন্তু—

তপতী সহসা মুখে আঁচল চেপে কেঁদে উঠল। ফুলে ফুলে উঠল। বলল, উঃ ভগবান! আর কতদিন, ক-ত-দি-ন এসব আমাকে সইতে হবে!

ভবতোষ বলল, ততদিন, যতদিন আমি জীবিত থাকব। একেই বোধ হয় রাহুর প্রেম বলে। তপতী, এই তোমার নিয়তি!

গলায় উত্তেজনা এল ভবতোষের, খাদে নেমে গেল। বলল, আর, তোমার চোখের জল দেখলে আমার আর একটুও করুণা হয় না।

—তোমার করুণা! আঁচল দিয়ে জোরে জোরে চোখ ঘষে তীব্র গলায় বলল তপতী, ঘৃণা করি তোমার করুণা! ঘৃণা করি! তোমার করুণা পাব বলে আমি কাঁদি নি।

ভবতোষ বলল, সেটাই যা সান্ত্বনা আমার। কারণ, করুণা আমি কোনদিন করতে পারব না তোমাকে। এই আমার এক এবং অদ্বিতীয়। আর সব আমি বিসর্জন দিয়েছি। শিক্ষা, সম্মান, রুচি, ভদ্রতা····

তপতীও যেন সহসা শান্ত হয়ে গেল। একদৃষ্টে জানালার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আর তারই সঙ্গে আমাকে শেষ রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছ। আবার গলা কেঁপে উঠল তার।

ভবতোষ বলল, হ্যাঁ, যে-কোনও একটা শেষ রাস্তা। হয় আত্মহত্যা, নয় কেশবকে স্বীকারোক্তি। কিংবা দুই-ই। স্বীকারোক্তি এবং আত্মহত্যা। কিন্তু তপতী, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আর 'আমি সেইদিন হব শান্ত।'

তপতী প্রায় চুপিচুপি গলায় বলে উঠল, জানি, জানি, জানি! আমি যে ঠিক জানি, কি ভয়ঙ্কর পশুর থাবায় আমি পড়েছি! কিন্তু জেনে রেখো—

কথা শেষ হতে পেল না। তপতীর কথার ওপরে ঠোঁট চেপে দিল ভবতোষ। আর ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে উঠল। তপতীর মনে হল. মুক্তির ঘণ্টা বেজে উঠল তার।

ভবতোষ ছেড়ে দিল তপতীকে। উঠে গিয়ে দরজা সামান্য খুলে মুখ বাড়িয়ে বয়-কে বলল, ডিনার সার্ভ কর একজনের জন্যে। তার আগে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। বলে দরজা বন্ধ করল আবার।

তপতী ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে বেশবাস ঠিক করতে লাগল। পড়ে-যাওয়া ব্যাগ খুঁজে নিয়ে চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়াল তাড়াতাড়ি। উত্তেজনায় যদিও তার চোখে-মুখে রক্তাভা, চোখ অঙ্গার, চোখের পাতা ভেজা, তবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিল সে। দেখল, ভবতোষ এখন মুখ ফিরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তপতী জানে, অনুশোচনা কিংবা ব্যথার স্তব্ধতা এটা নয় ভবতোষের। এই ওর সাম্প্রতিক চরিত্র—নেশাখোর ভল্লুকের মতো স্থির এবং নিশ্চল হয়ে থাকবে এখন। ট্যাক্সি আসবে। নিঃশব্দে তুলে দিয়ে আসবে তপতীকে। কিন্তু কোনও বিদায়-সম্ভাষণ জানাবে না। শুধু গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গাড়িটা মোড় ফিরবে, ততক্ষণ দুটো চোখের খোঁচা বিঁধতে থাকবে তপতীর।

কলিং বেল বাজল আবার। দরজা খুলল ভবতোষ। বয় বলল, গাড়ি হাজির।

তারপরে আবার শুক্রবার। আবার শুক্রবার, বেলা দুটো। হয় বোনা, নয় সেলাই, শুধু শুক্রবার দুপুরে। শুধু শুক্রবার দুপুরে একটা অসহ্য উত্তেজনা চারদিক থেকে বৃহৎ সরীসৃপের মতো পাক খেতে খেতে ঘিরে আসতে থাকে। যত আসতে থাকে, ততই বোনা কিংবা সেলাই। উল্টো কাঁটা, সোজা কাঁটা, কিংবা ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুঁচের ফোঁড়। একটা যান্ত্রিক উত্তেজনায় দ্রুত, কম্পিত হাত। আর কোনও এক সুগভীর অভ্যন্তরে বাজতে থাকে—আজ শুক্রবার। বেলা দুটো বাজে। আজ শুক্রবার······।

শুক্রবার, আবার শুক্রবার। আবার····

এক স্বপ্নাচ্ছন্ন বিস্ময়ে তপতী দেখল, আকাশ জুড়ে মেঘ। কোন্ দূর আকাশে বাজছে মেঘের শান্ত গুরুগুরু ডাক। মৃদু মৃদু বাতাস উঠেছে বাইরে। গাছেরা মাথা দুলিয়ে ডাক দিল মেঘকে। পাখিরা আহ্বান করল সঙ্গীদের, ঘরে চল। পাতার আড়াল থেকে গন্ধরাজ গন্ধ দিল ছড়িয়ে।

কিন্তু বেলা চারটে! বেলা চারটে, অথচ আজ শুক্রবার। কি করবে? কি করবে এখন তপতী? পরমুহূর্তেই একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুকের মধ্যে। সে ঘুমিয়ে পড়ে নি তো! শুক্রবার দুপুরের সেই কুৎসিত শব্দ হয়তো বেজেছিল। তপতী শুনতে পায় নি। কিন্তু ঘুম কোথায়? সে যে একইভাবে বসে ছিল! আড়ষ্ট, শক্ত, উৎকর্ণ হয়ে—একভাবে! তবে? তবে কি শেষ পন্থা নিল ভবতোষ? কেশবকে··কেশবকে·· না, তা হতে পারে না! মন বলছে, তা হতে পারে না! এটুকুও কি সে চিনতে পারে নি ভবতোষকে? তা হলে আগেই জানাত। কিন্তু যতক্ষণ তপতী বিদ্রোহ না করবে, যতক্ষণ ভবতোষ তার পাওনা পাবে, ততক্ষণ কিছুই করবে না।

তবে? তবে কি অসুখ করল? আঃ! হে ব্যাধির দেবতা, করুণা কর! চিরজীবন ধরে ভবতোষকে রোগশয্যায় ফেলে রাখ! হে রোগের দেবতা, ওকে পঙ্গু করে রাখ চিরদিন ধরে!····

তপতী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল টেলিফোনের ওপর। ডায়াল ঘোরাল। ডাকল, হ্যালো!

ওপার থেকে কেশবের বিস্মিত জবাব এল, হ্যালো, কে? তপু?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

শঙ্কিত গলা কেশবের। এমন অসময়ে তপতীর ফোন, তাও শুক্রবারে কখনও পায় না সে!

তপতী বলল অভিমান-স্ফুরিত গলায়, কি আবার! দেখছি তোমার কান্ডকারখানা। প্রতি শুক্রবারে খালি ক্লাব। আজ তা হবে না।

আশ্বস্ত হল কেশব। খুশী হয়ে উঠল সুখী স্বামীটি। কৌতুকানন্দে বলল, তবে কি করতে হবে?

—আজ বাড়ি আসতে হবে।

—কেন ?

—লক্ষ্মীটি, এস! দুজনে সিনেমায় যাব। কিংবা অন্য কোথাও। আমার একদম ভাল লাগছে না! শেষ দিকে সোহাগে প্রায় গলার স্বর কেঁপে উঠল তপতীর।

কেশব বলল, তথাস্তু। কিন্তু বৃষ্টি আসছে যে!

তপতী বলল, মাথায় করে যাব।

কেশব হাসতে হাসতে বলল, নতুন রূপ দেখব তবে আজ বল! বেশ, যাচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে গুনগুন করে উঠল তপতী, ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে। গুনগুন করতে লাগল। হাসতে লাগল নিঃশব্দে। আঃ! একেই কি মুক্তি বলে! আঃ! তবু কি যন্ত্রণা! ভয়ের একটা চমক থেকে থেকে যেন মনের কোথায় ঝাপটা মারছে। পরমুহূর্তেই আবার হাসি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে মুখে।....আর ঠিক সোয়া পাঁচটাতে এসে উপস্থিত হল কেশব।

তারপরে আবার শুক্রবার, এবং বেলা দুটো। কিন্তু সেই আর্ত চীৎকার বাজল না। আঃ! ভগবান! তুমি যে আছ, এমন করে কোনদিন জানি নি। চারটে বেজে গেল। পাঁচটা বেজে গেল। আঃ! জীবন কি অবাধ! স্বাধীন! আর, স্বাধীনতা কি সুন্দর! কি করবে এবার তপতী? আজও কি ডাকবে কেশবকে? না, থাক। ও কাজের লোক, একজন দায়িত্বশীল মানুষ। কি দরকার ও বেচারীকে হয়রান করে! আজ আমি একলাই হাসব, গাইব, বেড়াব। আমার যা খুশি তাই করব। ঝিটাকে একটা নতুন শাড়ি দেব। চাকরটাকে একটা ভাল জামা কিনে দেব। মাকে (শ্বাশুড়ীকে) নিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরুলে কেমন হয়! না-হয় একটু কালীঘাটেই মন্দিরে যাই! কিংবা দক্ষিণেশ্বরে! হেসে ফেলল তপতী। আঃ! সত্যি! পরমুহূর্তেই আবার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কিন্তু....আচ্ছা, ওর কি হল? কোনও অ্যাক্সিডেণ্ট করল নাকি? মরে গেছে?....আঃ! হে মৃত্যুর দেবতা, যেন তাই হয়! এমন চিরনিষ্কণ্টক কি তুমি আমাকে করবে?

একটা শুক্রবার, দুটো শুক্রবার, তারপরে তিন, চার, পাঁচ····। কিন্তু ঘুম আসছে না কেন? সেই অঘোর অচৈতন্য দিবানিদ্রা! শুতে পারছে না কেন তপতী? বসতে পারছে না কেন? কি করবে সে? সে কি করবে? এই শুক্রবারে, এই অশেষ বেলায়, আর সারা সপ্তাহে কি করবে সে? কেশবকে ডাকবে? কিন্তু ইচ্ছে করছে না যে! কোথাও বেরুবে? কোথায়? কোথায় যাবে তপতী? এত শূন্যতা কিসের? এত খাঁ খাঁ কিসের? বুক থেকে উৎসারিত তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়া এই যন্ত্রণাটা কিসের? মুক্তির মধ্যে আবার এ কিসের যন্ত্রণা?

তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে রিসিভারটার ওপর। আর ফিসফিস করে, এ কি! এটা কি ঘটছে! আমার মনে, আমার শরীরে, আমার রক্তে, আমার ঠোঁটে, বুকে, আমার এই দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ডানায় ডানায়! আর····আর···· কিসের একটা ছায়া, ভয়ংকর, সর্বাপেক্ষা নির্মম, আরও নিদারুণ ভয়ের মতো! কোথায় গেল আমার সেই ঘুম! আমার নিষ্কণ্টক প্রাণে, আমার সেই শান্তি ফিরে পাওয়া চোখে, অঘোর অতল ঘুম কেন আসছে না? এই ছায়াটা কিসের? যাকে আমি বাইরে থেকে আসতে দেখলাম না, আমারই ভিতর থেকে বেরিয়ে আমাকেই তার বেষ্টনে পিষ্ট করতে আসছে?

ষষ্ঠ শুক্রবারের আগেই সেই ভয়ঙ্কর পরোয়ানা এল। পিয়ন তুলে দিল হাতে। ঠিকানা সুদূর বম্বের। শুরু হয়েছে:

"তপতী, ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছ, দূরে চলে এসেছি। বদলি নিয়ে চলে এসেছি। ভেবেছিলাম, পত্র দেব না। কিন্তু কোনও কাজে মন দিতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, তুমি ভয়ে ভয়ে রয়েছ। সংশয়ে রয়েছ। তোমার সংশয়ের নিরসন দরকার। আর তাই জানাই, তপু, পারলাম না!···· সবই তো বিসর্জন দিয়েছিলাম! লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শিক্ষা, সম্মান, রুচি! সবই বিসর্জন দিয়েছিলাম! কিন্তু কই, পারলাম না তো! পেলাম না তো! আজ তাই, তপু, তোমার কঠিন পায়ে মাথা নোয়াই। আমাকে ক্ষমা কর।

পুরনো প্রসঙ্গ তুলে লাভ নেই। তবু একটু তুলি। যা আমার রক্তের, যা আমার স্নেহের, যা আমার পবিত্রতার, তা আমি তোমার কাছেই চেয়েছিলাম। তোমার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আর, তা আমি হারিয়েছি আমারই অপরাধে। আমার আজন্ম সংস্কারের বিভ্রান্তিই, সমাজের গভীরতায় চাপা পড়ে থাকা অপরাধবোধের বিমূঢ়তাই আমার পাপ। এ কথা যখন বুঝলাম, তখন আর সময় নেই।

তবু মনে মানে কই! মন থেকে যে তোমাকে আলাদা করতে পারলাম না! তাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আর তার মূঢ়, রূঢ়, বোধহীন আঘাতটা তোমাকেই হানলাম। কিন্তু পেলাম না তো! ভেবেছিলাম, শক্ত খোলসটাকে

যদি চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি, শাঁসটাকে একদিন পাব। কিন্তু ভিতরের ঠিকানা যে হারিয়েছে, বাইরের দরজায় আঘাত করে সে কি করবে!

এটা বুঝতে বড় দেরি হল। তোমাকে তো ছুঁতেও পারি নি, নিজেরই তন্ত্রী নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করেছি—তপতী, এই ভেবে আমাকে ক্ষমা ক'রো। আর····সংসারে যে কিছুই আর চেয়ে দেখতে পেলাম না, এই ভেবে ভুলে যেও। —ভবতোষ।"

চিঠি পড়া হল। একবার। দুবার। আর, একটা কাঁপুনি ঠেলে উঠতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। উঠতে লাগল, কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ, আর একটা ভয়ংকর চীৎকার শব্দ করবার আগেই ডিভানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ গুঁজল। বুকের ভিতরে লুকিয়ে বসে থাকা একটা গুপ্তঘাতক সহস্র অস্ত্রের আঘাত করে চীৎকার করতে করতে উঠে এল, কেমন করে ভুলব! কেমন করে! ঘৃণা দিয়ে আমি সত্যকে ঢেকেছিলাম। সর্বনাশের শেষ আগুনে আমি তরল হব, আমি গলব, সেই পথ চেয়ে বসে ছিলাম। ভবতোষ, কেন শেষ কলঙ্ক দিলে না!····

বছরের প্রথম বৃষ্টি আজ প্রবল হয়ে নামল।

ছ বি

গৌরকিশোর ঘোষ

কোথাও প্রেম সম্পর্কে আলোচনা হলেই, কেন জানিনে, চট করে বিভূতিদা-দের কথা আমার মনে পড়ে। কর্তা-গিন্নীর যুগল পরিতৃপ্ত জীবনের হাসি-ভরা মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিভূতিদার বাসায় আমি অনেক দিন ছিলাম। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যেও ওদের ভালবাসার গভীর প্রকাশ দেখেছি। অথচ বাইরে থেকে তার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যেত না। বউদি থাকতেন ঘরকন্নার কাজে ডুবে। দাদা বেড়াতেন তাঁর ক্লাব আড্ডা নিয়ে ভেসে। যতদিন ছিলাম, দাদাকে শেষ বাসের আগে ফিরতে দেখিনি।

বউদি বলতেন, "ঠাকুরপো, ভাগ্যিস তুমি ছিলে, তাই ঘুমিয়ে বাঁচছি। নইলে দরজা খোলবার জন্যে রোজ আমাকে চোখে সর্ষের তেল দিয়ে জেগে থাকতে হত।"

কিন্তু আমি জানি, রোজই দেখেছি, বউদি চুপ করে শুয়ে থাকতেন, ঘুমুতেন না। দাদা যতই নিঃশব্দে আসুন, বউদি টের পেয়ে আলগোছে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দাদা বলতেন, "ভাগ্যিস তুই আছিস, নইলে দরজা খুলতে পাড়ার লোক জেগে উঠত, আর কাঁচা ঘুম ভেঙে তোর বউদি—"

কিন্তু আমি জানি, দাদা ঠিক জানেন, বউদি জেগে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। রোজ রাত্রে একছড়া গোড়ের মালা দাদা আনতেন। বউদির গলায় দরজার বাইরে থেকেই সেটা গলিয়ে দিতেন। তারপর আর কিছু দেখতে পেতাম না। শুনতাম, বউদির কপট বিরক্তি-ভরা চাপা আওয়াজ।

"আঃ, ছাড়! খেয়ে-দেয়ে নিয়ে একটু রেহাই দাও দিকি! আঃ, কি হচ্ছে!"

আর একটি দিনের কথা বলি। বউদি পিতৃগৃহে। সমাগত প্রসবদিনের প্রতীক্ষায় আতঙ্কিত।

আমায় দেখে বললেন, "দেবর যে! রামচন্দ্রটি কই? নতুন বইয়ের রিহার্সালে ব্যস্ত বুঝি!"

সাফাই গাইতে যাব, বউদি বাধা দিলেন, "থাক ভাই, কিছু আর বলতে

হবে না! এক দিন দু দিন তো নয়, ন বচ্ছর ঘর করছি। তা আজ কি আর আসবেন?"

মাথা নেড়ে জানালাম, "সম্ভব হবে না।"

বউদি একটু ম্লান হেসে বললেন, "কি করে আর হবে বল! দরকার তো আর নেই! নতুন রাঁধুনী মাগীটার ওপর হিংসে হচ্ছে। রাঁধছে ভালই, নইলে এক-আধটু মনে পড়তই!"

বললাম, "এক-আধবার কেন বউদি, সমস্ত ক্ষণই আপনার আসন দাদার মনে পাতা। দলিল-দস্তাবেজ আমার সঙ্গেই আছে।"

গোড়ের মালাগাছ বের করে দিলাম। বউদির মুখে খুশির আবীর ছড়িয়ে পড়ল। হেসে ফেললেন খিলখিল করে।

"তোমার দাদা কায়দাটি জবর বের করেছেন! হাটুরে লোকের হাতে প্রেমপত্তর পাঠাচ্ছেন! বউয়ের মন আর আড্ডার জন একসঙ্গেই রাখা চলছে। কি বল?"

সেদিন বাসায় ফিরতে আমারও বেশ দেরি হল। তখনও বিভূতিদা ফেরেননি। বিভূতিদার বাবা জেগে আছেন দেখে বিস্মিত হলাম। উপরে উঠছিলাম, আমায় ডাকলেন।

"এই যে, ফিরেছ! এত রাত পর্যন্ত বাইরে কর কি? সে হতভাগাটার তো এখনও দেখা নেই!"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিভূতিদার বাবা গম্ভীর আর শান্ত মানুষ। ওঁর দিকে আমরা কেউই ঘেঁষিনে। তাই আজকে ওঁকে কিঞ্চিৎ চঞ্চল দেখে অবাক হলাম।

"বউমার ভাই এসেছিল। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। একটা ছেলে হয়েছে।"

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। সে কি! আজই তো বিকালে—কি আশ্চর্য!

খবরটা দিলাম দাদা খেতে বসলে।

"অ্যাঁ, বলিস কি! কোথায় আছে? কেমন আছে তোর বউদি? খুব কি কাহিল হয়ে পড়েছে? ক্লাবে গিয়ে খবরটা দিতে পারিসনি? আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। ভয়ানক অপরাধ। ছি, ছি! আমার বউয়ের এই অবস্থা, আর আমি ক্লাবে বসে ফুর্তি করছি!"

আশঙ্কায় দাদার গোরামুখে নিষ্প্রদীপের কালো ঠুলি পড়ল যেন। কি তীব্র অনুশোচনা! খাওয়া ছেড়ে প্রায় উঠে পড়ে, এমন।

যত বলি, দাদা, আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। তা কে শোনে! আমি শুয়ে পড়লাম। দাদা ঘরে পদচারণা করেই রাত কাবার করে দিলেন।

এই একটি দিন ছাড়া দাদাকে বউদি সম্পর্কে কখনও প্রকাশ্যে মনোভাব প্রকাশ করতে দেখিনি।

তারপর বিভূতিদাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। মাসীমা মফস্বল থেকে ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করতে কলকাতায় বাসা করলেন। আমি তাদের গার্জেন বনে সেই বাসায় উঠে এলাম। দক্ষিণ থেকে একেবারে উত্তরে। কয়েক মাস পরই গার্জেনত্ব গেল। মাসীমার বাসা উঠে গেল, ভাইবোনেরা এখানে ওখানে ছিটিয়ে পড়ল। আমিও আর এক জায়গায় আস্তানা গাড়লাম।

হঠাৎ একদিন বিভূতিদার সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন। দুজনেই খুশী হলাম।

"তুই এদিকেই থাকিস?"

আঙুল দিয়ে দূর থেকে চারতলা বাড়িটা দেখিয়ে বললাম, "ওরই নীচু-তলায়। চল না!"

"যাব আর এক দিন- আজ সময় নেই। তা তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমার সঙ্গে একবার চল্ তো!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়?"

বললেন, "একটা বাড়ি ঠিক করেছি, এই কাছেই। চল্, টাকাটা জমা দিয়ে আসি।"

দাদা বাড়িটা ভালই পেয়েছেন বলতে হবে। তিনখানা ঘর, স্টোর, রান্নাঘর, বাথরুম--একেবারে আলাদা ফ্ল্যাট- দোতলায়। ভাড়া এক শ।

"তোর বউদি দোতলা দোতলা করত। ভালই হল, কি বলিস! দু তারিখেই এসে যাব। যাস একদিন।"

আমাকে আর যেতে হল না। দাদাই এলেন। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওদের আসবার কথা। রাত গোটা নয়েক হবে। শুয়ে শুয়ে পড়ছি। জানালায় কে টোকা দিল। চেয়ে দেখি- দাদা। আরে!

বললাম, "ভেতরে এস।"

ওদের তো আজই আসবার কথা! নিজের ভুলের জন্যে বড় অনুতপ্ত হলাম। দাদা ঢুকলেন। এক হাতে যথারীতি কলাপাতার প্যাকেটে মোড়া একছড়া মালা। অন্য হাতে খবরের কাগজে মোড়া বড়সড় চৌকোমতন কি। সারাদিনের বাড়ি বদলের পরিশ্রম দাদার সমস্ত শরীরে সই করে রেখে গেছে। মুখখানা অবসাদগ্রস্ত। শুধু চোখ দুটোতে যেন কিসের উত্তেজনা। ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। চার দিক তাকিয়ে নিলেন।

তারপর খুশী হয়ে বললেন, "বেশ ঘর। একটু জল খাওয়া।"

জল দিলাম। দাদা বেশী ধানাইপানাই না করে বললেন, "দেখ, তোর কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি।"

দাদা খুব সিরিয়স হয়ে উঠলেন।

"হঠাৎ তোর কথাই মনে হল। তাই সোজা চলে এলাম।"

দাদার কথাবার্তার ধরন একটু অপরিচিত ঠেকতে লাগল। আমার আগ্রহ মুখিয়ে রইল দাদার কথা শুনতে। দাদা কাগজের প্যাকেটটা খুলতেই বের হল একটা ফটোগ্রাফ, কেবিনেট সাইজের। দাদার হাত দুখানা উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন রে ছবিখানা?"

ফটোখানা এক উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীর। অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী। ছবিটিও চমৎকার উঠেছে। ছবিটি যদিও আবক্ষ, তবু মেয়েটির সুগঠিত দেহের পরিচয় আন্দাজ করতে একটু দেরি লাগে না। ঠোঁটে অভিমানী মেয়ের হঠাৎ খুশির হাসিটুকু লেগে রয়েছে। তবে চোখ দুটোয় কেমন যেন উন্মাদত্বের আভাস।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছবিটা কার?"

একটু অপ্রস্তুত হেসে জবাব দিলেন, "এক রাক্ষসীর। আমার সেকেণ্ড ওয়াইফের।"

দাদার তিন বিয়ে তা জানতাম। প্রথম দু সংসার অনেক আগেই গত হয়েছেন।

দাদা বললেন, বড় মজার ব্যাপার একটা ঘটেছে—বুঝলি' এই বাড়িতে আমরা একাদিক্রমে সতের বছর কাটিয়েছি। জিনিসপত্র টুকটাক যা জমেছিল, একেবারে পাহাড়। আজ চার-পাঁচ দিন ধরে শুধু বাজে জিনিসই বাছা হল। মাকে জানিস তো—বেহিসেবে কিছু করবার জো নেই। চার দিন ধরে মা শুধু জিনিসই বেচেছে—শিশি, বোতল, কাঁচ, কাগজ, কৌটো, টিন—যা ছিল সব বেচেছে। আজ সকালে দেখি এক কোনায় একগাদা ছবি। রাধাকেষ্ট, দক্ষিণাকালী, যমুনাপুলিনে, নবনারীকুঞ্জর, পতি ছাড়া সতীরানী নাহি জানে আর, সতীর পুণ্যেতে স্বর্গ হয় এ সংসার—সেই দাদামশাই-দিদিমার আমল থেকে জড় করা বড় বড় ফ্রেমে আঁটা যত সব রাবিশ। গোটা কয় এর আগে আমি কাজে লাগিয়েছি। মাকে বললাম, এগুলো ফটো বাঁধাইয়ের দোকানে পাঠিয়ে দাও। কাঁচ আর ফ্রেমগুলোর কিছু দাম পাবে। কথাটা মার মনে ধরল। মা আর বউ ওগুলো গোছাতে লাগল। একটু পরেই মা আমাকে ডাক দিল। গিয়ে দেখি মার হাতে এই ছবিটা। ময়লা-ঝুলে একাকার হয়ে আছে। মা বলল, এটাকে কি করবি? চট করে তোর বউদির দিকে চাইলাম। সে কোনও কথা বলল না। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, কি আর করব! ওটাও দোকানে দিয়ে দাও।

"আমিই সব ছবিগুলো দোকানে দিয়ে এলাম। তখন কিন্তু ফটোখানার

দিকে একবার চেয়ে দেখবারও ইচ্ছে হল না। তারপর বার তিনেক দক্ষিণ থেকে উত্তর করতে করতে আর কিছু মনেই রইল না। মনে পড়ল বিকালে। নতুন বাসায় আমার ঘরে বসে যখন চা খাচ্ছি। তোর বউদি দেওয়ালে আমার একখানা ছবি পুঁতছে, ঠিক সেই সময় মনে পড়ে গেল ছবিখানার কথা।"

দাদার গলা ভারী হয়ে এল। একটু থেমে ফটোখানাকে দু হাতে তুলে একবার দেখে নিলেন, তারপর আবার একটু হাসলেন। হাসি তো নয়, কৈফিয়ত জানানো!

দাদা বললেন, "মানুষের মন বড় বিচিত্র। আমার মনে পড়ে গেল এই ফটো টাঙাবার ঘটনাটা। তোর এই বউদি দেখতে এত সুন্দর হলে হবে কি, একেবারে উন্মাদ ছিল। দেড় বছর আমার ঘর করেছে, কিন্তু একটি দিনও কাউকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। মাত্র এক দিন, কি যে ভাগ্যি কে জানে, একটা দিন খুব ভাল ছিল। আর সেইদিন এই ছবিটা আমি তুলি। ফটো তোলা আমার বাতিক, তা তো জানিস! আর ছবিটা বড় সুন্দর উঠেছে, না? এমনিই ও দেখতে ছিল খুবই সুন্দর, তার উপর এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাত একেবারে সুপার্ব্। অনেক দিন থেকেই ওর একখানা ছবি তোলবার ইচ্ছে আমার ছিল। আর সে ইচ্ছের কথা ও জানত। তাই কিছুতেই তুলতে দিত না। অকারণ যন্ত্রণা দেবার এমন স্পৃহা আমি আর কারও আছে বলে শুনিনি। পাছে আমরা একটু শান্তি পাই, তাই রাতদিন সতর্ক হয়ে থাকত। এক বেলার জন্যও বাপের বাড়ি যায়নি। দেড় বছর ছিল, একেবারে হাড় জ্বালিয়ে ছেড়েছে।

"ফটোটা তুলে প্রথমে ওকে দেখাইনি। একেবারে সুন্দর একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর ওর খুশমেজাজ দেখে কাগজের মোড়কটা খুলে ফটোখানা ওকে দেখালাম। ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটা কাণ্ড কখন বাধে এই আশঙ্কা। কিন্তু আশ্চর্য হলাম ওকে খুশী হতে দেখে। খুশী মানে একেবারে ছেলেমানুষের মতো। ফটোখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানারকমভাবে দেখে আর খুশিতে ফেটে পড়ে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেল। ছবিটা বুকে করে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। ফিল্ম ছিল না, নইলে আর একখানা ছবি তুলতাম সেদিন। সেটা আরও অনেক ভাল হত।

"বিকালবেলা ছবিখানা টাঙাব, বেছে বেছে জায়গা ঠিক করলাম। খাটে শুয়েও দেখা যায়, এমন একটা জায়গা। সুন্দর করে ছবিখানা টাঙালাম। তারপর খুশী মনে বেরিয়ে গেলাম। তোর প্রথম বউদি মারা যাবার পর আর এত খুশী হবার সুযোগ ঘটেনি।

"রাত করে ফিরলাম। খেয়ে-দেয়ে ঘরে গেলাম। তোর বউদি খাটের ওপর শুয়ে ছিল। ঘর অন্ধকার। বাতি জেবলে দেওয়ালের দিকে চাইতেই

দেখি, ফটোখানা নেই। আলো জ্বালতেই তোর বউদি উঠে বসল। বললাম, এ কি, ছবিখানা কি হল? বলল, সরিয়ে রেখেছি। বিপদের আভাস পেলাম। চুপ করে গেলাম দেখে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছ না যে! বললাম, বলবার কি আছে? শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠল। চীৎকার করে বলে উঠল, তা থাকবে কেন? সে সোহাগখাগীর জন্যে দরদ যে মনে একেবারে থকথক করছে, তা কি আর জানিনে? হারামজাদী মরে গিয়েও সোহাগের বাটিতে চুমুক দিতে ছাড়ছে না। ওর ছবিখানা ওখানে টাঙানো থাকত কিনা, আমার ফটো ওখানে ভাল লাগবে কেন?

"কিসের থেকে কোন্ কথায় টেনে নিয়ে এল দেখ। তারপর সারারাত আমাকে, আমার মা-বাবাকে, তোর আগের বউদি আর তার চৌদ্দপুরুষকে চীৎকার করে গালাগাল দিয়ে, ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তচনচ করে ভোরের দিকে ঘুমোল। ওর বদ্ধমূল ধারণাই ছিল, আমি তোর প্রথম বউদিকে ভুলতে পারিনি।"

দাদা থামলেন। বুঝলাম, দাদাকে আজ কথায় পেয়েছে।

বললাম, "একটু ব'সো, চা দিতে বলি।"

চা খেতে খেতে দাদা শুরু করলেন, 'তোর মেজবউদির বদ্ধমূল ধারণা ছিল, প্রথম বউকে আমি ভুলতে পারিনি। আর সে ধারণা মিথ্যে, তাই বা বলি কি করে? অথচ সে বিয়ের কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায়—বুঝলি।

"কতই বা বয়েস তখন আমার—গোটা আঠারো হবে। ম্যাট্রিক দিয়েছি, রেজাল্ট তখনও বের হয়নি। নৈহাটি গিয়েছিলাম পিসেমশায়ের বাড়ি। পিসেমশাই ছিলেন এক চটকলের বড়বাবু। ভাল ফুটবল খেলতে পারতাম—চেহারা দেখছিস তো?"

দাদা নিজের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

"তখন আরও সুন্দর ছিল। সেবার গোটা মরসুমটাই ওদের হয়ে খেললাম। চটকলের বড় সাহেব খুব খুশী। পিসেমশাইকে বললেন, ওকে রেখে দাও একটা চাকরি দিয়ে। আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন হবে। খাসা খেলে! পিসেমশাই আমাকে বললেন, বাবাকে লোভ দেখিয়ে চিঠি লিখলেন। বাবার মত পেয়ে কাজে ঢুকে গেলাম। জোট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মাইনে এক শ টাকা। বোঝ, তখনকার দিনের এক শ' টাকা, তাও ঢুকতে না ঢুকতেই' কাজ বলতে কিচ্ছু না। দিনরাত খেলে বেড়ানো, টিম তৈরি করা। আর বড় সাহেবের বাংলোয় গিয়ে টেনিস খেলা আর আড্ডা মারা। সাহেব এমনিতে ছিল রাশভারী; কিন্তু যাকে চোখে ধরত, তাকে গুরুর আদরে রাখত। চেহারার জলুসে বড় সাহেবের খানা-টেবিল অবধি পৌঁছে গেলাম। সাহেবের ছিল

এক বিধবা ভাইঝি। বয়সে আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে। মন-মরা হয়ে থাকত। আমাকে পেয়ে যেন বর্তে গেল। সব সময় হাসি, তামাশা, খেলাধুলো, বেড়ানোয় আমরা মেতে থাকতাম। তা আবার আমাদের বয়লার সাহেবের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম, তখন আর ব্যাটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলাম না।

"বড়দিন এসে গেল। ম্যাগি, সাহেবের ভাইঝির নাম, আমাকে নিয়ে বড় সাহেবের গাড়ি করে কলকাতায় গেল। গাড়িটা নিজেই চালাল। নববর্ষের কিছু উপহার কেনাকাটা হল। আমি ম্যাগিকে নিউ মার্কেট থেকে একঝাড় গোলাপ কিনে দিলাম। সে তো উচ্ছ্বসিত! আমাকেও কি একটা কিনে দিয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। হোটেলে ডিনার খেলাম। ম্যাগি কয়েক পেগ হুইস্কি খেল। রাত এগারোটা নাগাত নৈহাটিমুখো রওনা দিলাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নির্জন। খুব শীত। গাড়ি চলেছে হু-হু করে। কিন্তু আমার তত শীত লাগছিল না। পাশে-বসা ম্যাগির দেহ-সৌগন্ধে আমার বক্ষে সেদিন চাঞ্চল্যের জোয়ার। ব্যারাকপুর পার হয়ে গেলাম। ব্যারাকপুর ছাড়িয়েই এক গুমটি। গাড়ি থামাতে হল। গুমটি বন্ধ। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। দূরে থেকে ভেসে আসতে লাগল একটা মালগাড়ির ধিকিয়ে ধিকিয়ে আসার শব্দ। ম্যাগি শিস দিচ্ছিল, গুনগুন করে গান ধরল। তারপর মালগাড়ির ইঞ্জিনটা যেই আমাদের পেরিয়ে গেল, অমনি ডার্লিং বলে আমার গলায় ওর বাহু দুটো পেঁচিয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল। প্রথমটা চমকে গিয়েছিলাম। প্রায় তক্ষুনি পিছনের সিটে নজর দিলাম, যেন কেউ বসে আছে। তারপব সব সঙ্কোচ সর্বভয়হর উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

"পরদিন সকালেও ঠোঁটের উপরকার মৃদু উষ্ণতাটুকু মুছে গেল না। নাকে লেগে রইল অ্যালকোহল আর এসেন্সের মিশ্র মিষ্টি এক টুকরো ঘ্রাণ। সব চাইতে মুশকিলে পড়লাম বুক আর কান নিয়ে। অকারণেই হৃদ্‌পিণ্ড লাফিয়ে ওঠে আর কানের গোড়ায় যে উত্তাপ জন্ম নেয়, তা যেন সমস্ত শবীর গলিয়ে দেবে।

"বিকেলের দিকে সাজপোশাক করে বড় সাহেবের বাংলোর দিকে যাচ্ছি, কারখানার পিছনে বয়লার সাহেব মিঃ নর্টনের সঙ্গে দেখা। ব্যাটা বেহেড মাতাল হয়ে পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশ কাটিয়ে চলে যাব, লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি তো মাটিতে পড়ে গেলাম। জামা-কাপড়ের বারোটা বেজে গেল। ব্যাটা ওদিকে আমাকে খুবসে ঘুঁষিয়ে চলেছে। আর কি গালাগাল! ড্যাম, সোয়াইন, বেজন্মা, নেটিব, যা নয় তাই। হকচকানি কাটতে বেশী দেরি হল না। পোশাকের দুর্দশা দেখে আর গালাগাল শুনে

চড়াক করে রক্ত মাথায় উঠে গেল। মারের চোটে ব্যাটার আমপিত্তি বের করে দিলাম। পড়ে পড়ে ব্যাটার-ছেলে গোঙাতে লাগল, আমিও বাসায় দিলাম পিট্‌টান। বড্ড ভয় হল মনে।

"বাসায় গিয়ে দেখি, সেখানেও তখন হইচই ব্যাপার। পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, খোকা, আর আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন, তুই বাড়ি চলে যা। তোর মার অসুখ, টেলিগ্রাম এসেছে। মার অসুখ শুনে আমার দুশ্চিন্তা হল না। সত্যি বলতে কি, এখান থেকে পালাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, টেলিগ্রামটা পেয়ে বেঁচে গেলাম।

"ট্রেনে উঠে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ম্যাগির চেহারা নানাভাবে চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল।

"বাড়িতে ঢুকতেই মার সঙ্গে দেখা। দিব্যি সুস্থ চেহারা! আমাকে দেখেই শঙ্খ বেজে উঠল, উলু পড়ল। কি ব্যাপার? বাবা এসে বললেন, খোকা, শ্বশুরমশায় তোমার বিয়ে ঠিক করেছেন। কাল যাত্রা করতে হবে, পরশু বিয়ে। এ ক'দিন সাবধানে থেকো। রক্তপাত-টাত যেন না হয়। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। বিয়ে? কার বিয়ে? আমার? কেন? মার দেখা পাচ্ছিনে। একান্নবর্তী সংসার—একেই বড়, তারপর আত্মীয়কুটুম্ব আসছেই। রাগে, অভিমানে পুড়ে পুড়ে মরছি। শেষটায় নিজের ঘরে দরজা দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। মা আসতেই বললাম, আমি বিয়ে করব না। মা বললেন, এ বিয়েতে দোষটা কি হল? বাবা তাদের পাকা কথা দিয়ে এসেছেন। ভাল ঘর, ভাল মেয়ে। চীৎকার করে উঠলাম, ছাই মেয়ে! আমার শেষ কথা, আমি বিয়ে করব না। মা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বেশ, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কথাটা তাঁকেই বল। আর বলাবলি কি, দাদু যখন ঠিক করেছেন, তখন জানি, এ বিয়ে হবেই। দাদুর কথা উল্টে দেবে, এমন কেউ এ বাড়িতে নেই।

"টোপর পরলাম। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। মনে মনে বললাম, ভগবান বিয়ে হতে না-হতেই যেন পোড়ারমুখী মেয়েটা বিধবা হয়। বিয়েতে বাবা গেলেন না। দাদুই বরকর্তা। শ্বশুররা বিরাট জমিদার। প্রোসেসন যা হল, তা দেখেই তখনকার মতো আমার কান্না থমকে গেল। হাতি, ঘোড়া, চৌদোলা, বাজনা, বাদ্য, বাজি দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। সাতপাক হল। শুভদৃষ্টিতে ইচ্ছে করেই চাইলাম না। বাসরঘরে মুখ গোমড়া করে রইলাম। চারদিকে সব ইয়ারকি-ঠাট্টা, হাসি-তামাশা হচ্ছে আর আমার বুক ঠেলে কান্না পাচ্ছে! শেষ পর্যন্ত পারলাম না, একসময় বালিশে মুখ গুঁজে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম। মুহূর্তের মধ্যে সব স্তব্ধ। জামাই কাঁদছে। বাইরে খবর গেল। বাসর ফাঁকা হয়ে গেল। খবর পেয়ে দাদু এলেন।

গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে দাদু, আমায় খুলে বল। বলব কি, আমি কি নিজেই জানি? সমস্ত বিরক্তি, ক্ষোভ সব একসময় কান্না হয়ে ঝরে পড়ল। কাঁদবার পর আমিও কি কম লজ্জিত হলাম! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। ঘণ্টাখানেক পরে দাদু চলে গেলেন। বাসরঘরে শুধু আমি আর তোর বউদি। তোর বউদির দিকে আমি আর চাইতে পারছিলাম না। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলাম। অনেকক্ষণ পরে তোর বউদি আমার কাছে উঠে এল। আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিতে দিতে স্পষ্ট জড়তাহীন স্বরে বলল, দিদিদের কাছে শুনেছি, ছেলেরাই আগে কথা বলে—তা আমার বেলায় সবই উল্টো, তাই আমিই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি, না?

"তোর বউদির কথায় কি ছিল, জানিনে। আমার সব বীতরাগ, সব বিরক্তি সেই দণ্ডেই জল হয়ে গেল। আমি তড়াক করে উঠে বসলাম। তোর বউদি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল না। কিন্তু সেই রাত্রে, সেই তখন, আমার মনে হল, এমন মেয়ে আমি আর দেখিনি। সারা কপালে চন্দন, চেলি পরনে, মুখে সংকোচহীন নম্র সপ্রতিভ হাসি। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, কে বলল, আপনাকে আমার পছন্দ হয়নি? তোর বউদি তেমনি হেসে বলল, বলতে হবে কেন? আমি কি বুঝিনে? আমার এমন কি আছে, আপনার পছন্দ হবে? তবে আপনাকে আমার— বলে তোর বউদি থেমে গেল। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। বললাম, কি? পছন্দ হয়নি তো? তোর বউদি লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, ধ্যেত! আপনি পুরুষ মানুষ, আমাকে পছন্দ না হলেও আপনার চলে যাবে, কিন্তু - বলেই তোর বউদি থেমে গেল। ওর গলা ভারী হয়ে উঠল। বলল, কিন্তু আমার যে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই! আমি বলে উঠলাম, বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। তোর বউদির গায়ে হাত ঠেকিয়েই তা আবার তৎক্ষণাৎ টেনে নিলাম। অনভ্যাসের সংকোচ। তোর বউদি কিন্তু বুঝল। সারা মুখে হাসি স্থলপদ্মের মতো ফুটে উঠল। দুখানা নরম হাত দিয়ে আমার দুখানা হাত টেনে নিল।

"দুটি বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। তোর বউদির ভরা দশ মাস। শরীর খারাপ খারাপ। এদিকে আমার শীল্ডের খেলা। বহরমপুর যেতে হবে দল নিয়ে। তোর বউদির শরীর ভাল নয় দেখে আমি বললাম, যাব না। তোর বউদি বলল, তাও কি হয়! ফাইন্যাল খেলা, এবারে জিততে পারলে পর পর তিনবার জিতবে, না গেলে চলে? তুমি আবার ক্যাপ্টেন। এবারও জিতবে— আমি বলে দিলাম। কাপটা কিন্তু আমার। তোর বউদি প্রত্যেকবারই গোছগাছ করে দিত, এবারও দিল। মন একটু খুঁতখুঁত করলেও খেলার নেশায় মেতে

গেলাম। সেবার আর জিততে পারলাম না, মনটা খারাপ হয়ে গেল। লজ্জা হল, বউয়ের সামনে দাঁড়াব কোন্‌ মুখ নিয়ে। শেয়ালদায় নামলাম। যে যার বাড়ি চলে গেল। বেরিয়ে আসব, দেখি খুড়তুতো ভাই নরেশ। বলল, সেজদা, শিগগির চল! বলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল—একটা ট্যাক্সিতে। জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, ট্যাক্সি কেন? কোথায় যাব? নরেশ বলল, ড্রাইভার, নিমতলা। আমায় বলল, তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে, তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে। বউদি কাল শেষরাতে—

"নরেশের কথাগুলো স্পষ্ট করেই শুনলাম। কিন্তু তাৎপর্য বুঝলাম না। মুখে আগুন দিতে হয়, দেব; এ আর শক্ত কি' কার মুখে আগুন দেব, তা আর ভাববার সময় কই আমার' শীল্ড পাইনি কেন, তারই একটা জুতসই কৈফিয়ত বউকে দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। শুধু মাথাটা কেমন যেন ভারী ভারী লাগছিল। শ্মশানে গেলাম। যন্ত্রের মতো একটার পর একটা কাজ অতি ধীরভাবে করে গেলাম। সবাই আমার স্থৈর্য দেখে অবাক হল। শুধু বাবা বুঝলেন, কোথাও একটু গোলমাল হয়েছে। বাবার সামনে কোনদিন সিগারেট খাইনি। কিন্তু সেদিন একটার পর একটা খেয়ে গেলাম। দাহ শেষ হল। বাড়ি এলাম। বাড়িতে সবাই কাঁদছে। মা আমাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমি ধীবে ধীরে ওপরে উঠে আমার ঘরে গেলাম। খাটে বসে আরাম করে সিগারেট খেতে লাগলাম। আব মনে মনে শীল্ড না পাবার কৈফিয়তটা আউড়ে নিয়ে তৈরী হয়ে রইলাম। মনে হল, তোর বউদি এক্ষুনি আসবে। ড্রেসিং টেবিলে বড় আয়না ছিল একটা, দরজার দিকে মুখ করা। আয়নাব দিকে চেয়ে বসে রইলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। তোর বউদির ছায়া পড়ল আয়নায়। সেই বাসরঘরের সাজ। কপালে তিলকচন্দন, পরনে চেলি, মুখে সেই সপ্রতিভ হাসি। আমি হঠাৎ ঘুরে, ওরে দুষ্টু বলে ওকে ধরতে দু হাত বাড়িয়ে দিলাম এক লাফ। দরজার চৌকাঠে কপাল গেল ঠুকে। উঠে দাঁড়াতে গেলাম, পারলাম না, ঘুরে পড়ে গেলাম। মা বলেন, দু ঘণ্টা নাকি আমার কোনও জ্ঞান ছিল না।"

দাদা চুপ করলেন।

বললাম, "দাদা, বুঝি সেই থেকে ফুটবল খেলা ছাড়লে?"

দাদা জবাব দিলেন না।

একটু থেমে দাদা আবার শুরু করলেন, "তারপর বছর দুই কাটল। তখন তেড়ে চাকরি করছি। জুট রেগুলেশন হাকিম। মাইনে যেটুকু কম, প্রতাপ সেই আন্দাজে তত বেশী। জমিতে দাগ দিতে হবে। লোক ভর্তি করছি। মহকুমা শহরের ডাক-বাংলোয় থাকি। তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলাম।

খেতে, শুতে, বসতে, চাকরি দাও, সাহেব, একটা চাকরি দাও। কাঁহাতক আর চাকরি দিতে পারা যায়, বল্! শেষকালে খারাপ ব্যবহার শুরু করলাম। একটা ভোজপুরী দারোয়ান বহাল করলাম। হুকুম দিলাম, বিনা এত্তেলায় কাউকে ঢুকতে দেবে না।

"একদিন প্রায় দেড় শ' লোককে তাড়ালাম। পরিশ্রান্ত হয়ে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাব, দারোয়ান এসে বলল, এক বুড়্ঢাবাবু অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন, কিছুতেই যাবেন না, আপনার সঙ্গে মোলাকাত করা খুব জরুরী আছে। বেজায় বিরক্ত হলাম। ভাবলাম, হাঁকিয়ে দিই। কিন্তু বৃদ্ধ ভেবে আর পারলাম না। বললাম, নিয়ে এস।

"ভদ্রলোক ঢুকলেন, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। মোটাসোটা, ফর্সা, সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক চেহারা। ছাতার ওপরে গামছা জড়ানো, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। আমাকে বেশ করে দেখে বললেন, তুমিই বিভূতি? হরিবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিখানা এগিয়ে দিলেন। পড়েই তো আমার আক্কেল গুড়ুম! দাদুর চিঠি। লিখেছেন, খোকা, ইনি তোমার ভাবী শ্বশুর। অতি সজ্জন ব্যক্তি। তোমাকে দেখিতে যাইতেছেন। যথাযোগ্য সমাদরের ত্রুটি না হয়। আমি আগামী পরশ্ব ইঁহার কন্যাকে দেখিতে যাইবার পথে তোমার ওখানে হইয়া যাইব। চিঠি পড়ে আমার অবস্থাটা বোঝ কি হল। তাড়াতাড়ি বেকুবের মতো প্রণাম করতে গেলাম। বাধা দিয়ে বললেন, থাক, বাবাজী থাক। তক্ষুনি চলে যাবেন। খেয়ে-দেয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। রাজী হলেন না, চলে গেলেন।

"দু দিন পরে দাদু এলেন। মেয়ে দেখতে গেলেন। দেখে এসে রাতটা আমার ওখানে কাটালেন। পরদিন সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে ট্রেনে উঠলেন। এর মধ্যে আর একটা কথাও বললেন না। ট্রেন ছাড়বে ছাড়বে, এমন সময় দাদু বললেন, মেয়ে সুন্দরী। এই নাও হাতের লেখা। পাকা কায়েতের মতোই। আর হ্যাঁ, ছুটির দরখাস্ত করে দাও। আজ পাঁচুই, সামনের উনত্রিশে বিয়ে। সাতাশ তারিখে তোমাকে নিতে আসবে, তৈরী হয়ে থেকো। ট্রেন ছেড়ে দিল। কাগজের টুকরো খুলে দেখি, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, শ্রীমতী কাঞ্চন দত্ত।

"বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় চোখ ধেঁধে গেল। খুবই রূপসী ছিল। ফটোখানা দেখ।"

দাদা ফটোখানা ঘুরিয়ে ধরলেন, অস্বীকার করবার উপায় নেই।

দাদা বললেন, "জোড়ে বাড়ি এলাম। বউ দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। মা বরণ করে ঘরে তুললেন। সবাই মিলে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকেই তোর বউদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখি, একদৃষ্টে তোর আগের বউদির

দেওয়ালে টাঙানো ফটোখানার দিকে চেয়ে আছে। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ফটোখানায় একটা মালা ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। তোর বউদি ফটোখানার দিকে চেয়ে রইল। ওর সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে গেল। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুবে। আমায় ধমকে বলল, এক্ষুনি যাও, ওটা বাইরে রেখে এস। ওসব যার-তার ছবি এখানে টাঙানো চলবে না।

"নতুন বউয়ের মুখে শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে না-দিতে এ ধরনের কথা কেউ শুনেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি একটা কথাও বাড়িয়ে বলছিনে। আমরা সবাই অপ্রস্তুত। আমার সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল। তবুও মুখের হাসি বজায় রেখে বললাম, বেশ তো, একসময় সরিয়ে ফেললেই হবে' বললে বিশ্বাস করবিনে, ও কথা শুনেই একেবারে ক্ষেপে উঠল। চীৎকার করে বলে উঠল, কেন, এখন সরাতে কি কলজে পুড়ে যাবে? সোহাগের মানুষের গলায় মালা ঝোলানো হয়েছে! সরাও, এক্ষুনি সরাও বলছি! মায়ের দিকে চেয়ে দেখি, চোখে জল। যাবার সময় কান্না চেপে বলে গেলেন, সরা খোকা, ছবিখানা আমার ঘরে রেখে আয়। সবাই সেই মুহূর্তে চলে গেল। আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। ইচ্ছে হল, মেয়েটাকে খুন করে ফেলি। কিন্তু কিছুই করলাম না। নিঃশব্দে ফটোটা নামিয়ে নিয়ে চলে গেলাম।

"রাত্তিরে বিরাট এক খাটের দুই পাশে দুজনে শুয়ে রয়েছি। রাত অনেক হয়েছে। নানারকম কথা ভাবছি। তোর বউদির ওপর বিতৃষ্ণা এত বেড়েছে যে, ওর দিকে চাইছিও না। হঠাৎ মনে হল, যেন কান্না শুনলাম। কান খাড়া করে শুনি—সত্যি। তোর বউদিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর চাপা কান্নার শব্দে ওর প্রতি সহানুভূতির ভাবটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সরে গিয়ে ওর গায়ে হাত রাখলাম। ও কাঠ হয়ে শুয়ে রইল আর ফোঁপাতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না। উঠে বসে কোলের ওপর ওর মাথাটা তুলে আদর করে ডাক দিলাম, কাঞ্চন! এতক্ষণ পরে তোর বউদি আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে। বললাম, চুপ কর, চুপ কর। কি হয়েছে, আমাকে বল তো লক্ষ্মীটি! অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দেবার পর ও চুপ করল। নিজের হাতে ওর চোখ-মুখ মুছিয়ে দিয়ে ওকে কাছে টেনে শুয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে তোর বউদি বলল, আমাকে ক্ষমা কর। সকালবেলা আমার মাথার ঠিক ছিল না। সতীনের ছবি আমি আর সইতে পারিনি।

"আর, কোনদিন পারলও না। দেড়টা বছর ছিল, কিন্তু কি বলব ভাই, জ্বালাতন করে খেয়েছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগের বউয়ের কথা জিজ্ঞাসা করত। দেখতে কেমন ছিল, আমায় কেমন ভালবাসত, আমি তাকে কেমন ভালবাসতাম। প্রথম প্রথম জবাব দিয়ে বিপদ বাধাতাম। তোর বউদি চীৎকার

করে আগের বউকে গালাগাল দিত। জিনিসপত্র ভাঙত। তোর আগের বউদির প্রায় পঁচিশখানা ফটো ছিল। সব ভেঙে তচনচ করে দিয়েছে। বাড়ি-সুদ্ধ সবাই আমরা জ্বালাতন হয়ে গেলাম। আমাদের সহ্যের সীমা অতীত হয়ে গেল। শেষকালে একদিন আর পারলাম না। মাকে গিয়ে বললাম, মা, ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। নইলে কোন্‌দিন ওকে খুন করে আমি আত্মহত্যা করব। মা বললেন, সেই ভাল। কিন্তু সেইদিন বিকালে এসে বললেন, এই ভাদ্র মাসে তো বউকে পাঠানো যাবে না, বাবা! বউ যে ভর-পোয়াতী! চমকে উঠলাম, অ্যাঁ!

"খবরটা বোধ হয় ও-ও শুনেছিল। তাই আশ্চর্য খুশী দেখলাম ওকে। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, অনেক দিন পরে ফটো তোলবার ইচ্ছেটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। এর আগে যতবার চেয়েছি, ও না করেছে। সেদিন সত্যিই ওর মেজাজ ভাল ছিল। তাই বলতেই পট করে রাজী হয়ে গেল। ফটো তুললাম। ছেলেমানুষের মতো বায়না ধরল, ছবি দেখাও। যত বলি, কাল তৈরী হবে, ততই জিদ ধরে, না, এখনই দেখাতে হবে। পরদিন প্রিণ্ট করে আনলাম আর এন্‌লার্জ করতে দিয়ে এলাম। ছবিখানা ভালই উঠেছিল, কি বলিস?"

দাদা ছবিখানার দিকে আর একবার চাইলেন। সত্যি, ফটোটা ভালই তোলা হয়েছিল!

দাদা বললেন, "এন্‌লার্জখানা নিয়ে এলাম। তখনও কি খুশী! সারা-দিন ফটো বুকে করে কাটাল। সন্ধ্যের দিকে চান-খাওয়া করতে গেছে, আর আমি ছবিটা টাঙিয়ে ফেললাম সেই অবসরে। ভেবেছিলাম, তোর বউদি খুশীই হবে। কিন্তু হল উল্টো। ওখানে তোর আগের বউদির ফটোটা টাঙানো থাকত। তাই দেখেই ক্ষেপে গেল। আবার সেই চীৎকার আর গালাগাল, অশান্তির একশেষ। ফটোখানা খুলে নিয়ে ওর তোরঙ্গে বন্ধ করে রেখে দিল।

"দু দিন বাদে অসুখে পড়ল। প্রথম দিকে ডাক্তার ধরতে পারেনি। যখন ধরল টাইফয়েড তখন আর চারা নেই। একুশ দিন ভুগে তোর বউদি মারা গেল। এ একুশ দিন তোর বউদির বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। ও উঠতে দেয়নি। আমার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে খায়নি। বালিশে মাথা দিয়ে শোয়নি। মাথা দিয়েছে আমার কোলে। শেষ তিন দিন জ্ঞান ছিল না। একদিন অনেক রাত্রে ওর মাথাটা কোলে রেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তোর বউদির ডাকে ঘুম ভাঙল। বলল, শোন, একটা কথা বলে নিই। আর হয়ত সময় পাব না। তোমাকে খুব যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম। তার জন্য ক্ষমা চাইব না। দিদির মতো ভালবাসা আমি পাইনি। কিন্তু তবুও

ওর ওপর টেক্কা দিয়ে গেলাম। স্মৃতি হয়ে দিদি যতদিন বাঁচবে, স্মৃতির কাঁটা হয়ে আমি তার চেয়েও বেশী দিন তোমার কাছে বাঁচব। আমাকে তুমি কিছুতেই ভুলতে পারবে না।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তোর নতুন বউদি আসতে না-আসতেই তো সব ভুলিয়ে দিল! কই, এই আট-নয় বছরে এক দিনও তো মনে পড়েনি!

"আজ বাসা বদলাতে গিয়ে ফটোটা নজরে পড়ল, তাই তো! এই ফটোটার কথাও তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম! অন্যান্য বাজে জিনিসের সঙ্গে এটাকেও পাঠিয়েছিলাম ফটো বাঁধাইয়ের দোকানে। কিন্তু আমি ভুললে কি হবে, ফটোটা আমাকে ভোলেনি। তাই প্রায় ঘাড় ধরেই নিয়ে গেল দোকানে। দোকানে ঢুকেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। দেখি, আমাদের বাড়ির ছবিগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে দোকানী ফ্রেম পরিষ্কার করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, সব ছবি-গুলোই ছিঁড়ে ফেলেছ? দোকানী বলল, আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু। আর অমনি আমার হৃদ্‌পিণ্ডে কে যেন চাবুক মারল। কেন ছবিটা দোকানে দিতে গেলাম? কেন আরও আগে এলাম না? অনুশোচনায় অন্তর পুড়তে লাগল। দোকানী বলল, বাবু, আপনার একখানা ফটোক ভুলে চলে এসেছে; ওটা নিয়ে যান। বলে ছবিখানা দিয়ে দিল। হঠাৎ খুব খুশী হয়ে উঠলাম। ছবিখানা ভালভাবে প্যাক কবে নিয়ে তো বের হলাম! তাবপব খেয়াল হল, তাই তো, ছবিটা এখন রাখি কোথায়? ভাবতে ভাবতে তোব কথা মনে পড়ল। ছবিটা তোর কাছেই থাক।"

দাদা থামলেন। সাড়ে এগাবোটা বাজল।

দাদ' ঘড়ি দেখে বললেন, "উঠি আজ, রাত হল।"

দাদা আবার ফিরে এলেন। একটু অপ্রস্তুত হেসে বললেন, "যত্ন কে রাখিস—বুঝলি?"

বললাম, "এতই যখন ভয়, তখন সঙ্গেই রেখে দাও না!"

দাদা বললেন, "বাড়িতেই নিতাম। কিন্তু তোব বউদি তখন কোনও কথা বলল না, এখন আবার এ ছবি নিয়ে গেলে—বুঝলিনে, হাজার হোব মেয়েমানুষ তো!"